প্রকাশক :
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯,

মুদ্রাকর :
যশোদা মাইতি
লিপিমুদ্রণ
৫২/১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

প্রাচীন ইরাণীয় শাস্ত্রে আমার শিক্ষাগুরু, শব্দবিদ্যার পাঠে ও গবেষণায় আমার দীক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডঃ ইরাচ্ জাহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুরওয়ালা-র শতোত্তর জন্মদিনে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থখানি গুরুপুষ্পাঞ্জলি-রূপে নিবেদন করলুম।

ভূমিকা

প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড—বিচিত্র-দেবতা) বইটিতে যে প্রবন্ধগুলি সংকলিত সেগুলির অধিকাংশই শারদীয় ও বার্ষিক আনন্দবাজার পত্রিকায় বার হয়েছিল। তিনটি ছাড়া বাকিগুলি বেরিয়েছিল বিশ্বভারতী পত্রিকায়, চতুরঙ্গ, বিতাব, দক্ষিণীবার্তা, অমৃত ইত্যাদি পত্রিকায়। রামকথার তত্ত্ব প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল 'রাম কথার উদ্ভোবীজ' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায়। 'ধর্মঠাকুরের ইতিহাস' ও 'নাথ-পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য', দুটি গ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রকাশ হয়েছিল। সে বইটির তেমন প্রচার না হওয়ায় এখানে দেওয়া গেল।

সূচী-পত্র

বিষ্ণুকৃষ্ণ-কথা

ঋগ্‌বেদে যে প্রাচীন দেবতাদের স্তবস্তুতি সংগৃহীত আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিষ্ণু। ঋগ্‌বেদীয় দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য এককথায় সোজাসুজি বলা যায় না। ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিতে বিষ্ণুর বহুধা উল্লেখ আছে কিন্তু তাঁর বিষয়ে সূক্ত চার-পাঁচটির বেশি নেই। এই হিসেব ধরলে বিষ্ণুর স্থান ঋগ্‌বেদীয় দেবতাদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু বিষ্ণুর পরাক্রমের ও মাহাত্ম্যের যে বিবরণ পাই ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন সূক্তে তাতে তাঁকে প্রধানতম দেবতা ইন্দ্রের পাশাপাশি এমন কি ইন্দ্রের চেয়েও বড়ো স্থান দিতে হয়। ঋগ্‌বেদের মুখ্য দেবতা যে ইন্দ্র তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রায় এগারো শ সূক্তের মধ্যে ইন্দ্রের স্তব সংখ্যায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তবুও বিষ্ণুর কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্য কিছু কম নয়, এমন কি অনেক বেশি। ইন্দ্রের সকল বীরকর্মে বিষ্ণু তাঁর সহায়তা করেছেন, বৃত্রবধে, শম্বরের নিরানব্বইটি দুর্গ জয়ে (এই কাজে চল্লিশ বছর লেগেছিল), সুল-ভষ্ঠ দাসের মায়া শক্তিনাশে, অসুর বর্চীর লক্ষ সৈন্যের পরাভবে। সর্বত্র বিষ্ণু ইন্দ্রের সহায়ক ও সখা ("ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা")। ইন্দ্র নবীন দেবতা এবং তিনি কৃতিত্বের দ্বারা সমস্ত প্রাচীন দেবতাকে পরাজিত করেছিলেন ("দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ")। তাহলে বিষ্ণুর সম্বন্ধে এই ব্যতিক্রম কেন?

বিষ্ণুর সঙ্গে যে ইন্দ্রের প্রতিযোগিতা হয়েছিল তা ঋগ্‌বেদেই পাওয়া যায়।

উভা জিগ্যথু র্ন পরাজয়েথে
ন পরাজিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ।
ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং
ত্রেধা সহস্রং বি তদ্ ঐরয়েথাম্ ॥ ৬.৬৯.৮ ॥

'উভয়ে লড়েছিলেন, কিন্তু পরাজিত হননি। এঁদের দুজনের কেউই পরাজিত হননি। হে বিষ্ণু, আপনি আর ইন্দ্র যখন লড়েছিলেন তখন তিন হাজার বার চীৎকার করেছিলেন।'

এর থেকে অনুমান করা যায় যে, বিষ্ণু-দেবতার দলের সঙ্গে ইন্দ্র-দেবতার দলের বিরোধ হয়েছিল এবং সে বিরোধের মীমাংসা হয়েছিল দেবতাদ্বয়ের সখ্যবন্ধনে। সুতরাং ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সহযোগী এবং প্রধান দেবতা।

নিজের কৃতিত্বে বিষ্ণু ঋগ্‌বেদের সর্বপ্রধান দেবতা। তিনি আকাশকে ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে (এ ব্যাপার অন্ত দেবতার উপরও আরোপ করা আছে) এবং পূর্ব দিগন্তকে সুদূরপ্রসারী করে দিয়ে তিনি বিশ্বভুবন পায়ে বেড়িয়ে যায় দেবতা সকলের জন্তে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। তাঁরই তিন পদক্ষেপ ক্ষেত্রে "অধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা", বিশ্বভুবন বিরাজ করে। বিষ্ণুর ঊর্ধ্বতম পদ ব্যোমের উচ্চতম লোকে, তা সদা দেখতে পায় ভক্তেরা, যেন টানা চোখ আকাশের এপার ওপার ("দিবীব চক্ষুর্‌ আততম্")। ঊর্ধ্বতম বিষ্ণুপদ আনন্দে থাকে দেবভক্ত ব্যক্তিরা ("নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি")। মানুষেও ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সেই লোকে যাবার কামনা করে ("তা বাং বাস্তূনি উশ্মসি গমধ্যৈ")। সেখানে মধুর ঝরণা বয়ে যায় ("বিষ্ণো পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ"), যেখানে শৃঙ্গবান্ ক্ষিপ্রগামী গোরু আছে প্রচুর (' যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অযাসঃ") ।

এই যে বিষ্ণুলোকের ছবি পাই এতে তো পৌরাণিক ভাবনার গোলোকেরই পূর্বাভাস পড়েছে। তবে বৈদিক কবি পরবর্তী কালের ধর্মচিন্তকদের মতো পুরোপুরি পরলোকপন্থী ছিলেন। তাঁরা আর দুটি বিষ্ণুপদকেও—অন্তরীক্ষলোক এবং ভূলোক—অক্ষয় মধুপূর্ণ বলেছেন ('যস্য ত্রীঃ পূর্ণা মধুনা পদানি অক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি'') ।

কৃষ্ণের ব্রজলীলার আরও পূর্বাভাসও বেদের সূক্তে যে পড়েনি তা নয়। বিষ্ণু গোরু চরান ("বিষ্ণুর্‌ গোপাঃ" ১.২২.১৮)। তিনি গোয়ালের আগড় খুলে দেন সখার সঙ্গে ("ব্রজং চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে" ১.১৫৬.৪)। তবে তিনি শিশু নন, প্রকাণ্ডকায় নবযুবা ("বৃহচ্ছরীর···যুবাকুমারঃ" ১.১৫৫.৬)।

ঋগ্‌বেদের ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেন পুরাণের বলদেব ও বাসুদেব। গোকুলে তাঁরা খেলাধুলার ঝগড়া মারামারি করতেন। বিষ্ণু ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সখা ("ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা"', তাঁরা পরস্পর লড়াই করতেন এবং কেউ কাউকে হারাতে পারতেন না।

উভা জিগ্যথুর্ ন পরাজয়েথে
ন পরাজিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ।
ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং
ত্রেধা সহস্রং বি তদ্ ঐরয়েথাম্ ॥ ৬.৬৯.৮ ॥

'দুজনেই জিতলেন, কেউ পরাজিত হলেন না। এঁদের দুজনের কেউই পরাজয় পেলেন না। হে বিষ্ণু, ইন্দ্র (আর আপনি) যখন পরস্পর যুঝেছিলেন তখন তিন হাজার বার লড়াই করেছিলেন ॥'

ঋগ্‌বেদের বিশিষ্ট দেবতাদের মধ্যে ছিলেন যুগলদেব যাঁদের পুরানো নাম ছিল নাসত্য, কিন্তু ঋগ্‌বেদে যাঁরা অশ্বী (অর্থাৎ অশ্ববান্ দেবতা) নামেই প্রায় সর্বদা উল্লিখিত। এই যুগল দেবতাকে ইন্দ্র-বিষ্ণু জোটের সঙ্গে তুলনা করা যায়, বিশেষ করে বিষ্ণুর সঙ্গে (ইন্দ্রের সঙ্গে এঁদের বোধ হয় কিছু অসদ্ভাব ছিল)। বিষ্ণু মধুর ভাণ্ডারী অর্থাৎ আড়তদার, stockist আর অশ্বীরা হলেন মধুদাতা অর্থাৎ দোকানদার, distributor।

অশ্বীরা হলেন দ্যৌ-এর পুত্র ("দিবো ন পাতা"), গ্রীক ঐতিহ্যে Dios kouri। এঁদের সব কর্মই একত্র। এঁরা সহোদর, ভগিনী হল এঁদের উষা। উষা আবার প্রেয়সীও বটেন। ঘরের ঠাকুর, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের ভালোমন্দের জন্তে যে দেবতার দোহাই পাড়া হয় তেমন দেবতা ঋগ্‌বেদে প্রধানত, এমন কি একমাত্রও বলা চলে, এঁরাই। দুঃস্থ ও দুর্গত মানুষ ও জীব এঁদের দয়ায় উদ্ধার পেয়েছে। এসব মাহাত্ম্য এঁদের উল্লিখিত আছে ঋগ্‌বেদে। তাঁরা ভুজ্যুকে সমুদ্রে নৌকাডুবি থেকে উদ্ধার করেছিলেন, বৃদ্ধ চ্যবনকে যুবা করে দিয়েছিলেন, অত্রিকে অগ্নিদাহ থেকে এবং বন্দনকে গভীর গর্ত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, ক্ষতবিক্ষত মৃতকল্প রেভকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, বিমদকে পত্নী জুটিয়ে দিয়েছিলেন, ক্রুদ্ধ পিতা কর্তৃক অন্ধীকৃত ঋজ্রাশ্বকে চক্ষুষ্মান্ করে দিয়েছিলেন, খঞ্জ বিশ্‌পলাকে কাঠের পা করে দিয়েছিলেন, আইবুড়ো ঘোষার বিবাহ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, শয়ুর বুড়ো গাইকে দুধালো করে দিয়েছিলেন, বটের পাখিকে নেকড়ে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অশ্বীরা উষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। এঁরা তিনজনে যেন রাত্রিদিন ও দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণের প্রতীক ছিলেন। বৈদিক কবির ভাবনায় যেমন নক্ত (রাত্রি) ও উষা ছিলেন দুই বোন, একজন কালো একজন ফরসা, তেমনি অশ্বী দুজনও ছিলেন রাত্রির ও দিনের প্রতীক; একজন হলেন কালো দিন ("অহশ চ কৃষ্ণম্") আর একজন হলেন ফরসা দিন ("অহর্ অর্জুনং চ")। এই কালো সাদার বৈপরীত্য পৌরাণিক কৃষ্ণবিষ্ণু-কথার বাসুদেব ও বলরাম (এবং মহাভারতীয় আখ্যানে কৃষ্ণ ও অর্জুনের) মধ্যে দেখা যায়। ইন্দ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে রঙে এমন বৈপরীত্য ছিল কিনা জোর করে বলা যায় না, তবে অন্তদিক দিয়ে বৈদিক ইন্দ্রাবিষ্ণু যে পৌরাণিক সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবের ও মহাভারতীয় কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে তুলনীয় তা পরের আলোচনায় প্রতিপন্ন হবে।

ঋগ্‌বেদের পরে (অথবা সঙ্গে সঙ্গে) ঋগ্‌বেদীয় (এবং অতিরিক্ত অন্যান্য) মিথের সোজাসুজি ধারা প্রবাহিত হয়েছিল যে পথে তার কোনও সমসাময়িক চিহ্ন নেই। সামান্য কিছু অথর্ববেদে আছে তবে তা পৌরাণিক মিথগুলি বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই চিহ্নবিহীন মিথের ধারা কিন্তু লুপ্ত হয়নি, তা প্রকাশ পেয়েছে পুরাণের বিভিন্ন আখ্যায়িকায়, মহাভারতে, জনশ্রুতিবাহিত লোককথা-রূপকথায়। তবে সেখানে শুধু জটই পাকায়নি, খিচুড়িও পেকেছে। তাই পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বৈদিক, প্রাক্-বৈদিক ও অ-বৈদিক মিথের যোগাযোগ আবিষ্কার (অথবা কল্পনা) করা এত কঠিন। কিন্তু কঠিন হলেও তা সবক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। সেই অসম্ভবের চেষ্টা অনেকে করেছেন, আমিও করছি। তবে আমার দৃষ্টিকোণ আমার পূর্বগামীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভিন্ন। সে দৃষ্টিকোণ ঋগ্‌বেদের সূক্ত আর ব্রাহ্মণের গল্পকথার পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে।

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন গদ্যগ্রন্থগুলি (তার মধ্যে মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প শ্লোকও আছে) ঋগ্‌বেদের পরবর্তী রচনা, ঠিকই। কিন্তু কত কাল পরবর্তী রচনা, অর্থাৎ অব্যবহিত কিনা সে সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। ভাষায় যে পার্থক্য দেখা যায় তার উপর নির্ভর করলে বলতেই হয় যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি ঢের পরবর্তী কালের রচনা। কিন্তু ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিও তো সব একসময়ে রচিত হয়নি। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্তের (১০.৯০) ভাষা কি প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগ্রন্থের ভাষার চেয়ে প্রাচীনতর?

আসল কথা হল ঋগ্‌বেদ একজাতের গ্রন্থ, ব্রাহ্মণগুলি অন্যজাতের। ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি ছিল সূক্তকর্তা (অথবা বিশেষ বিশেষ দেবযাজী) পুরোহিতের বংশগত সম্পত্তি এবং তা দেবপূজার প্রধান অঙ্গ-স্তব। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি হল বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বড় বড় যজ্ঞযাজী পুরোহিতদের দর্পণ বা হ্যাণ্ডবুক। তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যাখ্যান এবং কথকতাও আছে। প্রধান ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি যখন লেখা হয়েছিল তখন এদেশে ধর্মকর্মে ও দেবভাবনায় কিছু কিছু নূতনত্বও এসেছিল। তখন সমাজ গড়ে উঠছে রাজাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণপুরোহিতদের দ্বারা। বাইরে থেকে এসেছে বিরাট অশ্বমেধ-যজ্ঞের রীতি, তৈরি হয়েছে রাজসূয়-যজ্ঞ। এসবের কোন ইঙ্গিত ঋগ্‌বেদে নেই। এ সবই গড়ে উঠেছিল সোমরস পান-উৎসব উপলক্ষ করে। সোম-রসের উল্লেখ থাকলেও আসলে সোমরস বস্তুটি যে কী তা ব্রাহ্মণরচয়িতাদের জানা

ছিল না। তাঁরা এর অনুকরণ সৃষ্টি করেছিলেন সম্ভবত তাও। এই যে "রাজা" "ব্রাহ্মণ" (পুরোহিত) আর বৃহৎ যজ্ঞকাণ্ড তার সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোনও যোগাযোগ ছিল না। এ ছিল অত্যন্ত high brow ব্যাপার। জনসাধারণের ধর্ম-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-ভাবনা সরাসরি ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদের ধারা বেয়ে অন্যান্য অনেক ধারাবাহী মিথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে-রূপ ও মূর্তি নিয়েছিল তার সঙ্গে ব্রাহ্মণগ্রন্থের তত্ত্বকথার সঙ্গে সরাসরি যোগ নেই। তবে গোড়ার দিকে যোগ না থাকলেও অচিরে তা ঘটেছিল। দেশে ধনীর অর্থাৎ সঞ্চিতধন ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ছিল এবং আভিজাত্যের জন্যে তাঁদের দ্বারস্থ হতে হত ব্রাহ্মণদের। জনসাধারণের ধর্ম-ব্যাপারের মোটামুটি মিল থাকলেও তাদের এক-এক গোষ্ঠীতে (এবং জনপদে) এক-এক মিথের ও তদাশ্রিত দেবতার প্রাধান্য থাকায় তাদের মধ্যে দেবারাধনা-বৈচিত্র্য দেখা গেল। আমাদের অনুসৃত ইতিহাস-সূত্র এইখান থেকেই খুঁজে নিতে হবে।

কিন্তু আমাদের আলোচনায় ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা করতে পারি না। লৌকিক (অর্থাৎ জনসাধারণে প্রচলিত) ধর্মবিষয়ের অনেক বিশিষ্ট বস্তুর মিথ ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতেই প্রথম জমে উঠেছিল। ঋগ্‌বেদের প্রধানতম দেবতা ছিলেন অগ্নি, কেননা তিনি সকল দেবতার প্রতিভূ। সকল দেবতাকে প্রদত্ত ঘি দুধ রুটি (পুরোডাশ), মাংস, বসা, অগ্নিতে উৎসর্গ করতে হত। তিনি যার যা প্রাপ্য তা সকলকে পৌঁছে দিতেন। প্রত্যেক গৃহস্থগৃহে গৃহদেবতারূপে অগ্নি থাকত। সেই অগ্নিকে গৃহস্থকে ("গৃহপতি") বিবাহকাল থেকে শুরু করে আজীবন সযত্নে পরিচর্যা করতে হত। গার্হপত্য অগ্নিকে জ্ঞান করা হত ঘরের ছেলে ("শিশুর্ দম")।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে বড়ো হয়েও অসুরেরা দেবতাদের কাছে হটে গিয়েছিল যজ্ঞপরাঙ্মুখতার জন্যে। এই মর্মের গল্প কিছু লেখা আছে ব্রাহ্মণগ্রন্থে। তখন বিষ্ণু হয়ে দাঁড়িয়েছেন যজ্ঞের প্রতীক। সুতরাং ব্রাহ্মণে বিষ্ণুদেবতারই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। ঋগ্‌বেদে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত বিষ্ণুর ত্রিপাদ নিক্ষেপ কাহিনী ব্রাহ্মণগ্রন্থে গল্পের রূপ পেয়েছে, এবং সেই গল্পই পরে পুরাণকাহিনীতে বলি-বামনের আখ্যানে পরিণত হয়েছে। এই আখ্যান আবার প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে পরে বিষ্ণুর দুটি অবতারে—নৃসিংহ ও বামন—ব্যাপ্ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচনার কালে যজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণদের উচ্চ অধ্যাত্মচিন্তা যজ্ঞকাণ্ডের

নিরর্থ জটিলতায় দিশাহারা হয়ে থাকেনি। সে চিন্তা দেবতা অসুর ও যজ্ঞকাণ্ড ছেড়ে বিশুদ্ধ ব্রহ্মচিন্তায় উন্নীত হয়েছিল। এই চিন্তাই প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার উচ্চতম ক্রমের পরিচয় দেয়। প্রধান ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির পরিশিষ্ট অংশ উপনিষদ্‌গুলিতে সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মচিন্তাই স্থান পেয়েছে। বলতে পারি উপনিষদেই প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তার দূরতম টার্মিনাস। এই উপনিষদ্ থেকেই বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনতত্ত্বের সূত্রপাত।

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে বাদ দিলে আমরা ঋগ্‌বেদ-অথর্ববেদ আর পুরাণ-ইতিহাসের মাঝখানে পাই প্রত্নলেখে এবং দু'চারটি প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত অথবা উদ্ধৃত কিছু কিছু তথ্য অথবা গল্পাংশ। প্রামাণিক গ্রন্থ মানে যে রচনাকে কোন নির্দিষ্ট কালে অথবা নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে লিখিত বলে ধরে নেওয়া যায়। যেমন পাণিনির সূত্র, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, পালি নিকায়গ্রন্থ, কালিদাসের কাব্যনাটক ইত্যাদি। নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে যা ফেলা যায় না—যেমন মহাভারত ও পুরাণগুলি—তাকে প্রত্নলেখের ও নির্দিষ্ট কাল মধ্যে লিখিত রচনার ঐতিহাসিক মূল্য দেওয়া যায় না। এইখানে আমার আলোচনার স্বতন্ত্রতা। আমার বিবেচনায় মহাভারতের ও পুরাণগুলির বক্তব্যের ঐতিহাসিক নিট-কালমূল্য সেই সেই পুঁথি লেখার কালের বেশি উপরে যায় না। মহাভারত যে রূপে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তার মূল রূপ ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে যায় না। মহাভারতের প্রাচীন পুঁথির—তাও সমগ্রের নয়, এক-আধটি পর্বের—লিপিকাল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর আগে যায় না। অধিকাংশ পুঁথিই পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা। সুতরাং মহাভারতের কোন উক্তি দিয়ে খ্রীস্টপূর্ব কালের ঘটনার সত্যতা নিরূপণ কল্পনার কাজ, তথ্যযুক্তির নয়। পুরাণগ্রন্থগুলির সম্বন্ধে এই কথা আরও বেশি করে খাটে। মহাভারত জমতে শুরু হবার বেশ কিছুকাল পরে তবেই পুরাণগুলি জমতে শুরু করে। ব্যতিক্রম হল 'হরিবংশ'। এটির প্রাচীনত্ব প্রায় মহাভারতের সমসাময়িক।

ঋগ্‌বেদের ইন্দ্রাবিষ্ণু পড়ে গিয়েছিলেন উচ্চবর্ণের—ব্রাহ্মণদের ভাগে, আর অশ্বী দুজন পড়েছিলেন নিম্নবর্ণের—জনসাধারণের ভাগে। দুটি জোড়া দেবতাই পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মে মিশে গিয়েছেন—প্রথমে জোড়া হয়ে সঙ্কর্ষণ-বাসুদেব বা কৃষ্ণ-বলরাম রূপে, এবং অল্পকাল পরে বা সমসময়ে—ভিন্ন জনগোষ্ঠীতে—এক হয়ে কৃষ্ণ-বিষ্ণু রূপে।

এখন দেখা যাক কিভাবে জোট পাকিয়ে এই নতুন জোড় গড়ে উঠেছিল।

ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রের সহকারী বিষ্ণু, ব্রাহ্মণগ্রন্থে ইন্দ্র দেবতাদের বলিষ্ঠ সুতরাং জ্যেষ্ঠ এবং বিষ্ণু কনিষ্ঠ। বিষ্ণু ঋগ্‌বেদে নবযুবা, ব্রাহ্মণে শিশু। পুরাণে বিষ্ণুর এক নাম 'উপেন্দ্র', এর দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে যে তিনি ইন্দ্রের ছোট ভাই। ব্রজলীলায় কৃষ্ণ প্রথমে শিশু পরে কিশোর। তারপরে তিনি নবযুবা। ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর ক্রীড়াযুদ্ধের যে উল্লেখ ঋগ্‌বেদে পেয়েছি তার দুরকম ছবি উঠেছে পুরাণে। এক বালক্রীড়ায় বিরোধ, তার উল্লেখ আছে পুরাণ-কাহিনীতে। দুই সত্য সত্য বিরোধ, যার কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই ঋগ্‌বেদে তবে অবান্তরভাবে থাকতে পারে। বৃত্র-ইন্দ্রের বিরোধ পুরাণ কাহিনীতে ইন্দ্র-কৃষ্ণের বিরোধ বলে—ব্রহ্মার শিশুবৎস হরণ ও গোবর্ধন ধারণ ঘটনা —ধরে নিলে একরকম সমাধান হয়। এর সঙ্গে অথবা এ ছাড়া আর একটি ঋগ্‌বেদের গল্পের কিছু যোগাযোগ থাকতে পারে। একটি সূক্তের তিনটি ঋকে অর্থাৎ শ্লোকে (৮.৯৬.১৩-১৫) ইন্দ্রের বিরুদ্ধে এককৃষ্ণ (অসুর? দাস?) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে অভিযান করে অংশুমতী (যমুনা?) নদীর তীরে এসে পতাকা গেড়েছিলেন। ইন্দ্র-শত্রু (?) এই প্রাক্‌ ঐতিহাসিক (?) কৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্লোক তিনটি এখানে অনুবাদসহ উদ্ধৃত করছি। এখানেও যুদ্ধ যেন ক্রীড়াযুদ্ধ, বাজি রেখে যুদ্ধ।

অব দ্রপ্‌সো অংশুমতীম্‌ অতিষ্ঠদ্‌
ঈয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবৎ তম্‌ ইন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তম্‌
অপ স্নেহিতীর্‌ নৃমণা অধত্ত॥

'অংশুমতীর ভাটিতে পতাকা গাড়া (হ'ল)। দশ হাজার (সেনা) নিয়ে এসে কৃষ্ণ রইলেন (সেখানে)। আমাদের দুজনের সাহায্য পেয়ে মানুষের প্রতি দয়ালু ইন্দ্র (যুদ্ধের শাঁখ) বাজিয়ে তার উপর ধারা বর্ষণ করলেন।'

দ্রপ্‌সম্‌ অপশ্যং বিষুণে চরন্তম্‌
উপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ।
নভো ন কৃষ্ণম্‌ অবতস্থিবাংসম্‌
ইষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ॥

'অংশুমতী নদীর বিজন ভূমিতে একদিকে পতাকা নড়তে দেখেছি। কালো মেঘের মতো দূরে রয়েছে যে কৃষ্ণ তার সঙ্গে তোমরা দুজন বীর বাজি রেখে যুদ্ধ করো, চাই (আমি)।'

অধ দ্রপ্‌সো অংশুমত্যা উপস্থে
অধারয়ৎ তন্বং তিত্বিষাণঃ।
বিশো অদেবীর্ অভ্যা চরন্তীর্
বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে॥

'এখন অংশুমতীর একান্তে পতাকা নিজের রূপের উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ করতে করতে স্থির হয়েছে সখা বৃহস্পতির সহযোগে সম্মুখীন হয়ে ইন্দ্র দেবতাদের বিরোধী দলকে পর্যুদস্ত করলেন।'

(ইন্দ্র ও কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ বিরোধের একটি কাহিনী আছে পুরাণে—পারিজাত-হরণ। ভার্যা সত্যভামাকে খুশি করবার জন্যে কৃষ্ণ স্বর্গের উদ্যান থেকে পারিজাত কেড়ে নিয়ে এসেছিলেন—এই গল্প।)

বেদে এক মানুষ-কৃষ্ণেরও সন্ধান পাই। তিনি ছিলেন অঙ্গিরস্‌-গোত্রীয়, অশ্বিদ্বয়ের উপাসক কবি। ঋগ্‌বেদে সংকলিত তাঁর একটি সূক্তে অর্থাৎ কবিতায় তাঁর ভনিতা আছে (৮.৮৫)। সে ভনিতা-শ্লোক দুটি এই—

অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনা
হবতে বাজিনীবসূ
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে॥ ৩॥

'হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের ক্ষমতার অন্ত নেই। এই (ব্যক্তি) কৃষ্ণ তোমাদের আহ্বান করছে মধু আর সোম কিছু পান করতে।'

শৃণুতং জরিতুর্ হবং
কৃষ্ণস্য স্তবতো নরা।
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে॥ ৪॥

'হে বীরদ্বয়, কান দাও স্তবকারী কৃষ্ণের আহ্বানে মধু আর সোম কিছু পান করতে।'

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানী গুরুবংশতালিকায় অঙ্গিরস-গোত্রীয় ঘোরের শিষ্য যে কৃষ্ণ দেবকীপুত্রের উল্লেখ আছে তিনি এই বৈদিক কবি হওয়াই সম্ভব। বৌদ্ধ ঘটজাতক কাহিনীতে যে বাসুদেবের গল্প আছে তা এই বৈদিক কবি অঙ্গিরস-শিষ্য কৃষ্ণ দেবকীপুত্রের সম্পর্কিত বলে বোধ হয়।

ইন্দ্রসখা, ইন্দ্রশত্রু ও ঋষি কবি-পণ্ডিত এই ত্রিবিধ কৃষ্ণের ইঙ্গিত ছাড়া আরও এক কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাই বৈদিক সাহিত্যে। তিনি ছিলেন এক

অপদেবতা, গন্ধর্ব, যাঁর ঝোঁক ছিল স্ত্রীলোকের উপর, বিশেষ করে সধর্ম স্ত্রীলোকের উপর। গন্ধর্বগৃহীত নারীর উল্লেখ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে। এই গন্ধর্ব কালো এবং "সর্বকেশবঃ" অর্থাৎ তাঁর সর্বাঙ্গে কেশ। অনেক পরবর্তী কালের লৌকিক কৃষ্ণ-কথা থেকে এই গন্ধর্বকৃষ্ণ বা কেশব-ভূতের সূত্র আবিষ্কার করা খুব দুরূহ নয়। কৃষ্ণের তমাল বৃক্ষে অধিষ্ঠান এবং তাঁর নারীলৌল্য এই সূত্রেরই হদিস দেয়। একদা যে ভূত-কৃষ্ণের কাহিনী অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ পাই বিহারের কোন কোন লোক-কথায় যেখানে বৃন্দাবনে ঈশ্বর-কৃষ্ণের নয় ভূত-কৃষ্ণের গতিবিধি ছিল (রায়চৌধুরী লিখিত, সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত 'ফোকলোর অব্ বিহার' দ্রষ্টব্য)।

বৈদিক সাহিত্যের পর—অর্থাৎ বাইরে—আর পৌরাণিক সাহিত্যের আগে—তখন পৌরাণিক সাহিত্য বলতে যা ছিল তা অস্ফুট ও অপরিণত অর্থাৎ মোটামুটি বলতে পারি খ্রীস্টপূর্ব সহস্রাব্দীর শেষ চার শতকে এবং তারপরে দু'তিন শতাব্দীতে—দুটি দেবতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি যাঁরা পৌরাণিক বলরাম ও কৃষ্ণের প্রচীনতর রূপ। এঁরা হলেন সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব। সঙ্কর্ষণের নামান্তর ছিল 'অর্জুন' (বলদেব অর্থাৎ শুভ্রকান্তি দেবতা)। এই নামেই তিনি পাণিনির সূত্রে (৪.৩.৯৫) উল্লিখিত হয়েছেন বলে মনে করি। মহাভারতের অন্যতম নায়ক অর্জুন বেশি খ্যাত হয়ে পড়ায় বোধ করি অর্জুন নামটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। 'সঙ্কর্ষণ' মানে যিনি টেনে আনতে পারেন। বলরামের বিশিষ্ট অস্ত্র তাই লাঙল যা ভূমিকর্ষণ করে। বলরামের একটি বিশিষ্ট কর্ম তাই যমুনা নদীকে টেনে নিয়ে যাওয়া। তাঁর জন্মকাহিনীতেও তাই বলা হয়েছে যে তিনি প্রথমে দেবকীর উদরে জন্ম নিয়েছিলেন তারপর সেই গর্ভ টেনে নিয়ে এসে রোহিণীর উদরে স্থাপিত করা হয়। এই গল্প দুটি, বিশেষ করে শেষেরটি, সঙ্কর্ষণ নামটিকে যথার্থ প্রতিপন্ন করবার জন্যে বিরচিত বলে মনে হয়। আর কোন বীরযোদ্ধার লাঙল অস্ত্র সাধারণ বুদ্ধিতে উপহাস্য মনে হয়। বলরাম কৃষির দেবতা নন, তাহলে লাঙল অস্ত্র চলত। তবে 'লাঙল' শব্দের একটা অর্থ ছিল আঁকশি (অঙ্কুশ): সঙ্কর্ষণের অস্ত্র অঙ্কুশ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বাসুদেব মানে মঙ্গলময় দেবতা। নামটির আসল মানে বসুদেবের পুত্র নয়। বরং পিতা বসুদেবের কল্পনা বাসুদেব নাম থেকেই গঠিত হয়েছে। 'বাসু' ও 'বসু' একই শব্দ। যে মূল ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষা উদ্ভূত সেই ভাষায় শব্দ দুটির রূপ ছিল যথাক্রমে *Swōsu ও *Swĕsu; প্রথম শব্দটি

আইরিশ ভাষায় চলে এসেছে, আর সংস্কৃত ভাষায় এসেছে 'বাসুদেব' এই নামে এবং 'বাসু' (অর্থ সুন্দরী নারী) ও 'বাসুরা' (অর্থ রাত্রি) শব্দে। সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব সরাসরি এসেছিলেন তাঁদের ভগিনী ও প্রিয়া একানংসা সুভদ্রাকে নিয়ে প্রাগ্‌বৈদিক অশ্বিদ্বয় ও উষা থেকে। তাঁরা ছিলেন বিশেষ এক যৌধেয়বংশের - নাম সাত্বত (বা বৃষ্ণি)—বিশিষ্ট উপাস্য দেবতারূপে। এই উপকথার ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলেছে অন্তত খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে। মাড়বারে ঘোসুণ্ডী গ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের উল্লেখ আছে, সেই সঙ্গে আছে 'অনিহিতা'র' উল্লেখ। এটি একানংসা-সুভদ্রার প্রাচীন নামান্তর বলেই গ্রহণীয়। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে নানাঘাট গুহালিপিতে বন্দনা অংশে ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, ধর্ম এই বৈদিক ও লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবও আছেন। এই সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের সঙ্গে পরে আরও দু'তিন জন বৃষ্ণিবংশ বীরের উল্লেখ (এবং পূজা) দেখা যায়। পৌরাণিক কাহিনীতে এঁরা বাসুদেবের পুত্র-পৌত্র— প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, শাম্ব। এই সাত্বত-বৃষ্ণি বীরেশ্বরদের কাহিনী হরিবংশে বিস্তৃতভাবে আছে। এই ঐতিহ্য খানিকটা আনাতোলিয়া (ফ্রিজিয়া) থেকে আগত হতে পারে।

সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবের গল্পকথা পৌরাণিক বলদেব-কৃষ্ণের কথার সঙ্গে মিশে গেছে। অনাহিতা একানংসা-সুভদ্রার কাহিনী তেমন মিলে যেতে পারে নি। গোড়ার দিকে যশোদানন্দিনী একানংসা চিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন এবং স্বর্গে ইন্দ্রের পূজা পেয়েছিলেন। আর শেষের দিকে তিনি বলরাম-কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রারূপে অর্জুনপত্নী হয়েছিলেন।

কিন্তু গল্পে যাই হোক না কেন, জনসমাজে ভাইবোন তিনজনের পূজা চলে এসেছে আজ পর্যন্ত—উড়িষ্যায় নীলাচলে শ্রীক্ষেত্রে। উড়িষ্যার বাইরেও যে এ ত্রয়ী দেবতার পূজার প্রচলন ছিল তার প্রতিমা ও শিলালেখের সাক্ষ্য মিলেছে।

অশ্বিদ্বয় ও বিষ্ণু-কৃষ্ণের একটি প্রধান যোগসূত্র হল 'মাধব' নামে। আগেই বলেছি বিষ্ণু বিশ্বের মধুর ভাণ্ডারী আর অশ্বিদ্বয়ই ছিলেন মধুর বিতরণকারী। সুতরাং মাধব নামটি দু'তরফেই সমান প্রযোজ্য। পৌরাণিক আমল থেকে আজ পর্যন্ত যজ্ঞাদি পূজার কাজে যিনি সর্বাধিনায়ক দেবতা তাঁর মাধব নামটিই যেন বিশিষ্টতম। তুলনা করুন এই মন্ত্র

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবঃ॥

বিষ্ণুদেবতার আরাধনায় গোড়ার কথাটি আশ্রয় করে আছে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্—এই তিনটি শব্দকে। তিনটি শব্দ সমধাতুজ, ভজ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যথাক্রমে ধাতুতে -ত' ("ক্ত") ও-'তি' ("ক্তি") ও প্রত্যয় দিয়ে এবং ভজ ধাতুজ ভগ শব্দে-'বন্ত্' ("মতুপ্") প্রত্যয় দিয়ে গড়া। 'ভজ্' ধাতুর মানে বেঁটে দেওয়া, অংশ পাওয়া, দায়াদ হওয়া। 'ভক্ত' মানে যিনি অংশভাক্, দায়াদ ইংরেজীতে sharer, share-holder। 'ভক্তি' মানে বাঁটোয়ারা, ভাগ করে দেওয়া, ইংরেজীতে to apportion, distribute, অথবা দলভুক্তির চিহ্ন, ইংরেজী করে বললে share certificate বা share mark। 'ভগবান্' মানে ভাগ বাঁটোয়ারার মালিক, ইংরেজী করে বললে stockist, যথার্থ প্রতিশব্দ হল lord ("রুটির মালিক")। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে শব্দগুলির মূলে ব্যবহার হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক (feudal) সমাজভাবনার আওতায়।

ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্ এই ত্রিমূল আশ্রয় করে উৎপন্ন ও বিকশিত বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাস নির্ভর করেছে প্রাচীনতর 'ভগ' শব্দটির উপর। এ শব্দ 'ভগবন্ত্' (ভগবান্) শব্দের মূল এবং এ শব্দ এসেছে ভজ্ ধাতুতে -'অ' ("অচ্") প্রত্যয় যোগ করে। শব্দটির মূলে মানে ছিল "ভাগযোগ্য (দাতব্য) দ্রব্য (খাদ্য) ভাণ্ডার"। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছরেরও আগে সংস্কৃত-গ্রীক-লাতিন প্রভৃতি ভাষা যাঁদের মাতৃভাষা ছিল তাঁদের বহু পূর্বপুরুষ যে ভাষাটি বলতেন সেই অনুমানলব্ধ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় শব্দটি প্রচলিত ছিল এখনকার দিনের ভগবান্, বিশেষ করে 'দাতা ভগবান্' অর্থে। এইখানে তখন যে দেবভাবনা ছিল তা খানিকটা সঙ্কুচিত হলেও ঋগ্বেদেও পৌঁছেছিল। ঋগ্বেদে "ভগ" দেবতা আছেন, তিনি একজন "আদিত্য" অর্থাৎ সূর্যবর্গের দেবতা। তাঁর সম্বন্ধে ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি (৭.৪১.৫) অনুধাবনীয়:

ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবাস্
তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।

'হে দেবগণ, ভগ যেন দানশীল হন। তাহলে আমরা ভগবান্ (অর্থাৎ ধনী) হব।'

লক্ষ্য করতে হবে যে, তখন ভগবন্ত শব্দটির আধুনিক অর্থ এসে যায়নি। বৈদিক ভগ দেবতার অন্তর্ধানের পরে তবে ভগবন্ত শব্দ ইন্দো-ইউরোপীয়

ভগ দেবতার প্রতিশব্দ হয়েছে। ভগ শব্দটি রয়ে গেছে ভগবন্ত্‌ শব্দের প্রকৃতির অর্থে (অর্থাৎ ধন, ঐশ্বর্য)। 'ভগ' যে একটা ফিউড্যাল-ভাবনার ঈশ্বর (God) ছিলেন তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে ঋগ্‌বেদে (৫.৪৬.৯): "ভগো বিভক্তা"।

পরবর্তীকালে ধর্মবিবর্তনে 'ভক্তি' শব্দটির অর্থে পরিবর্তন ঘটেছে, 'ভক্ত' শব্দের অর্থেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু 'ভগবন্ত্‌' শব্দে বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। যে কালে বিষ্ণু-উপাসনার উপর বাসুদেব উপাসনার গভীর ছাপ পড়ল সেই কালে 'ভগবন্ত্‌' শব্দটি সর্বেশ্বরের প্রধান অভিধারূপে চলে গেল। বিষ্ণু-উপাসনা বা আরও বেশ কিছুকাল পরে 'বৈষ্ণব'ধর্ম নাম পেয়েছিল তা এখন 'ভাগবত' মত বলে প্রতিষ্ঠিত হল। এর সাক্ষী মিলবে প্রচুর প্রাচীন প্রত্নলেখে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে (হেলিওদোরের স্তম্ভলেখ দ্রষ্টব্য)।

আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে বিষ্ণু-উপাসনা আমাদের দেশে চলে এসেছে আজ পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস পরীক্ষা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, এই উপাসনায় (বা 'ধর্মে') ধীরে ধীরে সিংহাসন থেকে বিষ্ণুর মূর্তি মুছে এসেছে। তার স্থানে ফুটে উঠেছে বাসুদেব ও কৃষ্ণ (অথবা বাসুদেব-কৃষ্ণ)। ভাবের দিক দিয়ে বিষ্ণুর উপর বাসুদেবের ছাপ পড়ল অশ্বিদ্বয়ের। দুটি দেবভাবনা সহজে বাঁধা পড়ে গেল 'মাধব' (=মধুভাণ্ডারী ও মধুদাতা) অভিধার শিকলে। অশ্বি দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন, যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে রাত্রির পুত্র (=কৃষ্ণ বাসুদেব), আর একজন উষার পুত্র (=অর্জুন, বলদেব সঙ্কর্ষণ[২])।

'বিষ্ণু' নামটির অর্থ যখন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন 'কর্মশীল', তাঁদের মতে শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে 'বিষ্‌'-ধাতু থেকে। এ ধাতুর আর একটি অর্থ হল 'পরিবেষণ করা'। ঋগ্‌বেদে আছে, বিষ্ণু ইন্দ্রের জন্যে প্রচুর ভোজ্য পাক করেছিলেন। পৌরাণিক 'মধুসূদন' নামেও তার ইঙ্গিত রয়েছে। ('মধুসূদন' নামটির আসল তাৎপর্য ভুলে গিয়ে এবং হনন করা অর্থে এক 'সূদ'-ধাতু কল্পনা করে পৌরাণিকেরা এক 'মধু' দৈত্যের নাম করেছেন।) মনে হয় 'বিষ্ণু' নামটি আসলে ইন্দো-ইউরোপীয় 'বেইস্‌-(weis-)' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এ ধাতুটি সংস্কৃতে বিলুপ্ত, এর অর্থ ছিল 'বেড়ে ওঠা, বিস্তীর্ণ হওয়া'। এই ব্যুৎপত্তি যে বিষ্ণুর সম্বন্ধে সব দিকেই খাটে তার প্রমাণ রয়েছে।

আগেই বলেছি যে, ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু শিশু নন, কিশোর যুবা। তিনি "যুবা-কুমারঃ"—'যুবা, বালক নন', তিনি "বৃহচ্ছরীরঃ"—'প্রকাণ্ডকায়' (১.১৫৫.৬)। তিনি লম্বা লম্বা পদক্ষেপ করেন ("উরুক্রম"), তিনি দূরগামী ("উরুগায়")। বিষ্ণু তিন পদক্ষেপ করে বিশ্বভুবনকে মেপে ফেলেন এবং তাঁর তিন পদাঙ্কে বাস করে যায় দেবতারা সমেত সবাই। বাহ্যিক অর্থেও বিষ্ণু ঋগ্‌বেদীয় দেবতাদের মধ্যে উচ্চতম স্থানারূঢ়। তাঁর চরমধাম দ্যুলোকের ঊর্ধ্বতম স্থানে। সে স্থান বিষ্ণু উপাসকদের কাছে প্রতিভাত হয় যেন আকাশে বিস্তীর্ণ একটি চোখ জলজল করছে।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুর আততম্ ॥ ১.২২.২০ ॥

(এই ধাম প্রাচীন পৌরাণিক কল্পনায় 'বৈকুণ্ঠ', নবীন পৌরাণিক কল্পনায় 'গোলোক'।) বিষ্ণু (ও ইন্দ্রের) সেই ধামে (বা আশ্রমে 'বাস্তুনি") উপাসকেরা গমন করতে চান ("উশ্মসি গমধ্যৈ")। যেখানে আছে "ভূরিশৃঙ্গ" ক্ষিপ্রগামী[৩] গোরু, যেখানে মধুর পরম উৎস (১.১৫৬.৬)। শুধু সেখানে কেন বিষ্ণুর আর দুটি পদাশ্রয়েও অক্ষয় মধুর পরিপূর্ণ আনন্দ উৎসার (১.১৫৬.৭)।

বিষ্ণু ঠিক সূর্যদেবতা নন। সূর্য সবিতা বা পূষার সঙ্গে তাঁর মিল থাকলেও তাঁকে ওঁদের কারো সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। বিষ্ণুকে বলা যায় সৌর-মণ্ডলের বা কালচক্রের দেবতা। তিনিই সূর্যকে চক্রভ্রমণারূঢ় করেছেন, তিনিই দিবারাত্রি চতুঃসংবৎসর বিভাগ ব্যবস্থা করেছেন (১.১৫৬.৬ কথ; ১.১৬৭.৮)। পৌরাণিক ঐতিহ্যে বিষ্ণু হলেন "সবিতৃমণ্ডলবর্তী নারায়ণ"[৪] সম্ভবত এ কল্পনা এসেছে "দিবীব চক্ষুর আততম্" ভাবনা থেকে। পৌরাণিক বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র, এমন কি তাঁর সিম্বল, হল চক্র অর্থাৎ সূর্য।

বিষ্ণুর অস্ত্র চক্র তাঁর সিম্বল হবার আগে সিম্বল হয়েছিল গরুড় (পক্ষী)। ভগবান্ বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে পুরানো নজির পাচ্ছি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে (বেসনগরে হেলিওদোরের স্তম্ভ)। বিষ্ণুর গরুড় সিম্বলের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা হয় আবেস্তায় আহুরমজ্‌দার সিম্বল পাখা ছড়ানো পাখির সঙ্গে। এখানে মনে রাখতে হবে, আবেস্তায় যেমন আহুর-মজ্‌দার কোন মূর্তি নেই বেসনগরে স্তম্ভের অথবা ওরিসস খ্রীস্টপূর্ব প্রাচীন প্রত্নসামগ্রীতে বিষ্ণু-বাসুদেব-কৃষ্ণের কোনও মূর্তি পাওয়া যায় না।

বাসুদেব (কৃষ্ণ) ও সঙ্কর্ষণ (বলদেব) বৈদিক ঐতিহ্যের দেবাসুর (পরবর্তীকালে দেবদানব) মিলে যেভাবে উদ্ভূত হয়েছিলেন তা নক্শা কেটে দেখালে সুগম হবে।

দেব			অসুর-দানব		
বিষ্ণু	অশ্বী (কৃষ্ণ)	অশ্বী (শুক্ল)	কৃষ্ণ	বল	রৌহিণ*
বাসুদেব (কৃষ্ণ)			সঙ্কর্ষণ (বলদেব)		

বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের উপাসনা নিয়েই 'ভাগবত' ধর্মের শুরু। এইটিই বৈষ্ণব-ধর্মের প্রথম নাম। খ্রীস্টপূর্ব শতাব্দীগুলিতে এবং খ্রীস্টপর সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এই নামই চলিত ছিল। বৈষ্ণব অর্থে 'ভাগবত' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ যা আমরা জানি না—পাই খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি প্রত্নলেখে (মধ্যভারত বেসনগরে প্রাপ্ত হেলিওদোরের গরুড়স্তম্ভ লিপিতে) ভাগবতধর্মের—শুধু ভাগবতধর্মের কেন ভারতীয় ধর্মচিন্তায়—বোধ করি মহত্তম বাণী রয়েছে এই লেখে উৎকীর্ণ।

॥ত্রিনি অমুতপদানি [ইহ] [সু-] অনুঠিতানি নেঅন্তি [স্বগং] দম চাগ অপ্রমাদ॥

'তিনটি অক্ষয় সোপান সু-অনুষ্ঠিত হলে স্বর্গে নিয়ে যায়—প্রবৃত্তিসংযম, ভোগসংযম ও সজাগ সতর্কতা।'

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকে শিব-উপাসনায়—যা প্রথমে "যোগী"-ধর্মের আওতায় ছিল তা স্বতন্ত্র হয়ে ভক্তি-সাধনার রঙ গ্রহণ করেছিল। কালক্রমে "ভাগবত" অভিধাটি এঁদের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হতে থাকে, বিশেষ করে শিবের ভার্যা 'ভগবতী' নাম পাওয়া যায়। তার ফলে নৃপতিদের শাসনে পরমভাগবতের স্থানে "পরম বৈষ্ণব" দেখা দেয়। 'বৈষ্ণব' শব্দটি এখানে মাহেশ্বর' শব্দের বৈপরীত্যেই প্রযুক্ত হতে থাকে।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি ভাগবত-বৈষ্ণব ধর্মে লোকভাবনায় ও লোকসাহিত্যে শিশু-কৃষ্ণের সমাদর জাগ্রত হয়েছিল। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু শিশু নন, বালকও নন, তিনি প্রৌঢ়কিশোর বা যুবা। কিন্তু তাঁর যে অগ্নিস্বরূপ গৃহস্থের ঘরে ঘরে গৃহদেবতার মতো প্রত্যহ পূজিত হত সেই গার্হপত্য অগ্নিকে বৈদিক কবি ঘরের ছেলের মতো দেখতেন। তাই গার্হপত্য অগ্নিকে ঋগ্‌বেদের কবি বলেছেন "শিশুর্ দন্" অর্থাৎ ঘরের শিশু, ঘরের কর্তা-গিন্নির ("পতী দন্") বৈপরীত্যে 'ব্রাহ্মণ' নামক বৈদিক সাহিত্যের গদ্যগ্রন্থগুলিতে বিষ্ণু যজ্ঞীয় অগ্নি ও যজ্ঞের সঙ্গে মিলে যায় এবং তাঁর শিশুরূপ অবলম্বন করে গল্প গড়ে ওঠে। এই গল্পে পাই যে দেব-অসুর ছিলেন বৈমাত্র জ্ঞাতিগোষ্ঠী।

অসুরেরা ছিলেন কর্মিষ্ঠ, দেবতারা ছিলেন অলস। এই সূত্রে অসুরদের মধ্যে জাতিবিরোধের ভাব জাগে। তাঁরা দেবতাদের না জানিয়ে পৃথিবীর সব স্থান নিজেদের খাস করে নিলেন। তখন দেবতারা খুব ফাঁপরে পড়েন। তাঁদের অন্তত সামান্য একটুও নিজস্ব স্থান চাই নইলে যজ্ঞ করবেন কি করে। তাঁরা শিশু-বিষ্ণুকে সঙ্গে করে অসুরদের কাছে সামান্য একটু স্থান—বিষ্ণু শুলে যতটুকু হয় ততটুকু—যজ্ঞ করবার জন্যে চাইলেন। অসুরেরা তা দিলেন। বিষ্ণু মাটিতে শুয়ে চারিদিকে হু হু করে বাড়তে লাগলেন। তার ফলে অসুরেরা পৃথিবী (অর্থাৎ ভারতবর্ষ?) থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেলেন।

এই ব্রাহ্মণের গল্পটি ঋগ্‌বেদের উরুক্রম বিষ্ণুর মিথের সঙ্গে মিলে গিয়ে পৌরাণিক গ্রন্থে বলি-বামন উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছে।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে শিশু-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী যে সাধারণ জনসমাজে বিশেষ করে নারীসমাজে গানে-গাথায় ও গল্পে সমাদৃত ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু এই লোকভাবনার প্রত্যক্ষ ফলরূপে যে শিশু-কৃষ্ণের পূজা চলিত হয়েছিল তা বলা যায় না। এখানে ইতিহাসের অনুরোধে খ্রীস্টীয় ধর্মের কিছু প্রভাব মানতে হয়। শিশু-কৃষ্ণের বা বাল-গোপালের পূজা খ্রীস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দী শেষ হবার আগেই দেখা দিয়েছিল। যতদূর অনুমান করা যায় তাতে মনে হয় এ পূজারীতি দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে এসেছিল। দক্ষিণ ভারতে কেরলে খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে সিরীয় খ্রীস্টানের সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপিত হয়। সেই আদি আগত সিরীয় খ্রীস্টানদের ধর্ম-আচরণ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই। তবে একথা ঠিক যে তাঁরা মেরী মাতা ও তাঁর শিশু পুত্রকে পূজা করতেন। সেই সূত্রে আমাদেরও শিশু-কৃষ্ণের ভাবনায় দেবভাবনার ও বিষ্ণু ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল।

গোপাল কৃষ্ণের উপাসনা আমাদের বাংলাদেশে যে অষ্টম শতাব্দীর আগেই এসেছিল তার একটি অবান্তর প্রমাণ হল পালরাজা ধর্মপালের পিতার নাম, 'গোপাল'। দেবতার নামে নাম রাখা আমাদের দেশের খুব প্রাচীন রীতি। যেমন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, দেবদত্ত, অগ্নিমিত্র, রুদ্রদাম, বিষ্ণুরাত ইত্যাদি। (ধর্মপালেরা যে বৈষ্ণব উপাসক বংশ ছিলেন তা আরও বোঝা যায় তাঁর প্রপিতামহের নাম "দয়িতবিষ্ণু' থেকে। ধর্মপালের পিতামহের নাম 'বপ্যট'—ডাক নাম, মানে, "বেয়াড়া"।)

বালগোপালের উপাসনা বৈষ্ণবধর্মকে সর্বাত্মক ভক্তিধর্মে পরিণত করলে।

এর মধ্যে খানিকটা বৌদ্ধ মহাযান মতেরও প্রভাব আছে। মহাযানীদের উপাস্য করুণাঘন অবলোকিতেশ্বর বিষ্ণুরই যে পরিণত রূপ। চৈতন্যের ধর্ম, যা বৈষ্ণবধর্মকে তার চরম পরিণতি দিয়েছে, তাতে অবলোকিতেশ্বরের করুণার যোগান অনেকটাই আছে "জীবে দয়া"—এ মন্ত্র সেই সূত্রেই এসেছে।

এ প্রবন্ধ আর বাড়াব না। বাড়ালে শেষ হবে না। শুধু একটি কথা বলবার আছে। চৈতন্য বৈষ্ণবধর্মকে চরম রূপ দিয়ে গেছেন। সে রূপের তিনটি স্বরূপ—(১) জীবে দয়া, (২) নামে রুচি, (৩) ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক।

দ্বিতীয় স্বরূপটি চৈতন্যের ধর্মকে ইউনিভার্সাল ধর্মে উন্নীত করেছে। চৈতন্য মূর্তিপূজা করতে বলেননি, ঈশ্বরের নাম নিতে বলেছেন এবং আরও বলেছেন ঈশ্বরের অসংখ্য নাম, তার থেকে যে কোনটি নিলেই হবে। এইখানে চৈতন্য হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে মিলনের সেতু বেঁধে দিয়েছিলেন।

পাদটীকা

১। সম্ভবত 'অনাহিতা' ঠিক পাঠ হবে। শব্দটির অর্থ একানংসার তুল্য। 'অনাহিতা' মানে অবিবাহিতা বা নিষ্কলঙ্কা, 'একানংসা' মানে এক (=অবিবাহিতা) ও অস্পৃষ্টা। দেবী অনাহিতা'র উল্লেখ আবেস্তায় ও প্রাচীন পারসীক শিলালেখে আছে।

২। উষার পুত্র হিসাবে 'সঙ্কর্ষণ' নামটির সার্থকতা আছে। উষা জেগে উঠে তাঁর ব্রজের দ্বার খুলে দেন, গোরু বেরিয়ে আসে। তাদের ডেকে নিয়ে জড় করে যিনি চরাতে নিয়ে যান তিনিই 'সঙ্কর্ষণ'। গোপবালক হিসাবে এইখানে সার্থকতা।

৩। হরিণের মতো শাখাময় শিঙযুক্ত গোরুর মূর্তি মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় মিলেছে।

৪। 'নারায়ণ' শব্দটির আসল মানে হল "বীরকীর্তি"। এই অভিধাটি বিষ্ণু-কৃষ্ণের হাইকোনের মতো ক্ষীণমূর্তি দেবভাবনার পাষ্টমূর্তি অবতারভাবনার সেতুব হতো।

৫। ইন্দ্রশত্রু রৌহিণের উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে (২.১২.১২)।

আদিতে বাক্য ছিলেন

ছেলেবেলায় একদা পড়েছিলুম যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রথমেই

আদিতে বাক্য ছিলেন

বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন

বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন।

কেন জানি না হঠাৎ সেদিন মনের মধ্যে এই তিনটি ছত্র গুঞ্জরিত হয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে বোধ হল যেন বেদেও কোথায় এমনি বাক্-ব্রহ্মের ইঙ্গিত আছে। আইডিয়াটা জুড়োতে না দিয়ে ঋগ্‌বেদ খুলে দশম মণ্ডলের ১২৭ নম্বর সূক্তটি দেখলুম। সূক্তটি বাক্-সূক্ত নামে পরিচিত। প্রাচীন বেদবিশারদ পণ্ডিতেরা বলে গেছেন সূক্তটি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাকের উক্তি। (অম্ভৃণ নামে কোন ঋষির উল্লেখ কোথাও নেই, তবে এই নামে এক অসুর উল্লিখিত আছে ঋগ্‌বেদে। তবে কি অম্ভৃণ ছিলেন অসুরদের ঋষি?) সূক্তটিতে কিন্তু বাকের নামগন্ধ নেই। অথচ কবিতাটি নারীর উক্তি এবং সে নারী মুখ্য মুখ্য দেবতার পরিচালিকা বলে দাবি করেছেন। পরবর্তী কালে শাস্ত্রকারেরা সূক্তটিকে এই কারণেই ঈশ্বরকে নারীরূপে ভাবনার উৎস বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাই কবিতাটি এখন "দেবীসূক্ত" নামে চলে।

সূক্তটির যথাযথ অনুবাদ করে বন্ধনী মধ্যে টীকা দেওয়া গেল। তাতে আমার বক্তব্য অনুসরণ করা সহজ হবে। যৎকিঞ্চিৎ পাঠান্তর সমেত সূক্তটি অথর্ব-সংহিতায়ও আছে। তবে সেখানে ঋক্‌গুলির পৌর্বাপর্য ঋগ্‌বেদের তুলনায় বিপর্যস্ত। অথর্বসংহিতায় থাকার মানে হল সূক্তটি খুব প্রাচীন নয় (অথবা ঋগ্‌বেদের মূল ধারাবাহী নয়।) এবং আথর্বাণ যজ্ঞকাণ্ডে সূক্তটির ব্যবহার ছিল।

১। আমি রুদ্রদের, বসুদের সঙ্গে চরে বেড়াই। আমি আদিত্যদের বিশ্বদেবদের সঙ্গেও।

আমি মিত্র-বরুণ উভয়কেই পোষণ করি। আমি ইন্দ্র-অগ্নিকে, উভয় অশ্বিনৃকে॥

[রুদ্রদের মানে রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণের। মরুতেরা গণদেবতা। বসুরা সংঘদেবতা, পুত্যতায় মরুদ্‌গণের উপরে। মরুদ্‌গণের কারো ব্যক্তিনাম নেই

বসুদের কারো কারো আছে। আদিত্যরা অদিতিপুত্র, এঁদের অনেকেই ব্যক্তিনামে সুপরিচিত। এঁরা প্রভুদেবতা। বসুরা ঋদ্ধিদেবতা, রুদ্রেরা যোদ্ধাদেবতা। বিশ্বদেব বলতে ঠিক সব দেবতার সমষ্টি বোঝায় না, যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে আহূত প্রধান প্রধান দেবতার নাম না করে একত্র উল্লেখ বোঝায়। মিত্র ও বরুণ "আদিত্য" হয়েও পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছেন এই কারণে যে সূক্তটির রচনাকালে মিত্র ও বরুণ যুগ্মদেবতারূপে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।

ঋক্‌টির মর্মার্থ—আমি ছোট দেবসমাজের সংঘশক্তি, তাঁদের পালিকা। আমি বড় দেবতাদের পুষ্টিশক্তি, তাঁদের ধাত্রী।

২। আমি নিষ্কলিত সোমকে পোষণ করি। আমি ত্বষ্টাকে পূষন্‌কে আর ভগকে।

আমি ধন দিই হবিষ্মান্ সুস্তোতা সোমযাজী যজমানকে।

(মর্মার্থ—যেসব দেবতার মাহাত্ম্য যজ্ঞকাণ্ডেই খ্যাপিত, তাদের মূলে আমিই।)

৩। আমি বসুদের পাচনবাড়ি জ্ঞানময়ী, যজ্ঞার্হাদের মধ্যে প্রথম।

সে আমাকে দেবতায় বহু পাত্রে ন্যস্ত করেছে,—বহুস্থলবাসিনী,

বহুস্থানদায়িনী।

(প্রথম অর্ধে নতুন কথা নেই। দ্বিতীয় অর্ধের মর্মার্থ—আমি অংশকলারূপে সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি।)

৪। আমার দ্বারা সে অন্ন খাচ্ছে যে দেখছে যে বেঁচে আছে যে কানে শুনছে।

না জেনে তাঁরা আমাতেই রয়েছে। শোন শ্রোতা, শ্রদ্ধার কথা তোমাকে বলছি।

(মর্মার্থ—আমিই সর্বজীব পোষণ ও পালন করি।)

৫। আমি নিজে এ কথা বলছি—দেবতাদের ও মানুষদের রুচিকর। যাকে চাই তাকে, তাকে আমি উদ্দীপ্ত করি, তাকে ব্রহ্মা, তাকে ঋষি, তাকে মেধাবী॥

ব্রহ্মা মানে বেদজ্ঞ যাজক। ঋষি মানে বেদসূক্তের প্রণেতা, সর্বমান্য বংশকর্তা গৃহস্থ।

(মর্মার্থ—মানুষের দেহমনের সব শক্তিই আমার থেকে।)

৬। আমি রুদ্রের হয়ে ধনুকে টান দিই ব্রহ্মদ্বেষী শত্রুকে মারতে।

আমি জনে জনে বিরোধ লাগাই। আমি দ্যুলোকে-ভূলোকে প্রবিষ্ট।

(প্রথম ছত্রের মর্মার্থ—দুষ্ট-সংহারে রুদ্রের শক্তি আমিই। দ্বিতীয় অর্ধের মর্মার্থ—দুষ্টশক্তিও আমি। ত্রিভুবন আমার শক্তিক্ষেত্র।)

৭। আমি প্রসব করি পিতাকে এর মাথায়। আমার উৎপত্তি সলিলে সমুদ্র মধ্যে।

সেখান থেকে জুড়ে আছি বিশ্বভুবন। এবং এই দ্যুলোক আমি প্রাংশুতায় ছুঁয়ে আছি।

(প্রথম অর্ধের মর্মার্থ—আমার আদি ও অন্ত সীমা করা যায় না, কার্যকারণের বাইরে। দ্বিতীয় অর্ধের মর্মার্থ—বিশ্বভুবন আমাতে ওতপ্রোত। অর্থাৎ উপনিষদের অধ্যাত্মচিন্তার সর্বং-খলু-ইদং যে ব্রহ্ম সে আমিই।)

৮। আমিই যেন হাওয়ার মতো বয়ে যাই বিশ্বভুবনকে কোলে নিয়ে।

দ্যুলোকের বাইরে এই পৃথিবীর বাইরে—এমন মহিমায় আমি সম্ভূত ॥

(প্রথম অর্ধের মর্মার্থ—সংসারচক্র আমারই আবর্তন। দ্বিতীয় অর্ধের মর্মার্থ—ব্রহ্মাণ্ড আমার পরিসীমা নয়।)

সূক্তটিকে নারী-ঈশ্বরের বাণী বলে ধরলে ব্যাখ্যা ও ভাবার্থ একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে। প্রথম ঋকে বলা হয়েছে—ছোট দেবতা সব আমার পশু। বড় দেবতা সব আমার শিশু। কেউ কেউ বা কিঙ্কর। প্রথম ঋকের ভাবানুবৃত্তি করে দ্বিতীয় ঋকে বলা হয়েছে যজ্ঞের মূল দেবতা, অর্থাৎ যজ্ঞফল দাতা আমিই। তৃতীয় ঋকে বলা হয়েছে—আমি গিন্নী, আমিই কর্তা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার ঘরকন্না। সে ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আমার পোষ্য দেবতারাই করে দিয়েছে। চতুর্থ ঋকে ছান্দোগ্য উপনিষদে তৎ-ত্বম্-অসিরই উল্টো বাণী—সে সব আমিই। অর্থাৎ তদ্-আহম্-অস্মি। আমিই জীবের জীবন, সর্বভূতান্তরাত্মা। পঞ্চম ঋকের বক্তব্য—আমি সব করতে পারি, আমি পরম ঈশ্বর। পুরাণ-কাহিনীতে রুদ্রের সঙ্গে নারী-পরমেশ্বরের যে অত্যন্তসংযোগ উল্লিখিত আছে তার আভাস রয়েছে ষষ্ঠ ঋকে। নারী-পরমেশ্বর রুদ্রের বাহুবল তাঁর শক্তি। (মার্কণ্ডেয়-পুরাণের চণ্ডী-সপ্তশতীতে দেবী শুধু রুদ্রের নন সমস্ত দেবতার শক্তির ঘনীভূত মূর্তি। এ যেন তৃতীয় ঋকে উল্লিখিত বিভজন ব্যবস্থার বিপরীত। ইনি লোকসাহিত্যের, চণ্ডীর মতো বিবাদ সংঘর্ষের মূলেও আছেন। সপ্তম ঋকে

বলা হয়েছে—ইনি বিশ্বমাতা, সৃষ্টিকর্তারও মতো। অষ্টম ঋকের প্রতিপাদ্য—ইনি বিশ্বভুবনের ধাত্রী তবে বিশ্বভুবনে বাঁধা নন।

ঋক্-সংহিতায় অনুক্রমণী অনুসারে সূক্তটির "ঋষি" (অর্থাৎ প্রণেতা বা উৎস) এবং "দেবতা" (অর্থাৎ উদ্দিষ্ট উদ্দিষ্টদেব) দু-ই "বাগ্ আম্ভৃণী"। নামটিকে ব্যাখ্যা করে সায়ণ বলেছেন যে, বাক্ ছিলেন এক ব্রহ্মজ্ঞা ঋষিকা, অম্ভৃণের

"অম্ভৃণ" শব্দটি ঋক্‌বেদে শুধু এই একস্থানে পাওয়া যায় (১.১৩৩.৫)

পিশঙ্গভৃষ্টিম্ অম্ভৃণং
পিশাচিম্ ইন্দ্র সং মৃণ।
সর্বং রক্ষো নি বর্হয়।

অনুবাদ করলে হবে

রক্তাগ্র শূলধারী অম্ভৃণ পিশাচিকে (অথবা পিশাচি অম্ভৃণকে) ইন্দ্র, বিচূর্ণ কর। সব রক্ষকে ধ্বংস কর॥

সন্দেহ রয়ে যায়, "অম্ভৃণং" নাম না বিশেষণ। এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। "পিশাচি" আর কোথাও নেই, তবে "পিশাচী" আছে অথর্ব-সংহিতায়। স্পষ্টই এ শব্দটি পিশাচের সঙ্গে সংবদ্ধ। আপাতত পিশাচিও পিশাচের সঙ্গে সংবদ্ধ ধরা যেতে পারে। ঋক্-সংহিতার বাক্‌ব্যবহার অনুসারে "পিশাচি" ব্যক্তিনাম আর "অম্ভৃণ" বিশেষণ। সেইভাবে গেল্‌ড্‌নেরও ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ আবার "পিশঙ্গ ভৃষ্টি", "পিশাচি" এবং "অম্ভৃণ" তিনটিকেই ব্যক্তিনাম ধরতে চান। সে যাই হোক, শ্লোকটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে "অম্ভৃণ পিশাচি" অথবা "পিশাচি অম্ভৃণ" একজন প্রধান রক্ষস্। "রক্ষস্" মানে "যজন্ত"—(অর্থাৎ দেব-) উপাসকদের অনিষ্টকারী বিপক্ষ দেবশক্তি যার থেকে দেবযাজীরা রক্ষা চাইতেন। অনুক্রমণীর নির্দেশ মানলে আলোচ্য সূক্তের প্রণেত্রীকে অম্ভৃণ-উপাসকদের (অসুরদের ?) ব্রহ্মবাদিনী বলব।

এখন আসল কথায় ফিরে আসি।

সূক্তটির "অহম্" যে বাক্ তা বোঝাবার কোন সূত্র তার মধ্যে নেই। তবে অন্যত্র সে সূত্র আছে এবং তা ধরে সে অনুমানে নির্ঘাত পৌঁছানো যায়।

সে সূত্র দেখাই।

যদ্ বাগ্ বদন্তি অবিচেতনানি
রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা।

চতস্র ঊর্জং দুদুহে পয়াংসি
ক স্বিদ্ অস্যাঃ পরমং জগাম ॥ ৮.১০০.১০

দেবতাদের কর্ত্রী (রাণী, মণ্ডনারিকা) বাক্ (তখন) অস্ফুট-মধুর (হয়ে) অজ্ঞান (প্রাণীদের) মধ্যে বসেছেন যখন (তারা) কথা বলে।

চার (ধারায়) দোয়া হল শক্তি, দুধ।
কে কোথায় এর শেষ পেয়েছে ॥
দেবীং বাচম্ অজনয়ন্ত দেবাস্
তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। ৮.১০০.১১ কথা ॥
দেবী বাককে দেবতারা জন্ম দিয়েছিল।
বিশ্বরূপ পশুরা তা ব্যবহার করে।

আমাদের আলোচ্য সূক্তের তৃতীয় ঋকের দ্বিতীয়ার্ধ এই সঙ্গে তুলনা করা যায়।

বৈদিক কবিভাবনায় বাক্ যেন গোমাতা, দেবমাতা অদিতির মতো। আলোচ্য সূক্তের "অহম্" এই অদিতি-বাক্-ধেনু হতে বাধা নেই। বরং সঙ্গতি আছে। বাছুরের সঙ্গে গোরু চরে, সে বাছুরকে রক্ষা করে। গোরুর দুধে পুষ্টি হয়, শক্তি লাভ হয়, ধনলাভও হয়।

রুদ্রদের, বসুদের ও আদিত্যদের সঙ্গে যিনি চরে বেড়ান সেই "অহম্" যে নারী তা বিশেষণ থেকেই উপলব্ধ হয়। ইনি যে গোরূপা এবং রুদ্রতনয়দের মাতা, আধুনিক কালের ভগবতী, আর ইনি যে বসুদের কন্যা এবং আদিত্যদের ভগিনী, তা বলা হয়েছে অন্যত্র (৮.১০১.১৫)। পুরাণ কাহিনীতে দক্ষকন্যা সতী যজ্ঞকুণ্ডে আত্মাহুতি করেছিলেন। এখানে দেখছি তাঁকে যেন যজ্ঞীয় পশু করে বধের উদ্যোগ হচ্ছে। তিনি যেন জ্ঞানীদের নিষেধ করেছেন, বলছেন—(আমি) অদিতি, নিষ্পাপ। (আমাকে) বধ ক'রো না।

মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং
স্বসাদিত্যানাম্ অমৃতস্য নাভিঃ।
প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায়
মা গাম্ অনাগাম্ অদিতিং বধিষ্ট ॥ ৮.১০১.১৫ ॥
রুদ্রদের মাতা, বসুদের দুহিতা,
আদিত্যদের ভগিনী, অমৃতের কুণ্ড।
জ্ঞানীজনকে ভালো করে বলছি,
নিষ্পাপ অদিতিকে বধ কোরো না ॥

যজ্ঞার্থে (?) বধ-ভয়ার্তা গোরূপধরা উর্বীর অহুনর আবেস্তার প্রাচীনতম অংশে গাথায় প্রতিধ্বনিত আছে। সুতরাং এ কল্পনা বেশ প্রাচীন। আবেস্তার গো-মাতার অহুনয় বীর বিচক্ষণের কাছে নয় স্বয়ং "জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অহুরমজদার কাছে।

যদি কল্পনা করে নিই বধভীত গো-বাক্ মাতা অন্তর্হিত হয়েছিলেন তাহলে পরের ব্যাপারটুকু দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে (৭১. ৩-৬) ধরতে পারি। অত্যন্ত কবিত্বময় বর্ণনা।

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়ম্ আয়ন্
তাম্ অন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।
তাম্ আভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
তাং সপ্ত রেভা অভিসংনবন্তে ॥৩॥

(পলাতক) বাকের পদচিহ্ন পেলেন (দেবতারা)। খুঁজে পেলেন ঋষিদের মধ্যে প্রবিষ্ট (তাঁকে)
তাঁকে নিয়ে এসে অনেক ভাগ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে সাতজন রেভ স্তব করে থাকে ॥

("রেভ" কথাটির মানে জানা নেই। তবে এর সঙ্গে সংবদ্ধ "রৈভী" শব্দ এক রকম "গাথা" অর্থাৎ গান অর্থে ঋক্-সংহিতায় ব্যবহৃত আছে।)

এই যে বাক্যের বহুবিভাজন এ স্বরগ্রামের সাত সুর হতে পারে, এবং তার চেয়েও বেশি সম্ভব সাত রকমের ছন্দঃস্তবক হতে পারে। অন্যত্র যে সপ্ত-বাণীর উল্লেখ আছে তা বিচার করলে শেষের অনুমানই গ্রহণ করতে হয়। প্রথম মণ্ডলের বিখ্যাত ১৬৪ নম্বর সূক্তটিতে এই প্রসঙ্গে যেটুকু বলা আছে তা এখানে আলোচনার যোগ্য।

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষতী
একপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বুভূবুষী
সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥৪১॥

গৌর-গাই জলস্রোত কাটতে কাটতে ডাক পাড়লে। সে একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী
অষ্টপদী, নবপদী হয়ে হয়ে পরম ব্যোমে সহস্রাক্ষরা ॥

যাকে "সপ্ত রেভা অভি সং নবন্তে" সেই বাক্‌কে

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্
উত ত্বঃ শৃন্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উত ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে
জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ ॥৪॥

কেউ হয়ত দেখেও দেখতে পায় নি, কেউ হয়ত এঁকে শুনেও শোনে নি। কাউকে হয়ত (ইনি) নিজেকে ধরে দিয়েছেন যেন অনুরাগিণী পত্নী বেশভূষা করে পতির কাছে ॥

উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতম্ আহুর্
নৈনং হিন্বন্তি অপি বাজিনেষু।
অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ
বাচং শুশ্রুবাঁ অফলাম্ অপুষ্পাম্ ॥৫॥

(লোকে) বলে (এঁর) সখিত্বে কেউ হয়ত এমন দৃঢ় ও পরিরক্ষিত যে তাকে বাদবিসম্বাদেও টলাতে পারে না।
ধেনুহীন সে মিছামিছি (গোদোহন ইত্যাদি) আচরণ করে, (যে) ফলহীন পুষ্পহীন বাক্ শুনেছে ॥

বাক্ হল প্রীতির ডোর, সফলতার দুয়ার, মানুষে মানুষে বিশ্বাসের সমভূমি। মানুষে মানুষে বিশ্বাস যে নষ্ট করে সে দুর্ভাগা।

যস্তিত্যাজ সচিবিদং সখায়ং
ন তস্য বাচি অপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোতি অলকং শৃণোতি
ন হি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থাম্ ॥৬॥

যে সহায় সখাকে পরিত্যাগ করেছে বাক্-বিষয়ে তার কোনো ভাগ নেই। যা কিছু শোনে (সে) অলীক শোনে। সৌভাগ্যের পথ (সে) চেনে নি ॥

আলোচ্য ঋক্-সূক্ত অনুসারে বাক দেবতাদের সর্বশক্তি। (চৈতন্যের ধর্মে যেমন ঈশ্বরের নাম "নাম্নাম্ অকারি বহুধা নিজ-সর্বশক্তি স্তত্রার্পিতা"।) ইন্দ্র যখন দেবতাদের মধ্যে সর্বাতিশায়ী হলেন তখন তাঁর নিজস্ব শক্তি কল্পনা করে তাঁর নাম দেওয়া হল "শচী", অর্থে এবং ব্যুৎপত্তিতে "শক্তি"র সঙ্গে সংবদ্ধ। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রপত্নীর কথা অনেক আছে কিন্তু কোথাও তিনি ইন্দ্রের শক্তি নন আর শচী বলে উল্লিখিতও নন। কোন দেবতার শক্তিকে সে দেবতার পত্নীরূপে

কল্পনার আভাসটুকুও ঋক্-সংহিতায় নেই। সে কল্পনার শুরু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে, প্রতিষ্ঠা পৌরাণিক সাহিত্যে। দেবতাদের শক্তি বাক্‌কে ইন্দ্রপত্নী বলা হয়েছে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে।

বাচং দেবা উপজীবন্তি বিশ্বে
বাচং গন্ধর্বাঃ পশবো মনুষ্যাঃ।
বাচীমা বিশ্বা ভুবনানি অর্পিতা
সা নো হবং জুষতাম্ ইন্দ্রপত্নী॥ ২-৮-৮॥

সমস্ত দেবতা বাক্ নিয়ে বেঁচে আছে, বাক্ নিয়ে গন্ধর্বেরা পশুরা মানুষেরা। বাক্ মধ্যে এই বিশ্ব ভুবন স্তব্ধ। ইন্দ্রপত্নী তিনি আমাদের আহুতি উপভোগ করুন।

কপিষ্ঠলকাঠক-সংহিতায় (৪-৯) এক সাংঘাতিক কথা পেয়েছি। তার আভাসও অন্য কোথাও দেখি নি। সে কথা বলে আলোচনা শেষ করি।

বাচা বৈ সহ মনুষ্যা অজায়ন্ত। ঋতে বাচা দেবাশ্চাসুরাশ্চ।
তে যন্ মনুষ্যা অবদংস্তদেবাভবন্। তে দেবাশ্চাসুরাশ্চ
প্রজাপতিমব্রুবন্ন ইমে বাবেতদভূবন্ ইতি। সাবাচঃ সত্যং
নিরমিমীত ভূ র্ভুবঃ স্বর্ ইতি। যত্তুরীয়ং অনৃতং তন্
মনুষ্যেষু ন্যধাৎ। এতদ্ বৈ বাচোঽনৃতং যন্ মনুষ্যা বদন্তি॥

বাক্ নিয়ে মানুষ জন্মাল। বাক্ ছাড়া দেবতারা ও অসুরেরা। সে মানুষেরা যখন যা বলত তাই ফলত। সে দেবতারা ও অসুরেরা প্রজাপতিকে বললে, এই রকম তো হল। তিনি বাক্ থেকে সত্য (অংশ তিন ভাগ) নিয়ে নির্মাণ করলেন ভূঃ-ভুবঃ স্বর্ এই। যা চতুর্থাংশ, অসত্য, মানুষের মধ্যে রেখে দিলেন। এই তো বাকের অসত্য যা মানুষেরা বলে॥

তা যদি হয় তবে মানুষ দেবতার চেয়ে বড়, যেহেতু সে দেবতাকে বাক্‌দান করেছে। তার কত কাল পরে সে পুতুলকে দেবতা বানিয়ে নিজে দীনহীন ভক্ত সেজেছে। মনে পড়ছে খোলাবেচা শ্রীধরকে ঈশ্বরভাবাবিষ্ট চৈতন্যের উক্তি বৃন্দাবনদাসের কথায়।

আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষাধর্ম॥

কি এ যক্ষ

তলবকার উপনিষদে একটি চমৎকার গল্প আছে। গল্পটি বলার রীতি লেখ্য নয়, সেকালের কথ্য। সেই হিসাবে অত্যন্ত উপভোগ্য। (অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছে।) যথাযথ এবং আক্ষরিক অনুবাদ দিচ্ছি সম্পূর্ণ গল্পটির। এর থেকে পাঠক আর কিছু না হোক এটুকু বুঝবেন যে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের সাহিত্যে এখনকার চলিত ভাষার অনুরূপ ঢঙ কেমন ছিল।

ব্রহ্ম দেবতাদের জিতিয়ে দিলেন। সেই ব্রহ্মের বিজয়ে দেবতারা জাঁক করতে লাগলেন। তাঁরা স্থির করলেন আমাদের এ বিজয় আমাদেরই এ বাড়বাড়ন্ত।

তিনি[১] এঁদের মনোভাব জানলেন। তাঁদের জন্য প্রাদুর্ভূত হলেন। তাঁরা জানলেন না কী এই যক্ষ।

তাঁরা অগ্নিকে বললেন, জাতবেদস[২] ব্যাপারটা জানো তো—কী এ যক্ষ।

বললেন[৩] তাকে[৪] উদ্দেশ করে, কে বটে, আমি তো অগ্নি বটি, বললে, আমি তো জাতবেদস্ বটি।

তা তোমাতে কী গুণ আছে?

এই সবই আমি পোড়াতে পারি—এই যা কিছু পৃথিবীতে।

তার[৪] দিকে একগাছি ঘাস রাখলেন।

এটা পোড়াও।

সেদিকে[৪] এগিয়ে গেল সমস্ত জোর দিয়েও তা পোড়াতে পারলে না।

তখনি সে ফিরে এল। জানতে পারলুম না কী এ যক্ষ।

তারপর বায়ুকে বললেন,[৬] বায়ু জানো তো—কী এ যক্ষ।

বেশ।

দৌড়ে গেল।

বললেন[৩] তাঁকে[৭] উদ্দেশ করে, কে বট?

আমি তো বায়ু বটি, বললে, আমি তো মাতরিশ্বন্ বটি।

তা তোমাতে কী গুণ আছে?

এই সবই আমি তুলে নিতে পারি—এই যা কিছু পৃথিবীতে।

তার দিকে একগাছি ঘাস রাখলেন। এটা তুলে নাও।

সেদিকে এগিয়ে গেল। সমস্ত জোর দিয়েও তা তুলতে পারলে না।[৮]

তখনি সে ফিরে এল। জানতে পারলুম না—কী এ যক্ষ।

তারপর ইন্দ্রকে বললেন, মঘবন্ জানো গে—কী এ যক্ষ।

বেশ।

সে দিকে দৌড়ে গেল।

তার[৮] কাছ থেকে তিরোধান করলেন। সেই খোলা জায়গাতেই সে দেখা পেলে খুব শোভাশালিনী এক নারীর—উমা হৈমবতীর।

তাকে[৯] বললে, কী এ যক্ষ?

সে[৯] বললে, ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই এ বিজয়ে তোমরা জাঁক করছ।

তখন থেকেই জানতে পারলে[৮] ব্রহ্ম বলে।

সেই হেতুই এই দেবতাগুলি অন্য দেবতার উপরে—অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র। তারাই এঁর সবার থেকে কাছে ঘেঁষতে পেরেছিল।

তারাই এঁকে[১০] প্রথম জেনেছিল ব্রহ্ম বলে।

সেই হেতুই আবার ইন্দ্র সকল দেবতার উপরে। সেই এঁকে[১০] সবার চেয়ে কাছে ঘেঁষতে পেরেছিল। সেই এঁকে[১০] সবার আগে জেনেছিল ব্রহ্ম বলে।

তার[১১] উদ্দেশ এই যে বিদ্যুৎ চমকাল—এমনি। এই যে পলক পড়ল এমনি।

এখন প্রশ্ন 'যক্ষ' (ক্লীবলিঙ্গ) বলতে কী বোঝাত। শব্দটি ঋগ্‌বেদে আছে, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আছে, সংস্কৃত সাহিত্যে নেই। উপনিষদের যে গল্পটি বলা হল তার মধ্যেই এই শব্দটির অর্থ পরিপূর্ণভাবে মেলে। 'যক্ষ' মানে যেন আলেয়ার আলো,—অলৌকিক এবং ক্ষণিক আবির্ভাব যা বিস্মিত অভিভূত করে, অথবা ভুলিয়ে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় ভালো করে বলা যায়—'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।'

সংস্কৃত সাহিত্যে 'যক্ষ' ব্যক্তিবাচক পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গে 'যক্ষী' 'যক্ষিণী'। যক্ষ মানে উপদেবতা বিশেষ[১২]। (কখনো কখনো অপদেবতাও—তখন তাঁরা শ্রেণীবদ্ধ হন রক্ষঃ ও দানবদের সঙ্গে। যেমন বাংলায় দখ্‌খি দানা।) উপদেবতারূপে যক্ষ ও যক্ষনারীর সবচেয়ে ভালো ছবি পাই কালিদাসের মেঘদূতে। সেখানে তারা কৈলাসে শিবের প্রজা। তারা ধনী, তারা শক্তিমান

সুন্দর, সুরূপ, সুবিনীত, কলাবিৎ। পুরাণকাহিনীতেও যক্ষেরা কৈলাসনিবাসী, ধনাধিকারী এবং শিবানুচর। এঁদের মুখ্য কুবের। যক্ষনারীরা কিন্তু যক্ষপুরুষদের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। তারা অত্যন্ত রূপসী, সুবেশা, প্রচুর অলঙ্কারধারিণী, কুঞ্জবাসিনী অথবা বৃক্ষতলসঞ্চারিণী এবং পুরুষপ্রলুব্ধকারিণী। প্রাচীন ভাস্কর্যে এই পুরুষ-জাতের যক্ষ এবং নারীজাতের যক্ষিণীর নিদর্শন প্রচুর আছে। সেখানে যক্ষ নাদাপেটা, গলায় উত্তরীয়, হাতে টাকার থলি—প্রসন্ন মূর্তি। আর যক্ষিণী সুন্দরী সালঙ্কৃতা সুস্মিতা—উলঙ্গ অথবা স্বল্পনীবিবন্ধপরিহিতা, গাছের উপরে অথবা গাছের—সাধারণত আমগাছের—তলায় অধিষ্ঠিতা। (আমগাছের সঙ্গে যক্ষিণীর সম্পর্ক মনে হয় 'অম্বা', 'অম্বিকা', 'অম্বালিকা'—এই তিনটি নাম যা আগে স্থলাভিকা স্বৈরিণীর নাম ছিল, পরে দুর্গার নামান্তর হয়েছে—তার থেকে।)

যক্ষদের নিবাস ছিল কৈলাসে। কিন্তু কৈলাসের সঙ্গে যক্ষিণীদের কোন যোগাযোগের উল্লেখ নেই। কালিদাস যক্ষপত্নীকে একবারও যক্ষিণী বলেন নি একথা লক্ষ্য করবার মতো। যক্ষিণীদের সঙ্গে যে যক্ষদের যোগ ছিল তারা কিন্তু পর্বতবাসী নয় বৃক্ষবাসী।

বৌদ্ধ সাহিত্যে যক্ষ-যক্ষিণীরা হল মারের অনুচর। তারা কামরূপী কামচারী বিত্তবান। তারা নিজেদের মধ্যে ভালোভাবেই থাকে, কিন্তু মানুষের তারা বিপক্ষ, তাকে বিপথগামী করে ধ্বংসপথে নিয়ে যায় তারা। তবে মানুষের কবলে এসে তার প্রেমে পড়ে যক্ষিণী যে মানুষ হয়ে যায় তার গল্পও বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। সিংহল ছিল যক্ষদের দেশ[১৩]। সেখানে দলবল নিয়ে মানুষ বিজয়সিংহ গিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। যক্ষ রাজকন্যার মন জয় করে নিয়ে বিজয়সিংহ লঙ্কা থেকে যক্ষদের দূরীভূত করে মানুষের রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে যক্ষ-পূজার কোন সোজাসুজি উল্লেখ নাই। অবান্তরভাবে কিছু কিছু আছে। কালীপূজার রাত্রে যে দেওয়ালি উৎসব হয় তা একদা কোন একরকম যক্ষপূজার অঙ্গ ছিল বলে মনে করি। পরবর্তীকালে যা দীপাবলী নামে খ্যাত তার উল্লেখ আগে পেয়েছি 'যক্ষরাত্রি' বলে। এইদিন পশ্চিমা সওদাগরেরা যে ব্যাপকভাবে জুয়া খেলে বলে শোনা যায় তা ধনপতি যক্ষের পূজাবিধিরই মনোহর পরিণাম বলে ধরতে পারি।

এককালে বাংলাদেশে এবং অন্যত্র পশুমুখ দেবদেবীর প্রতিমা পূজা অজ্ঞাত ছিল না। উত্তর বাংলায় শৃগাল (অথবা বৃক) -মুখ বিষ্ণুর সেবা পূজার এবং

সে বিষ্ণুর মন্দিরের উল্লেখ ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীর প্রত্নলেখে আছে। 'কোকা-মুখ' দেবীর উল্লেখ পরবর্তীকালেও যথেষ্ট আছে। উড়িষ্যায় ঘোড়ামুহ বাশুলী অনেক গ্রামে এখনও পূজা পান। এই রকম পশুমুখ দেবতার পূজা যক্ষ পূজোরই এক পরিণাম বলে মনে হচ্ছে। যক্ষেরা কামরূপ। তারা শিবের অনুচর। শিবের অনুচর অনেকেই পশুমুখ। গণেশ তো যক্ষরাজ বলে স্বীকৃত। তাঁর স্ফীত উদর প্রাচীন যক্ষমূর্তির মতো, তাঁর হাতের নাড়ু (বা জম্বীর) প্রাচীন যক্ষমূর্তির হাতে টাকার থলিরই রূপান্তর। গণেশ ছিলেন প্রথমে বিঘ্নরাজ, পরে হয়েছেন পূজা পাবার জন্তে বিঘ্নহন্তা। অতএব গণেশ পূজাও যক্ষপূজার এক পরিণতি।

তান্ত্রিক মহাযানে বীভৎসাকৃতি অনেক দেবদেবীর উপাসনা চলিত ছিল।[১০] তার মধ্যে যক্ষপূজার ইতিহাস বোধ করি অনেকটাই নিলীন আছে। কেবল হেরুকের বেলায় স্পষ্ট প্রমাণ কিছু মিলছে। 'হেরুক' শব্দটি ভৈরব শব্দের সমার্থক। মানে ভীষণদর্শন। অর্বাচীন সংস্কৃতে 'হেরক' শব্দ পাই শিবের এক অনুচরের নাম হিসাবে। একদিকে 'হেরম্ব' নামটি গণেশের আর হেরুকেরও।

চৈতন্তের জন্মকালে দেশের আধ্যাত্মিক আচার বিচার ও আবহাওয়ার প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, কেউ কেউ মদ মাংসের আয়োজন করে যক্ষকে পূজা করে।

মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।

আমি অনুমান করেছিলাম, এ যক্ষপূজা ধর্মঠাকুরের গাজন হতে পারে। এখন মনে হচ্ছে তা না হওয়াই সম্ভব। ধর্মের গাজনে মদ্যমাংসের আয়োজন থাকে, কিন্তু তা সর্বত্র নয় এবং সে আয়োজন অপরাপর আয়োজনের তুলনায় পরিমাণে বেশি এবং কার্যে গুরুতর নয়। তা ছাড়া ধর্মের তো কোন মূর্তিই নেই। ঘট, নুড়ি এবং/অথবা পাদ-প্রতীক - এই হল ধর্মের প্রতিনিধি পূজা গ্রহণে। অতএব বৃন্দাবনদাসের উল্লিখিত যক্ষপূজা তৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনা থেকে আগত ভীষণদর্শন মূর্তিপূজা হতে পারে এবং/অথবা দক্ষিণ-রায়ের মতো ক্ষেত্রপাল দেবতার পূজা হতে পারে। যক্ষপূজা যে ক্ষেত্রপালপূজার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে তা প্রতিপাদন করছি।

যক্ষিণীদের মতো যক্ষরাও বৃক্ষাধিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীনকালের লোকবিশ্বাসে। অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রের অথবা পশুচারণ ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক উপদেবতারূপে।

'ক্ষেত্রপাল' নাম ও আইভিয়াটি ঋগ্বেদের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। অরণ্যের ক্ষেত্রপালিনী অরণ্যানী তখনই দেবতাত্মা হয়ে গিয়েছেন। ইনিই আমাদের দুর্গা-দুর্গমে, দুর্গতদের রক্ষয়িত্রী। প্রাচীনতর অরণ্য শব্দটি অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে অরণ্যাণীও নাম পালটান। পরবর্তীকালে ব্যাকরণকর্তাদের ভ্রান্তপথে নিয়ে যাবার জন্যই বোধ হয় অরণ্যাণী অভিধান অথচ ব্যাকরণ থেকে একবারে নির্বাসিত হয়নি।

পুরানো ভাস্কর্যে যক্ষিণীদের সঙ্গে আমগাছের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আগে উল্লেখ করেছি। এঁরা কি তবে আমবাগানের রক্ষয়িত্রী 'অম্বপালী' ক্ষেত্রপালিনী ছিলেন? অসম্ভব নয়।

বাংলাদেশের লোকবিশ্বাসে গোমুখ অথবা গোরূপ যক্ষিণী ও যক্ষশিশুও পশু-রক্ষক ক্ষেত্রপালরূপে দেখা দিয়েছিলেন যথাক্রমে গো-ভাগাড়ে পর্কটবাসিনী (অর্থাৎ পাকুড় গাছে অধিষ্ঠিতা) ভগবতী এবং অনির্দিষ্ট বৃক্ষবাসী 'গোরয়া' (অর্থাৎ 'গোরুয়া এখন 'গোয়া', 'গোরাচাঁদ' ইত্যাদি নামে স্থান বিশেষে পরিচিত) রূপে। গো-ভাগাড়ের ভগবতী আর শিশু-কল্যাণী ষষ্ঠী অভিন্ন। শিশু জন্মের ষষ্ঠদিনে যে ষষ্ঠী পূজা হয় তাতে একদা ভাগাড় থেকে গোমুণ্ড আনা হত দেবীর প্রতীক রূপে। ষষ্ঠী এখন ভাগাড়ে থাকেন না, থাকেন তার কাছাকাছি কোন পাকুড় অথবা অশথ গাছ তাঁর থান। সেখানে পুত্রবতী নারীরা পূজা দিতে যান। সে পূজা উৎসবেরই নামান্তর।

ধনভাণ্ডারী যক্ষ লোকবিশ্বাসে বিশেষ করে বটবৃক্ষনিবাসী হয়েছিল। এ বিষয়ে একটি পুরানো গল্প আছে। লোকালয়ের প্রান্তে এক দরিদ্র দম্পতী থাকত। তাদের বাড়ীর কাছেই এক বিরাট বটগাছ ছিল। তারা ভক্তি করে সেই বটগাছে পাল-পার্বণে জল দিত। সে গাছে থাকত এক যক্ষ। তিনি তাদের ভক্তিতে খুশি হয়ে প্রচুর ধন দেন। তাতে করে তারা রাজা হয়। বয়স হলে রাজদম্পতী মারা গেল। তাদের ছেলে, অল্পবয়সী বিবাহিত, রাজা হল। অল্পদিন বিবাহ হয়েছে, রাজা রাণীকে ছেড়ে থাকতে পারে না। রাজকার্যে শৈথিল্য এল। সুযোগ বুঝে আশেপাশের রাজারা জোট বেঁধে আক্রমণ করতে এল। রাজা নির্বিকার, মন্ত্রীরা হা-হুতাশ করছে। খবর এল শত্রুসৈন্য নগর অবরোধ করলে বলে। খবর যখন এল তখন রাজারাণী

বিশ্রামাগারে। ব্যাকুল হয়ে রাণী বললে, করছ কি? যাও যুদ্ধ কর গে। রাজা হেসে এই শ্লোক বলে পাশা পাড়তে বললে,

বটবৃক্ষস্থিতা যক্ষা দদতীহ হরন্তি চ।
অক্ষানপাতয় কল্যাণি যদ্ ভাব্য তদ্ ভবিষ্যতি ॥

—মানে বটগাছে যাঁর অধিষ্ঠান সেই যক্ষ কখনও দিচ্ছেন কখনো নিচ্ছেন। হে কল্যাণি পাড়ো পাশার পাটি। যা হবার তা হবে।

বটগাছ থেকে যক্ষ একথা শুনলেন। তাঁর ভাবনা হল, তাইত এখন নিজের মান তো নিজেকে রাখতে হয়। তিনি অবিলম্বে বিশাল বাহিনী সৃষ্টি করে শত্রুদলকে উৎখাত করে দিলেন।

রাজা রাণীকে বললে, দেখলে তো? খুব ঘটা করে যক্ষের পূজা দেওয়ালে।

অরণ্যানী-দুর্গার উল্লেখ করেছি। তাঁর পিছনেও যক্ষিণী কল্পনা আছে। সে পরিচয় রয়েছে চণ্ডীমঙ্গলের গল্পে। যিনি প্রথমে গোধা, পরে সুন্দরী নারীরূপে দেখা দিয়ে ব্যাধদম্পতীকে ধনভাণ্ডার দিয়েছিলেন। সে কাজ যক্ষিণীর মতো। যিনি খুল্লনাকে পুত্রবর দিয়েছিলেন এবং কালিদহে ধনপতিকে ছলনা করেছিলেন তিনি তো যক্ষিণী। বলতে পারি তিনি যক্ষিণী মুখ্যা, যক্ষরাজভার্যা। কেন তা পরে বলছি।

সংস্কৃতের 'যক্ষ' শব্দটি প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে বাংলায় এসে হয়েছে 'যখ'। কিন্তু এতক্ষণ যে যক্ষের আলোচনা করে এলুম বাংলার 'যখ' ঠিক তেমনটি নয়। বাংলার যখ দেবতা নয় দেবযোনিও নয়, উপদেবতাও নয়—পুরোপুরি অপদেবতা অর্থাৎ ভূত, মানুষের বন্দী প্রেতাত্মা। সে এক নির্দিষ্ট ধনভাণ্ডারের ভাণ্ডারী এবং প্রহরী। তাকে নিযুক্ত করেছে কোন এক মানুষ তান্ত্রিক অভিচার করে তাকে তলঘরে কোষাগারে বন্দী করে শ্বাসরুদ্ধ করিয়ে মৃত্যু ঘটিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পটি পড়ে দেখলে যখ দেবার কার্যক্রমটুকু বুঝতে পারবেন। যে ব্যক্তি যখ দিয়েছে তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর হস্তে সম্পত্তি সমর্পণ না করা পর্যন্ত যখের নিষ্কৃতি নেই। যখের ধন অন্ত কেউ নিতে বা ভোগ করতে পারে না। যখের সঙ্গে সম্পত্তিও অভিশপ্ত।

ভারতবর্ষের অন্যান্য আধুনিক আর্য-ভাষাতেও 'যক্ষ' শব্দের তদ্ভব রূপ নানারকম অপদেবতা বোঝায়। যেমন প্রাচীন গুজরাটীতে 'জাখ', হিন্দীতে 'জাক'—দানব, হিন্দীতে 'জাখনি' দুর্গার অনুচরী দানবী ; মারাঠীতে 'জকিণ'। 'জকিণ'—প্রসবকালে অথবা জলে ডুবে মৃতনারীর ভূত ; ইত্যাদি।

এরপর তলবকার উপনিষদের গল্পে ফিরে আসি। প্রাচীনতর উপনিষদ-গুলিতে বিশ্বসত্তা নির্গুণ নিরঞ্জন ব্রহ্মতত্ত্বরূপে প্রথম উপস্থাপিত হয়েছিল।

অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন এই উপনিষদে গল্পচ্ছলে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব সগুণ বিশ্বসত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু রূপে প্রথম উপস্থাপিত হল। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার ইতিহাসে এ ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রহ্ম-যক্ষের স্বরূপ জানতেন শুধু উমা হৈমবতী। তাঁর নাম ও বর্ণনা থেকে সহজেই উপলব্ধি হয় যে তিনিই শিবগৃহিণী পার্বতী। সুতরাং তিনি ব্রহ্ম-যক্ষিণী। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায় শিব-শক্তিবাদের এই প্রথম প্রকাশ, সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ।

পৌরাণিক ও লৌকিক শিব বহুরূপী—কখনো যোগী, কখনো ব্রহ্মচারী, কখনো ভণ্ডবেশী ভিক্ষুক, কখনো নটরাজ, কখনো ধুস্তুর গঞ্জিকায় ভোর—স্ফীতোদর। সুতরাং তিনি যক্ষ—আদি যক্ষ। ভারতীয় দেবতাতত্ত্বের ইতিহাসে এ ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ॥

---

১ মূলে আছে 'তৎ'। ব্রহ্ম এখানে শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। সুতরাং অনুবাদ হওয়া উচিত 'সে' বা 'তা'। ২ মানে যা কিছু জন্মেছে তা সবই যার অধিকারে। ৩ ব্রহ্ম। ৪ অগ্নি। ৫ ঘাস। ৬ দেবতারা। ৭ বায়ু। ৮ ইন্দ্র। ৯ উমা হৈমবতী। ১০ ব্রহ্ম। মূলে আছে ক্লীবলিঙ্গ 'এতৎ'। ১১ ব্রহ্মে। ১২ মহাভারতের বনপর্বে এক সলিলবাসী যক্ষের গল্প আছে। সেখানে যক্ষ ব্রহ্ম নয়, তবে ব্রহ্মবিদ্ বটে। ১৩ এখানে মনে রাখতে হবে রাবণের রাজত্ব যে লঙ্কায় ছিল তা সিংহলই। 'লঙ্কা' শব্দটির মানে ছিল হিমালয়ে যক্ষপুরী 'অলকা' নামের মতো...রাবণও যক্ষ ছিল। সে কুবেরের ভাই। ১৪ হিমালয়ের সঙ্গে যক্ষের সম্পর্ক হৈমবতীর মধ্য দিয়ে তলবকার উপনিষদের গল্পের দিন থেকে। বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীরা অনেকেই এসেছেন হিমালয়ের পথে। সে কথা এখানে স্মর্তব্য। বলা আবশ্যক মনে করি যে, ঋগ্‌বেদে নামটি অসম্বাস রূপেই পাওয়া যায়।

———

দেবতার জন্ম

দেবতাদের জন্মকথা ঋগ্‌বেদে আছে, আবার নেইও। কোন কোন দেবতার—যেমন বিষ্ণুর জন্মকথা মোটেই নেই। কোন কোন দেবতার জন্মকথা—যেমন ইন্দ্রের - মোটামুটি হবে ছাড়াছাড়িভাবে পাওয়া যায়। কোন কোন দেবতার জন্ম সম্বন্ধে এমন কথা আছে যার মানে হয় না। যেমন দক্ষ। দক্ষ অদিতির পুত্র। আবার অদিতির পিতা। অধিকাংশ দেবতার উৎপত্তির কথা অত্যন্ত ধোঁয়াটে।

তার কারণ আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ যখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হয়ে বাস করছিল, তখন তাদের মধ্যে দেবতার কিছু গল্পকথা গড়ে উঠেছিল। তার পরে সে জনগণ যখন বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তারা তাদের পুরোনো গল্প কথার উপর রঙ চড়িয়ে নতুন গল্প কথার সৃষ্টি করতে থাকে। সেই গল্প কথার নায়ক-নায়িকাও বিশিষ্ট দেবতা রূপে সেই সেই দলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার পরে বিচ্ছিন্ন উপনিবিষ্ট দলগুলিও উপদলে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এইভাবে অন্তত দুবার বিচ্ছিন্ন হবার পর ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষীর যে উপদল ভারতবর্ষে এসেছিল তাদেরই প্রাচীন গল্প কথা মিশ্রিত স্তব ও গান খিচুড়ি পাকিয়ে আমাদের বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় রূপ ধারণ করেছে। সাহিত্যের দিক দিয়ে বিচার করলে ঋগ্‌বেদ ইন্দো-ইউরোপীয়-গোষ্ঠীর সবচেয়ে পুরোনো কাব্যগাথার বই। এতে এ গোষ্ঠীর প্রাচীনতম মিথের টুকরো অনেক আছে। পূর্ববর্তী কালের অর্থাৎ প্রথমবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন তাদের পূর্বপুরুষ ইরানীয়দের পূর্বপুরুষের সঙ্গে একচালে বাস করত – অনেক মিথও সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একদা পণ্ডিতদের মনে হয়েছিল এ জট ছাড়ানো বুঝি অসাধ্য। কিন্তু প্রাচীন ভাষার ও প্রত্নবিদ্যায় নতুন নতুন লেখ ও বস্তু আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এবং ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আধুনিক জনগণের মধ্যে ধারাবাহিত হয়ে আসা পুরাণ কাহিনী ও গল্পগাথা নিয়ে তৌলন আলোচনার ফলে আমরা এখন ঋগ্‌বেদের মধ্যে প্রত্নকথার টুকরোগুলি কিছু কিছু গোছাতে পারছি। আর সব মিলিয়ে আমাদের কোন কোন প্রাচীন দেবতার প্রাচীনতম স্বরূপ ও চরিত্র আভাসে ইসারায় জানতে পারছি।

যত দূর বোঝা গেছে তাতে বলা যায় যে, আদি দেবতা যাঁর থেকে অন্য দেবতা উৎপন্ন হয়েছিল তিনি ছিলেন 'দ্যৌ' অর্থাৎ সমুজ্জল আকাশ। এঁকে দেবপিতা বলে মানত ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর জনগণ। তার প্রমাণ, ঋগ্‌বেদে দ্যৌষ্‌পিতা=গ্রীকে দেউস পতের=লাটিনে জেউস পতের=ইংরেজী জুপিটার। কথাটির মানে আকাশ পিতা। কিন্তু দ্যৌকে পিতৃভাবনা পরবর্তীকালের। তার আগে ইনি মাতৃভাবেও কল্পিত ও উপাসিত হতেন। মনে হয় তারও আগে দ্যৌ ছিলেন মাতাই। (প্রিমিটিভ মানুষের ভাবনায় মাতাই আসল জন্মদাতা, প্রত্যক্ষ। পিতার জনকত্ব অপ্রত্যক্ষ এবং অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্য।) ঋগ্‌বেদের কালের ঢের আগেই পিতৃশাসন রূঢ় হয়ে গিয়েছিল। তাই সেখানে পিতারই প্রাধান্য, মাতার নয়। (তবে কোন কোন দলে মাতৃদেব ভাবনাও প্রচলিত ছিল।) ঋগ্‌বেদে প্রাচীনতর মাতৃভাবনার রেশ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই ঋগ্‌বেদে শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থাৎ পিতা ও মাতা দুই-ই বোঝায়। এমন কি একবার বলা হয়েছে "দ্যৌর্দেবী"। এখানে ইনি পৃথিবীর স্থান নেন নি। কেননা সেই সঙ্গে পৃথিবীরও উল্লেখ আছে। "পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌ র্দেবী পুনরন্তরিক্ষম্" (১০-৫৯-৭)। দ্যৌ যখন মাতা তখন বৈদিক কবিকল্পনায়—তারও আগে প্রাচীনতর মিথে—তিনি "অদিতি" অর্থাৎ সীমাহীন আকাশ। দ্যৌ আর অদিতি গোরু-কল্পনায় পড়ে হলেন যথাক্রমে ষাঁড় ও গাই, দেবতার বাপ ও মা। দ্যৌ ও অদিতির মধ্যে প্রথমে ভেদ ছিল না। দুই-ই এক ছিল, কেবল দৃষ্টির কোণ আলাদা। ঋগ্‌বেদের একটি ঋকে অদিতিকে বিশ্বদেবতা, বিশ্বভুবন, এমন কি বিশ্বাত্মা বলা হয়েছে।

অদিতির্‌ দৌর্‌, অদিতির্‌ অন্তরিক্ষম্‌
অদিতির্‌ মাতা স পিতা পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা
অদিতি র্জাতম্‌ অদিতি র্জনিত্বম্‌॥

১৮৯-১০।

(অদিতি দ্যৌ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, সে পিতা, সে পুত্র। বিশ্ব দেবতা অদিতি, পাঁচজন্ অর্থাৎ বিশ্ব মানব অদিতি। যা জন্মেছে তা অদিতি, যা জন্মাবে তা অদিতি॥)

এক হিসেবে দেবতারা সবাই—যাঁরা "দেব" বলে উল্লিখিত—দ্যৌ-এর

সন্তান, পুত্র অথবা নাতি-নাতনি ("নপাৎ" "নপ্তী")। দ্যৌ আর দেব শব্দ দুটি সমগোত্রীয়। (সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন হলেও এই প্রসঙ্গে একটু শব্দবিদ্যার কচকচি না করে থাকতে পারছি না। এ লাইন কটি এড়িয়ে গেলে কোন ক্ষতি হবে না।) ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় অনেক মৌলিক শব্দধাতু ছিল যার চেহারা স্থির ছিল না। বিভিন্ন পদে বিভিন্ন রূপ দেখা যেত। সুতরাং শব্দধাতুটিকে নির্দেশ করতে গেলে সব রূপগুলিই দেখিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তাতে আলোচনায় ঝামেলা বাড়ে অযথা। সেই জন্যে শব্দবিদ্যাবিদেরা রূপভেদগুলির মধ্যে এমন একটি রূপকে মূল শব্দধাতু বলে নির্দিষ্ট করেন যার থেকে রূপান্তরগুলি সহজে উপলব্ধ হয়। তাই দ্যৌ-দেব শব্দগুচ্ছের মূল শব্দধাতু বলে ধরা হয়েছে, *deyew—(দেয়েব্)। এই মূল শব্দধাতু থেকে প্রথম e ধ্বনিটি লুপ্ত হবার ফলে পেয়েছি, *dyaw। এর থেকে সংস্কৃতে এসেছে দ্যৌঃ, দ্যবা, দ্যাবঃ দাম্ দবি দ্যু ইত্যাদি পদ ও শব্দ। আর দ্বিতীয় e ধ্বনিটি লোপের ফলে সংস্কৃতে পাচ্ছি, 'দেব, দিবস, দিব', দিবস' ইত্যাদি শব্দ ও পদ। 'দেবী' দেব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। সুতরাং ঋগ্‌বেদে 'দেব, দেবী' শব্দ দুটিতে প্রাচীন প্রয়োগের হিসেবে দ্যৌ-এর সন্তান ধরলে ভুল হবে না। 'দেব' শব্দের আর একটি অর্থও প্রায় গোড়া থেকে এসে গিয়েছিল, —ক্রীড়াশীল, লীলাময়, দ্যুতিমান। এ অর্থের জন্যেও দ্যৌকে ছাড়বার দরকার নেই। এই অর্থের সঙ্গে যোগ আছে সংস্কৃত 'দিব্' ধাতুর। সে ধাতুও এসেছে *deyew থেকে প্রথম e লোপের ফলে। বস্তুত, 'দেব' অভিধাটির শেষ অর্থ নিয়েই ইরানীয় ও ভারতীয় দুটি আর্য উপদলের বিবাদ সবচেয়ে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল দল ভাঙার সময়ে ও তার পরে। ঋগ্‌বেদের প্রাচীন অংশে 'অসুর' শব্দটির মানে প্রচণ্ড মেধা ও শক্তির অধিকারী, আমাদের অর্থে ঈশ্বর। এটি দু-একটি প্রধান দেবতাদের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীনতম দেবতাদের একজন—বরুণকে বলা হয়েছে 'অসুরঃ পিতা নঃ' (আমাদের অসুর 'বাবা')। (এ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে ইন্দ্র, অগ্নি, পূষা, সবিতা ও সোম সম্পর্কেও)। 'সম্রাজ' (মানে সর্বাধ্যক্ষ) বিশেষণটি বিশেষ করে বরুণ—মিত্রের সহিত অথবা একাকী, ইন্দ্র ও অগ্নি এই তিন দেবতার নামের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে। এই তিন দেবতা হল ঐতিহাসিক, দৃষ্টিতে ঋগ্‌বেদের তিন প্রধানতম দেবতা। বরুণ প্রাচীন স্তরের, ইন্দ্র

অর্বাচীন স্তরের, আর অগ্নি সমসাময়িক স্তরের। বলতে গেলে ঋগ্‌বেদে অগ্নিই একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা। তিনি তাবৎ দেবতার প্রতিনিধি। সব দেবতার হব্য অগ্নিই বিলি করেন।

ঋগ্‌বেদে কয়েকটি দেবতাকে 'আদিত্য' (মানে অদিতির সন্তান) ছাপ দেওয়া হয়েছে। এঁরা হলেন প্রথমত ছজন,—মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ভগ, দক্ষ ও অংশ[১] পরে (১০-৭২-৮)। আরও একটি নাম পাওয়া যায় - মার্তাণ্ড। তা ছাড়া ঋগ্‌বেদে সূর্যকেও 'আদিত্য' অথবা 'আদিতেয়' বলা হয়েছে। দ্বাদশ আদিত্য—পৌরাণিক ভাবনা, ঢের পরবর্তীকালের।

মোট কথা হল, ঋগ্‌বেদের দেবতারা দ্যৌয়ের সন্তান। ছয় পুত্র কন্যা, নয় পৌত্র-পৌত্রী। তবে পুত্র কি পৌত্র, কন্যা কি পৌত্রী সে বিষয়ে ঋগ্‌বেদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল আছে। এমন ধরনের গোলমালের উদাহরণ আগে একটা দিয়েছি। এখন আর কিছু দিই।

প্রথমে ধরা যাক উষাকে। (ঋগ্‌বেদে উষা এক এবং অনেক। এ সংখ্যা নিয়ে সমস্যার কথা এখানে তুলছি না। এটা একরকম সমস্যাই নয়। কবি ভাবনা)। উষার সম্বন্ধে বারবার বলা হয়েছে, তিনি দ্যৌয়ের কন্যা। একবার বলা হয়েছে উষা দ্যৌয়ের প্রিয়া (১-৭৬-১)। কন্যা উষাকে দ্যৌ পত্নীরূপে অভিগমন করেছিলেন এই মর্মে একটি গল্প বৈদিক গদ্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। এটা এখন যতটা খারাপ শোনাচ্ছে প্রাচীনতম মিথে তা ছিল না। দ্যৌ আর অদিতি প্রথমে এক দুপিঠ কল্পনার বস্তু ছিল। কল্পনার এক পিঠে দ্যৌ পুরুষ, অপর পিঠের কল্পনায় দ্যৌ নারী। আদিম ধারণায় হয়তো বা houmaphrodite বা 'আধনর আধনারী'। উষার ব্যাপারে এ নারীপুরুষের ইঙ্গিত যে নেই তা নয়। এই প্রসঙ্গে উষার সঙ্গে অদিতির একীকরণও লক্ষণীয়। উষা অদিতির স্বরূপ ('অদিতির্ অনীকম ১-১১৩-১৯)।

তারপর ধরি নাসত্য' অর্থাৎ অশ্বী দুজনকে। এ দেবতা দুটির দেখা গ্রীক-পুরাণ কাহিনীতেও পাওয়া যায়। সেখানে এঁরা "দি অস কৌরৈ" দিবস্পুত্রদ্বয় বলে পরিচিত। নামটির মানে দ্যৌয়ের ছেলে। ঋগ্‌বেদে

১। অদিতি যে এঁদের কারো কারো মা তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—একটি সূক্তে (৮, ৪৭, ৯)।

তাঁদের কখনো বলা হয়েছে দ্যৌয়ের পুত্র ('দিব আজাতা' ৪-৪৩-৩), কখনো বলা হয়েছে দ্যৌয়ের নাতি ("দ বা নপাতা" ১-১৮৬-১)। কখনো বলা হয়েছে ওঁদের একজনের পিতা সুমখ, আর একজনের পিতা দ্যৌ ("জিষ্ণুধাম্ অন্যঃ সুমখস্য সুরির দিবো অন্যঃ সুভগ পুত্র উহে" :-১৮১-৪)। একবার বলা হয়েছে যে অশ্বীদের মা সিন্ধু ('যা দস্রা সিন্ধু মাতরা" :-৪৬-২)। আবার বলা হয়েছে যে তাদের মা হলেন উষা (:-:৯-')। তাঁরা সিন্ধুর অথবা উষার যমজ পুত্র বলেও উল্লিখিত। 'যমং চিদ অত্র যমসূর অসূত (৩-৩৯-৩)। আবার বলা হয়েছে যে তাঁদের জন্ম এক সঙ্গে ঘটেনি ("নানা জাতৌ" (৫-৭৩-৪)।

তার পরে মরুদ্‌গণ। মরুৎদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক রকম উলটো পালটা কথা বলা হয়েছে। যেমন, (১) তাঁরা জন্মেছেন বিদ্যুতের চমক থেকে ("হস্কারাৎ বিদ্যুতস পরি অতো যাতা অবন্ত নঃ" ১-২৩-১২)। (২) তাঁরা দ্যৌয়ের সন্তান এবং অদিতিরও ("দিবস পুত্রাসঃ···আদিত্যাঃ" ১০-৭ -২)। (৩) তাঁদের পিতা বৃষরূপ রুদ্র আর মাতা গাই পৃশ্নি (২-৩৪-২)। মরুৎদের বিশেষণ 'পৃশ্নিমাতরঃ' (=যাঁদের মা বাঘাফটকা গাই। অনেকবার দেখা যায় ঋগ্‌বেদে।

জন্ম সম্বন্ধে ওরি মধ্যে একটু বেশি বর্ণনা আছে ইন্দ্রের। কিন্তু সেখানেও যে গোলমাল নেই তা নয়। গোলমাল উপেক্ষা করলে মোটামুটি ইন্দ্রজন্মের যে বিবরণ পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদে তা অন্যদেবতার উৎপত্তির সঙ্গে মেলে না। ঋগ্‌বেদের প্রধান দেবতা ছিলেন ইন্দ্র। তার মানে এই যে ঋগ্‌বেদের অধিকাংশ সূক্তের রচনা বিশেষভাবে ইন্দ্র-উপাসকের। এই বিশিষ্ট ইন্দ্র উপাসকেরা জানতেন যে তাঁদের ইষ্ট দেবতা প্রাচীন নন, তবে তিনি অন্য সব দেবতার চেয়ে বেশি পরাক্রান্ত। ইন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধেও তাদের মধ্যে উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ একটি ইন্দ্র-সূক্তের (২-১২) প্রথম শ্লোকটি।

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।

("মনস্বী দেবতা যিনি জন্মলাভ করেই শক্তিতে সমস্ত দেবতাদের পরিভব, অর্থাৎ অতিক্রম করেছিলেন।")

সূক্তটি পরিপূর্ণ ইন্দ্র-প্রশস্তি। এতে ইন্দ্রের মহৎকর্মের বিবরণ আছে। অন্য দেবতাদের অনেক মহৎকর্মও ইন্দ্রের উপর আরোপিত হয়েছে। ইন্দ্রকে সব প্রাচীন দেবতার এমন কি দ্যৌয়ের চেয়েও প্রাচীন বলে ইঙ্গিত করা

হয়েছে। সূক্তটি ইন্দ্রের পক্ষে যেন প্রপ্যাগাণ্ডা, যারা ইন্দ্রকে খুব মানে না তাদের মানাবার জন্যে রচিত। তাই এই সূক্তের প্রত্যেক ঋকের ধুয়ো হল "স মনাস ইন্দ্রঃ" ('ওহে লোক সব, তিনিই হলেন ইন্দ্র')।

ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধে যে সব বিরুদ্ধ কথা ছড়িয়ে আছে তা একত্র ধরলে এইরকম দাঁড়ায়।

১। ইন্দ্রের মা গাই, সে তার বাছুর, তার বাবা ষাঁড় (১০, ১১১, ২)।

২। ইন্দ্রের মা 'নিষ্টিগ্রি' (১০, ১০১, ১২)। কথাটির মানে জানা নেই।

৩। ইন্দ্রের মা 'শবসী' (অর্থাৎ বলিষ্ঠ : ৮, ৪৫, ৫)।

৪। মায়ের পার্শ্বদেশ থেকে ইন্দ্র নির্গত হয়েছিলেন (৪, ১৮, ১)।

৫। (শরীর থেকে) জোর করে ঝেড়ে ফেলা ইন্দ্রকে মাতা ঘৃণ্য মনে করে লুকিয়ে রাখলেন। তখন ইন্দ্র জন্ম নিয়েই নিজে নিজে সাজপোশাক পরে দাঁড়িয়ে উঠে অন্তরীক্ষ পর্যন্ত ভরিয়ে দিলেন।

("অবদ্যম ইব মন্যমানা গুহাকর ইন্দ্রং মাতা বীর্যেণান্যৃষ্টম।
অথোদস্থাৎ স্বায়মৎকং বসান আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ॥")
(৪, ১৮, ৫)।

৬। ইন্দ্র বাপকে পা ধরে আছড়ে মেরে ফেলে দিয়ে মাকে বিধবা করেছিলেন। ("কস্ তে মাতরং বিধবাম অচক্রুর্ শযুং কস্ ত্বাম্ অজিঘাংসৎ চরন্তম্। কস্ তে দেবো অধি মার্ডীক আসীদ্ যৎ প্রাক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য॥" ৪, ১৮, ১২)।

৭। ইন্দ্রের পিতা বজ্র নির্মাণকারী ত্বষ্টা (২, ১৭, ৬)। জন্ম নিয়েই ইন্দ্র মায়ের জন্যে কেঁদেছিলেন (৩, ৪৮, ৩)। তার পর ত্বষ্টাকে হত্যা করে তার সোম হাঁড়ি হাঁড়ি পান করেছিলেন (৩, ৪৮, ৪)।

ঋগ্‌বেদে একবার ইন্দ্রকে 'কৌশিক' বলে সম্বোধন করা হয়েছে ("ইন্দ্র কৌশিক" ১, ১০, ১১)। ইন্দ্রের এই অভিধা সংস্কৃতেও আছে। কৌশিক মানে যা কোশ থেকে নির্গত। শব্দটির এক প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে পেঁচা। পেঁচা দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে, রাত হলে চরতে বেরোয়। তখন যেন অন্ধকার কোশ থেকে নির্গত হয়। ইন্দ্রের বেলায় 'কৌশিক' শব্দের অর্থ ধরেছেন প্রাচীন নবীন সব ব্যাখ্যাকার ও অনুবাদকেরা—"কুশিক বংশের ইষ্টদেবতা, কুশিকদের পূজ্য।" প্রস্তুত প্রবন্ধ লেখকের বিবেচনায় ইন্দ্রের বেলায়ও "কোশনির্গত" এই অর্থ পরিপূর্ণভাবে খাটে।

ঋগ্‌বেদে এই প্রয়োগ যে আমার অনুমিত অর্থে অসঙ্গত নয় তার

প্রমাণ রয়েছে হরিবংশ ও মার্কণ্ডেয়-পুরাণে। যশোদার কন্যাকে দেবকীর পুত্র ভেবে কংস যখন তাকে শিলাপাটে আছড়ে মারতে গিয়েছিল তখন কৃষ্ণভাগিনী দেবী সেই শিশুদেহকোশ থেকে বেরিয়ে পড়ে পাখি হয়ে স্বর্গপুরীতে যান এবং দেবী হয়ে ইন্দ্রের ভগিনী হয়ে তাঁর পূজ্য হন। তাঁর নাম হয় 'কৌশিকী'। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবতারা যখন হিমালয়ে গঙ্গার ধারে দেবীর আবির্ভাবের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন তখন হৈমবতীর দেহ থেকেও দেবী চণ্ডী বেরিয়ে পড়েন দুর্গা হয়ে। এইভাবে কালীও উৎপন্ন হয়েছিলেন চণ্ডীর দেহ থেকে। (পরে বিস্তৃতভাবে বলছি।)

* * *

রুদ্র-সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদে এক জায়গায় আছে যে তিনি পৃথিবীর বাসিন্দা বলে পৃথিবীতে যাদের জন্ম তাদের বিষয়ে আর সর্বাধ্যক্ষ বলে ("সাম্রাজ্যেন") আকাশে যাদের জন্ম তাদের বিষয়ে মানেন।

স হি ক্ষয়েণ ক্ষম্যস্য জন্মনঃ
সাম্রাজ্যেন দিব্যস্য চেততি। ৭, ৪৬, ২ ॥

ঋগ্‌বেদে আর কোন বড়ো দেবতাকে পৃথিবীবাসী বলা হয়নি।

* * *

ঋগ্‌বেদে সংকলিত সূক্তের মধ্যে অত্যন্ত অর্বাচীন একটি সূক্তে (১০, ৯০) ইন্দ্র অগ্নি ও বায়ুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশ নতুন কথা আছে। বৈদিক ভাবনার শেষের যুগে প্রধান দেবতা বলতে এই তিনজনই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঁদের তিনজনের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইন্দ্র। (তলবকার-উপনিষদে ইন্দ্র-যক্ষ-হৈমবতী সংবাদ এখানে স্মর্তব্য।) এই অর্বাচীন সূক্তটিতে যজ্ঞপুরুষের অঙ্গ থেকে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যজ্ঞ পুরুষকে বলি দেওয়া হলে পরে তাঁর মুখ থেকে জন্মেছিলেন ইন্দ্র ও অগ্নি আর তাঁর প্রাণ অর্থাৎ শ্বাস থেকে বেরিয়েছিলেন বায়ু।

মুখাদ্ ইন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ প্রাণাদ্
বায়ুর অজায়ত ।১৩॥

ঠিক এইভাবে সিদ্ধ পুরুষদের উৎপত্তি বলা হয়েছে ঢের ঢের পরবর্তী কালে—বাংলায় সপ্তদশ শতাব্দীতে—সিদ্ধযোগপন্থীদের পুরাণ কাহিনীতে আদিদেবের মৃতদেহ থেকে। এই কাহিনী অনুসারে সৃষ্টির প্রথম আবেশ

হয়েছিল কারণার্ণবে ব্রহ্মডিম্বে (ব্রহ্মাণ্ডের) উৎপত্তিতে। সেই ডিম ভেঙে বেরুলেন আদিদেব ধর্ম। তিনি তাঁর বাম অঙ্গের থেকে সৃষ্টি করলেন কেতকাকে। (এখানে সেমিটিক ধর্মের প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।) ধর্মের বীর্য পান করে কেতকা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতাকে প্রসব করেছিলেন নিজের তিন অঙ্গ থেকে। তার আগেই ধর্মের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর শবদেহের বিভিন্ন অংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন চারজন আদি সিদ্ধা—মৎসেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা (জালন্ধরিনাথ) ও চৌরঙ্গিপা (কানুপা)।

* * *

পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষ কোনই মিল নেই। পুরাণের মতে ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিশ্বের উৎপত্তি। ডিম্বের জল কারণার্ণবে ভেসে থাকা ডিম্বকুসুম বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। তিনি প্রজাপতিরূপে প্রত্যক্ষ অথবা কশ্যপের দ্বারা পরোক্ষভাবে দেব অসুর মুনি নর পশু পক্ষী ইত্যাদি সব জীব সৃষ্টি করেছেন। পৌরাণিক সৃষ্টি-তত্ত্ব আমাদের আলোচ্য নয়।

* * *

জোড়াতাড়া দিয়েই হোক কিংবা ছাঁচ থেকে বার করার মতোই হোক, মূর্তিগড়ার ধরনে দেবতা-নির্মাণ ব্যাপার অর্বাচীন বৈদিক কালে শুরু হয়েছিল বলে আপাতত মনে হচ্ছে। প্রজাপতি তাঁর কন্যার প্রতি কামভাব প্রদর্শনের গল্প বৈদিক গদ্য গ্রন্থগুলিতে আছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে প্রাচীন সেই ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৩, ৩৩) গল্পটি যেভাবে আছে তাতে গড়া দেবতার প্রথম উল্লেখ মিলছে। গল্পটি বিশেষ মূল্যবান। তাই মূল অনুসারে যথাযথ অনুবাদ দিলুম

প্রজাপতি নিজের দুহিতাকে পত্নীরূপে কামনা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন সে দুহিতা দ্যৌ, আবার কেউ কেউ বলেন উষা। দুহিতা যখন রোহিতমৃগীরূপ ধারণ করেছিলেন তখন প্রজাপতি ঋশ্য-মৃগ হয়ে কন্যাকে অভিগমন করেছিলেন। সে কাজ দেবতারা দেখতে পেলেন। তাঁরা ভাবলেন প্রজাপতি তো অত্যন্ত গর্হিত কাজ করছেন। তাঁরা খুঁজতে লাগলেন এমন একজনকে যিনি প্রজাপতিকে শাস্তি দিতে পারেন। নিজেদের মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পেলেন না তাঁরা। তখন নিজেদের মধ্যে যাঁরা

আকারে ভীষণ ছিলেন তাঁদের একত্র সমাবেশ করলেন দেবতারা। তাঁরা সমাবেশিত হয়ে এক নতুন দেবতা হল ভূতবান্। তাঁকে দেবতারা বললেন "ওই প্রজাপতি অনুচিত কাজ করেছে। তাকে বিদ্ধ কর।" তিনি বললেন, "বেশ। তাহলে আমাকে বর দিতে হবে তোমাদের।" তাঁরা বললেন "বল কী বর চাও।" তিনি বর চেয়ে নিলেন পশুদের উপর আধিপত্য। সেই থেকে এঁর এক নাম হল—পশুমান। তিনি এগিয়ে গিয়ে প্রজা-পতিকে শরবিদ্ধ করলেন। বিদ্ধ হয়ে প্রজাপতি লাফিয়ে উঠলেন। সেই থেকে তাঁর এক নাম হল মৃগ। আর সেই মৃগের যে ব্যাধ তিনি সেই ভূতবান্ বা পশুমান। আর সেই যে রোহিত-মৃগী সে হল লাল গাই।

এই গল্পটি নিয়ে বেশ কিছু ভাববার আছে। "সমাবেশিত" দেবতাটি যে বৈদিক রুদ্র (—মানে নিষ্ঠুর দেবতা) ও পৌরাণিক শিব (—মানে, মঙ্গলময় দেবতা) যুক্তরূপে দেখা দিয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ঋগ্‌বেদে রুদ্রকে পশুদের পতি বলা হয়েছে সুতরাং "পশুমান্" নামটির হদিস পাওয়া গেল। মহাভারতে ও পুরাণ কাহিনীতে শিবের কিরাত বেশের ও ব্যাধবৃত্তির উল্লেখ আছে। অতএব মৃগব্যাধেরও সঙ্গতি মিলল। এখন "ভূতমান্" নামটির কথা। পুরাণে ও সংস্কৃত সাহিত্যে রুদ্র-শিবের এক নাম "ভব"। মানে যিনি আগে ছিলেন না এখন হয়েছেন। (এই অর্থে শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নির এক নাম "ভব"।) আর একটি নাম "সর্ব"ও এই সূত্রে গাঁথা পড়ে। মানে, যিনি সর্বদেবতার সমাবেশ। শিবের আর একটি নাম "শর্ব"। এ নামটি দেবতার ব্যাধ বৃত্তির ইঙ্গিত বহন করে। শব্দটির মানে শরক্ষেপকারী। ভব, সর্ব ও শর্ব শিবের এই তিনটি নামে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের গল্পের সমর্থন রয়েছে।

[এইখানে বলে রাখি এই প্রবন্ধে অপর যে কয়টি নির্মিত অথবা শরীর নির্গত দেবতার উল্লেখ করছি তারা সবাই শিবের সম্পর্কিত।]

* * *

শিবের পুত্র কার্তিক (শুদ্ধ নাম কার্তিকেয়, কৃত্তিকার সন্তান) পুরোপুরি না হলেও অংশত গড়া দেবতা। এঁর প্রাচীন নাম "স্কন্দ"। রুদ্রের নিক্ষিপ্ত বীর্য থেকে উৎপন্ন বলে। এঁর জন্মকথা কালিদাসের কুমারসম্ভবে ইঙ্গিতে ব্যক্ত আছে, পুরাণকাহিনীতে স্পষ্ট করে বলা আছে।

এইসব থেকে অনুমান হয় যে এ দেবতাটি আসলে গঠিত বা নির্মিত। তারকাসুরকে দমন করতে না পেরে দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিয়েছিলেন। ব্রহ্মা তাঁদের বলেন যে শিবের পুত্র জন্মালে কেবল সেই তারকাসুরকে দমন করতে পারবে। শিব ব্রহ্মচারী। সুতরাং আগে তাঁর বিবাহ ঘটানো আবশ্যক। সে বিবাহ ঘটানো হল পার্বতীর সঙ্গে। কিন্তু পার্বতী শিবের ঔরসে পুত্র জন্মাতে পারলেন না। শিববীর্য নিক্ষিপ্ত হল প্রথমে অগ্নিকুণ্ডে, তারপর সেখান থেকে জলে। জলধারা তা সহ্য করতে না পেরে উৎক্ষিপ্ত করে দিলে তীরে শরবনে। সেখানে ছ-বোন কৃত্তিকা তাকে গড়েপিটে মানুষ করলে। ছ-মায়ের স্তনপান রবার জন্য তাঁর মুখ হল ছটি। এই হল কার্ত্তিকের জন্মকথা।

জলের মধ্যে নারীর মানুষ করা শিশু দেবতার প্রসঙ্গ ঋগ্‌বেদে আছে, (২.৩৫)। এঁর কোন বিশিষ্ট নাম পাওয়া যায়নি, উল্লেখ আছে "অপাং নপাৎ" অর্থাৎ নদীদের বা জলস্রোতের নাতি (অথবা ছেলে) বলে। এঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বৃষ নদীদের গর্ভাধান করেছিল। ("স ঈং বৃষাজনয়ৎ তাসু গর্ভম্)। বহু নারী মিলিত হয়ে একটি গর্ভ ধারণ করা অসম্ভব। এখানে তাই নির্মাণ বুঝতে হবে। এই অপাং নপাৎ 'স্কন্দের'ই প্রাচীনতর অভিধা।

* * *

দেহকোষ থেকে নির্গত যশোদানন্দিনী দেবী চণ্ডীর উল্লেখ আগে করেছি। কোশবিধি নির্গত বলেই যে তাঁর নাম কৌশিকী তাও বলেছি। পুরাণে অন্যত্রও তাঁর কৌশিকীত্বের প্রমাণ আছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর তিনটি মাহাত্ম্যকাহিনী বর্ণিত আছে। তার মধ্যে প্রথমটিতে দেবী অব্যক্ত। তাতে কোন গল্পই নেই। গল্প আছে অপর দুটিতে।

দ্বিতীয় কাহিনী হল মহিষাসুরদলন। এই কাহিনী অনেকটা যেন ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের কাহিনীটির মতো। মহিষাসুরের প্রতাপে জর্জরিত হয়ে উপায়ান্তর না দেখে দেবতারা নিজ নিজ দেহ থেকে শক্তি অংশ নিয়ে দেবীকে নির্মাণ করে নিজের নিজের বিশেষ অস্ত্রশস্ত্র তাঁকে সমর্পণ করলেন। তাই বোধ হয় দেবীকে বহুভুজ হতে হল। (মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবী

দশভুজা। লোকব্যবহারে শিল্পে পূজায় পাওয়া যায়—চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা ও অষ্টাদশভুজা প্রতিমা।)

এখন গল্পটা বলি। মহিষাসুর প্রবল হয়ে দেবতাদের স্বর্গলোক থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দেবতারা তাই বাস্তহারা হয়ে মর্ত্যলোকে বিচরণ করছেন। অগত্যা তাঁরা ব্রহ্মাকে নেতা করে গেলেন বিষ্ণু ও শিবের কাছে। (এখানে মনে করি প্রথমে বিষ্ণুরই উল্লেখ ছিল, শিবের নাম পরে যুক্ত হয়েছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের তিনটি কাহিনীতেই দেবী বিশেষ-ভাবে বিষ্ণুমায়া বলেই উল্লিখিত।) দেবতাদের অনুযোগ শুনে বিষ্ণু (এবং শিব) ক্রুদ্ধ হলেন। বিষ্ণুর (এবং শিবের ও ব্রহ্মার) মুখ থেকে মহৎ তেজ নির্গত হল। তারপর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের শরীর থেকেও তেজ নির্গত হয়ে সব তেজ একত্র সমাবিষ্ট হয়ে দাঁড়াল এক বিরাট নারী।

অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদ্ অভূন্ নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

সর্বদেবশরীরাংশসম্ভূত এই দেবী দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্রমণ্ডিত হয়ে মহিষাসুরকে বিনষ্ট করে দেবতাদের স্বর্গরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সিংহবাহিনী বহুভুজা দেবীই দেব ও নরলোকে প্রথম পূজা পেয়েছিলেন।

তারপর মার্কণ্ডেয়-পুরাণের তৃতীয় কাহিনী। শুম্ভ আর নিশুম্ভ দু ভাই অসুর প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। দেবতারা অবশেষে দেবী মহিষমর্দিনীকে (দ্বিতীয় কাহিনীতে বর্ণিত) স্মরণ করলেন। তিনি দেবতাদের আগেই বর দিয়েছিলেন যে বিপাকে পড়ে তাঁকে স্মরণ করলে তিনি উদ্ধার করবেন। সেই বর স্মরণ করে দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে দেবী বিষ্ণুমায়ার আরাধনা করলেন তাঁর স্তব গেয়ে ("দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ")। গঙ্গার তীরে বসে দেবতারা বিষ্ণুমায়ার স্তব করছেন এমন সময়ে পার্বতী সেখানে স্নান করতে এলেন। দেবতাদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কোন্ দেবীর স্তব করছেন?" এই কথা বলতে বলতেই তাঁর শরীরকোষ থেকে মঙ্গলময়ী দেবী ("শিবা") নির্গত হয়ে বললেন, "এ স্তব আমাকেই করা হচ্ছে ("স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে")। মেয়েটি ("অম্বিকা") পার্বতীর দেহকোশ থেকে বিনির্গত হয়েছিলেন বলে তার নাম কৌশিকী বলে প্রচারলাভ করেছিল।

শরীরকোশাদ্ যৎ তস্যাঃ পার্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥

অম্বিকা নির্গত হয়ে গেলে পর পার্বতী কালো হয়ে গেলেন। তারপর তাঁর নাম হল কালিকা (কালী)।

তস্যাং বিনিঃসৃতায়াংতু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥

(এক মূলদেবী পার্বতী থেকে দুই দেবী কালী ও গৌরীর সৃষ্টি হওয়ার এই ব্যাপারে প্রাচীন বৈদিক মিথে রাত্রি (নক্ত) ও উষার কাহিনীর অনুসরণ আছে। রাত্রির অন্ধকার গর্ভ থেকে আবির্ভাবের প্রতিরূপ হচ্ছে এই পার্বতী-কালী থেকে অম্বিকা-গৌরীর আবির্ভাব।)

তারপর সুন্দরী অম্বিকার কথা শুনে বিয়ে করবার জন্যে প্রলুব্ধ হয়ে শুম্ভ তাঁকে আনতে পাঠালে চণ্ড ও মুণ্ড অসুর দুজনকে দূত করে। দেবী প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে ব্যক্তি তাঁকে পরাক্রমে পরাজিত করতে পারবে তাকেই তিনি বিবাহ করবেন, আর কারো বশে তিনি যাবেন না। চণ্ড-মুণ্ডের দৌত্য নিষ্ফল হওয়ায় শুম্ভ তার সেনাপতি ধূম্রলোচনকে পাঠালে অম্বিকাকে ধরে নিয়ে আসতে। তার সঙ্গে গেল ষাট হাজার অসুর সেনা। তাদের দেখে দেবী হিমাচলের উপর থেকেই হেঁকে বলেছিলেন ফিরে যেতে। ধূম্রলোচন তা না শুনে এগিয়ে এসেছিল তাঁকে ধরতে। দেবী হুঙ্কার ছেড়ে ধ্রূম্রলোচনকে ভস্ম করে দিলেন। আবার চণ্ড-মুণ্ড এল। তাদের দেখে দেবী ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল। আর তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল-ললাট থেকে তখনি বেরিয়ে এলেন বিচিত্র অস্ত্র নিয়ে করালবদনা কালী। তাঁর পরিধানে বাঘছাল, তাঁর শরীর কঙ্কালসার ভীষণ বদন, লকলক করছে জিব। চণ্ডমুণ্ডের মাথা কেটে নিয়ে কালী দেবীর কাছে গেলে পর দেবী খুসি হয়ে তাঁর নাম রাখলেন চামুণ্ডা। তারপর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধ করতে এল। তখন দেবতাদের শরীর থেকে তাঁদের শক্তি নির্গত হয়ে তাঁরা দেবীর বাহিনী হয়ে যুদ্ধে যোগ দিলেন। দেবীর শরীর থেকে নির্গত হল অতিভীষণ চণ্ডিকা। তার কাছে শত শত শৃগাল চীৎকার করতে লাগল।

ততো দেবীশরীরাৎ তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকা শক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥

(অম্বিকার ললাট থেকে কালিকার উদ্ভব গ্রীক পুরাণের এথেনীর (Palles

Athene উৎপত্তিরই অনুরূপ। আথেনীও বেরিয়েছিল জেউসের কপাল থেকে। শৃগাল-পরিবৃত চণ্ডিকার তুলনা চলে ধরিত্রী মাতার (Meter Khthon) বর্ণনায়। তিনিও নেকড়ে পরিবৃত। (হমিওদের হোমেরীয় স্তব দ্রষ্টব্য।)

শিবারা (মতান্তরে শিব দূত হয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে গিয়ে দেবীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বলেছিলেন। (এই হেতু দেবী চণ্ডিকার নামান্তর শিবাদূতী।) সে কথায় অসুর ভাই দুজন কান দিলে না। যুদ্ধ লাগল। অসুর দল হেরে পালাতে শুরু করলে। তখন এগিয়ে এল মহা অসুর রক্তবীজ। তার এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লে তখনি রক্তবীজ জন্মায় তারই মতো। তখন চণ্ডিকা চামুণ্ডাকে বললেন, তুমি হাঁ করে থাক। আমি রক্তবীজের মাথা কেটে ফেললেই তুমি তার সব রক্ত গিলে ফেলবে, এক ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দেবে না। তাই করা হল। রক্তবীজ নিহত হল। তারপর শুম্ভ নিশুম্ভ দুভাই যুদ্ধে নামল। একে একে দুভাই-ই দেবীর হাতে মারা পড়ল। তখন সমস্ত উদ্ভূত দেবী মূল দেবীর শরীরে নিলীন হলেন। একলা রইলেন অম্বিকা।

ততঃ সমস্তাস্ তা দেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখালয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্ তনৌ জগ্মুর্ একৈবাসীৎ তদাম্বিকা॥

* * *

যে সব পুরাণে গণপতির (গণেশের) সঙ্গ আছে সেখানে তাঁকে নানাভাবে বলা হয়েছে—কোথাও শিবপার্বতী-পুত্র, কোথাও শব-পুত্র, কোথাও বা পার্বতী-পুত্র। শিব-পুরাণে আর কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডী মঙ্গলে গণেশের উৎপত্তি বলা হয়েছে পার্বতীর অঙ্গমল থেকে। গণেশের গজ মুণ্ডের কারণ দেখানো হয়েছে শনির দৃষ্টি। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়ে গেলে পর উত্তর-শিয়র করে শুয়ে থাকা হাতির মাথা কেটে এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোন কোন পুরাণের মতে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে গণেশের শিরশ্ছেদ করেছিলেন অথবা শিবের শাপে গণেশের হস্তিমুণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

মুকুন্দের বিবরণ সংক্ষেপে দিই। পার্বতীর সখী জয়া ও বিজয়া এক দিন দেবীর অঙ্গ সংস্কার করে প্রচুর ময়লা তুলে ছিল। সেই ময়লা-মাটি দিয়ে দেবী খেলার পুতুল তৈরি করেছিলেন। মাথা গড়বার আগেই ময়লা-মাটি

ফুরিয়ে যায়। শিবের আদেশে নন্দী এক হাতির—উত্তর শিয়র করে শোওয়া—মাথা কেটে এনে বসিয়ে দেয়। তখন শিব তাতে জীবন্যাস করে পার্বতীকে দিয়ে বলেন, এই নাও তোমার ছেলে।

*　　*　　*

তারপর মনসা। শিবের কন্যা। ইনিও—বাংলা পুরাণকথা মতে—কৃত্রিম দেবতা। একদা শিব যখন কালিদহে পদ্মফুল তুলছিলেন তখন পরিবেশের যোগাযোগে—সংস্কৃত পুরাণকাহিনী হলে এখানে কামদেবের শিকারের উল্লেখ হত—তাঁর মনে কামভাব জাগে আর তাঁর বীর্যস্খলন হয়। সে বীর্য রাখেন তিনি পদ্মপত্রে। এক জোড়া কাক তা লক্ষ্য করেছিল। সেখান থেকে শিব সরে গেলে পর মাদী কাক তা তুলে নেয় কিন্তু গলাধঃকরণ করতে না পেরে তা উগরে ফেলে দেয় পদ্মপলাশে। তারপর পদ্মের মৃণাল বেয়ে সেই শিববীর্য নেমে যায় পাতাল গর্ভে। পরে দেবকাক বাসুকির—মতান্তরে বাসুকির মায়ের মাথার উপরে। তা নিয়ে বাসুকি—মতান্তরে তার মা—একটি পুতুল গড়ে। তার জীবন্যাস হয়। সেই পুতুল হলেন বাসুকির ভগিনী, শিবের কন্যা মনসাকুমারী। তারপরের কাহিনীতে আমাদের কাজ নেই।

মনসার এই উৎপত্তি কার্তিকের মতোই। দুইয়েরই উপাদান শিববীর্য। একজন হল পুরুষ আর একজন হল মেয়ে। দুদেবতাই মেয়ের হাতে গড়া জলের মধ্যে। এই কল্পনার মধ্যে কি শারীরতত্ত্বের রূপক লুকিয়ে আছে? কে জানে॥

[প্রবন্ধের শিরোনাম ঋগ্‌বেদের একটি বাক্যাংশ। মানে দেবতাদের জাত। ইংরেজীতে বললে Race of Gods অর্থাৎ দেবতারা একটি বিশেষ গোষ্ঠীরূপে বাক্যাংশের প্রথম পদ "দেবাঞ্" সন্ধির ফলে। মূল রূপ "দেবাম্"—দেব শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন, "দেবানাম"-এর খুব পুরোনো রূপ, ইন্দো-ইউরোপীয় *deiwom থেকে।]

ইন্দ্রের উদয়াস্ত

॥ ১ ॥

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান বীজতলা হল ঋগ্‌বেদ সংহিতা। এই গ্রন্থের স্তুত ও বন্দিত দেবতাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হচ্ছেন ইন্দ্র। যদিও ইনি দেবতাদের সঙ্গে প্রাচীনতম নন তবুও ইনিই সর্বেসর্বা। অথচ বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী স্তর থেকে দেখছি যে ইন্দ্রের মাহাত্ম্য ক্রমেই খর্ব হয়ে আসছে। শেষে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন পর্যায়ের অবসানে যার তলানির অবশেষ চিহ্ন এখনও আমাদের সংস্কৃতির বর্তমান পর্যায় থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, দেখি যে সাধারণ পূজা-অনুষ্ঠানে পূজিত-উপাসিত নানা শ্রেণীর দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান নেই। তবে কোথাও যে নেই তা বলা যায় না। আছে দু-একটি ঘরাও ও মেয়েলি অনুষ্ঠানের ব্রত রূপে। তবে সেখানেও এক হিসাবে ইন্দ্রকে অনুপস্থিত ধরতে পারি। অর্থাৎ সেখানে ইন্দ্র থাকলেও তাঁর নামটি চাপা পড়ে গেছে। ইন্দ্রের উত্থান থেকে আরম্ভ করে পতন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির তিন হাজার বছরের বিরাট পর্যায়ে এই ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

ঋগ্‌বেদ একটি সংকলন গ্রন্থ। এতে একাধিক স্তরের একাধিক কালের এবং একাধিক গোষ্ঠীর রচনা একসূত্রে গাঁথা পড়েছে। পণ্ডিতেরা বিচার-বিবেচনা করে ঋগ্‌বেদে সংকলিত দেবতা-স্তোত্র কবিতাগুলির বিশ্লেষণ করে যথাসম্ভব স্তর, কাল ও গোষ্ঠী ভাগ নির্দেশ করেছেন। এই নির্দেশ অনুসারে ঋগ্‌বেদের প্রাচীনতম স্তরের স্তোত্র-কবিতাগুলিতে ইন্দ্রকে দেবতাদের মধ্যে সর্বগুণে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করবার প্রবল চেষ্টা আছে। এই চেষ্টা থেকে স্বভাবতই মনে হয় যেন এক নবাগত দেবতা ইন্দ্রকে দেবতাদের রাজাধিরাজ করে প্রচার করতে চাইছেন কতকগুলি কবি। অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা জানি যে ঋগ্‌বেদের কবিদের পূর্বপুরুষ (অথবা কোন কোন কবি) যখন ইরানে ছিলেন—অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে অথবা তারও আগে—তখন তাঁদের সম্প্রদায়ের—অর্থাৎ ইন্দো-ইরানীয় গুচ্ছের-মধ্যে দেব-উপাসনা নিয়ে দুটি বড় দল গড়ে উঠেছিল। একদল ছিলেন নিষ্ঠাবান অগ্নিষ্টোমী, আর একদল

ছিলেন অনুরক্ত সোমযাজী। সোমযাজী দলই ইন্দ্রকে নিয়ে মাতামাতি করেছিলেন এবং সাময়িক ভাবে প্রবল হয়ে তাঁরা ইন্দ্রকে অগ্নিষ্টোমীয় দল থেকে কেড়ে আনতে পেরেছিলেন। সোমযাজীরা তাঁদের নবজাত নূতন দেবতার যে বড়াই করেছেন ঋগ্‌বেদে তার অন্ত নেই।

"জন্ম মাত্রেই যে মনস্বী দেব প্রথমেই সব দেবতাদের হারিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধিবীর্যে ("ক্রতুনা"), যে ক্ষিপ্রবীর্যের মহিমায় ("নৃম্ণস্য মহ্না") ধনিলে ("শুষ্মাৎ") স্বর্গমর্ত্য কেঁপে উঠেছিল,—ওহে লোকজন, তিনি ইন্দ্র॥" (২-১২-১)

বীর যোদ্ধা নেতা ইন্দ্র কত সুবিধা করে দিয়েছেন। "যিনি বিশ্বের সব কিছুকে নাড়া দিয়েছেন যিনি দাস জাতিকে নীচে গুহায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, যিনি জিনিয়ে জুয়াড়ির মতো শত্রুপক্ষের ধনসম্পত্তি হরণ করে নেন,—ওহে লোকজন, তিনি ইন্দ্র।" (- ২-৪)

অবিশ্বাসীদের প্রতি উক্তি,

"যাঁর সম্বন্ধে নাকি লোকে প্রশ্ন করে, কই সে প্রচণ্ড (দেবতা)? কেউ কেউ আবার এর সম্বন্ধে বলে, "ও নেই।" তিনি কিন্তু শত্রুপক্ষের ধনসম্পত্তি জুয়ার দানের মতো হরণ করে নেন,—ওহে লোকজন, তিনি ইন্দ্র॥" (২-১২-৫)

আর দেখ—শত্রু মিত্র দু পক্ষই যুদ্ধ জয়ের জন্যে তাঁকে ডাকে, তাঁর দোহাই দেয়।

"যাঁকে যুদ্ধকালে দুদলই চীৎকার করে দুভাবে ডাকে,—বিপক্ষ ও পক্ষ, দুই শত্রু পক্ষই। একই রথে চড়ে তাঁকে ডাকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে।—হে লোকজন, তিনি ইন্দ্র।" (২-১ -৮)

এখনকার দিনের কোন বাগ্মী পলিটিকাল নেতা ইলেকসনে এমন বক্তৃতা দিলেও এই কবিতাটি মন্দ সজ্জিত না।

॥ ২ ॥

প্রাচীন পূজ্য দেবতাদের উপর ইন্দ্রকে চাপিয়ে দিলে পর নিশ্চয়ই পূজক সমাজে কিছু না কিছু বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই ঘটেছিল। তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত ঋগ্‌বেদের মধ্যে আছে, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তো আছেই।

॥ ৪ ॥

জোরজার করে ইন্দ্রকে দেবতাদের পাটে উঠানো হল। এ ব্যাপার সম্ভবত ঘটে ছিল ভারতবর্ষে আসবার অনতিকাল পূর্বে। এদেশে এসে কিন্তু ইন্দ্রের মাহাত্ম্য একটু একটু করে খর্ব হতে থাকে। এটা আমার অনুমান মাত্র নয়। পর্ব অনুসারে প্রচণ্ড প্রমাণ মিলছে পরবর্তী সাহিত্যে। বৈদিক গদ্য-গ্রন্থগুলিতে দেখি যে ইন্দ্র আর সব দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ থাকলেও আর তাদের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য নন। তাঁর স্থান নিচ্ছেন মুখ্য হিসাবে প্রজাপতি, সর্ব শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিষ্ণু। (উপনিষদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে দেব, মানব ও অসুর এই তিন মুখ্য প্রজাপতির সন্তান। এই তিন সন্তানকেই পড়াতেন তিনি নিজে পাঠশালা করে। এঁদের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যায় দেবতারাই ছিলেন সব চেয়ে ভালো। তাঁরা পড়া শেষ করে এক চান্‌সে পরীক্ষা পাশ করে যান। মানবেরা পাশ করলে দ্বিতীয় চান্‌সে, অসুরেরা লাষ্ট চান্‌সে।)

ইন্দ্র হটতে সুরু করলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণুও ইন্দ্রের মতো গৃহস্থালির দেবতা, তবে তার বাইরের মাহাত্ম্যও স্বীকৃত ছিল। ঘরের ছেলে যে গার্হপত্য অগ্নি, বিষ্ণু তাঁরই প্রতীক এবং এই সূত্রে যজ্ঞেরও প্রতীক। বাইরে তিনি ত্রিবিক্রম—তিন পা ফেলে তিনি বিশ্বজগৎ মেপে ফেলেছেন। তুরীয় লোকে তাঁর ধাম। সেখানে মধুর উৎস, গোক্ষীরের সরোবর। ইন্দ্র যখন পাটে বসেছেন তখনও বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ তো ছিলোই না, উপরন্তু ঘনিষ্ঠ সহযোগ ছিল। তিনি ছোট ভাইয়ের মতো ইন্দ্রের সব বড় বড় কাজে সহায়তা করেছেন। (এই কারণে "তাঁর উপেন্দ্র" অর্থাৎ ছোট-ইন্দ্র নামটি চালু হয়ে গিয়েছিল পৌরাণিক সাহিত্যে।)

ইন্দ্রের মাহাত্ম্য কমতে সুরু হল অসুরদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে। (অন্তত, ব্রাহ্মণগুলির গল্প থেকে আমরা সেই কথাই বুঝছি। অসুররা বড় ভাই, তারা বিজ্ঞ বিচক্ষণ কর্মী। দেবতারা যেন বৈমাত্র ভাই,—হাসি খুসি, গানবাজনা নিষ্কর্মা খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকে। সংসারের কাজে দেবতাদের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য না পেয়ে অসুরেরা বিরক্ত হয়ে দেবতাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যোগ করলে। এ বিপদ থেকে বাঁচালে শিশুরূপী বিষ্ণুই—যিনি আসলে যজ্ঞ স্বরূপ। দেবতাদের অনুনয়ে ভুলে গিয়ে অসুরেরা তাঁদের শুধু বিষ্ণুর মাপে একটুরো জমি ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হল। সেখানে দেবতারা যজ্ঞ করবেন। (পরের অধিকৃত ভূমিতে স্বাধীন যজ্ঞ হয় না।)

বিষ্ণু মাটিতে শুয়ে পড়েই চার দিকে বেড়ে চললেন। তখন অসুরেরা কোণ-ঠেসা হতে হতে পৃথিবীতে ঠাঁই না পেয়ে রসাতলে চলে যেতে বাধ্য হয়। ব্রাহ্মণের এই গল্প হল ঋগ্‌বেদের ত্রিবিক্রম ব্যাখ্যায় ও পুরাণের বলির পাতাল প্রবেশ গল্পের মাঝামাঝি রূপান্তর। এই গল্প থেকে যজ্ঞ-বিষ্ণুর সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বুঝতে পারি।

দেবতারূপে প্রথম শ্রেণীর থেকে দ্বিতীয় (তৃতীয় ?) শ্রেণীতে ইন্দ্রের অবনতি স্বীকৃত হয়ে গেছে ব্রহ্মবাদের দ্বারা অন্যতম কনিষ্ঠ উপনিষৎ তলবকারে। অসুরদের সঙ্গে বিরোধে জয়ী হয়ে ইন্দ্র মনে করছেন এ জয়লাভ তাঁরই কৃতিত্ব। আসলে এ কৃতিত্ব ব্রহ্মের। এ সত্য ইন্দ্রকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন উমা হৈমবতী। এখানে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তিন শ্রেণী হয়ে গেছে। প্রথমে "ব্রহ্ম" (যক্ষ), দ্বিতীয়ে ব্রহ্মজ্ঞা উমা হৈমবতী, তৃতীয়ে ইন্দ্র দেবতাদের প্রধান।

॥ ৫ ॥

ঋগ্‌বেদে অন্দরের দেবতা ইন্দ্রের সম্বন্ধে মোটামুটি যে ধরনের গল্প প্রচলিত ছিল তার আভাস মিলেছে। এখানে বলে রাখি যে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে ইন্দ্র একমাত্র দেবতা যাঁর সম্বন্ধে একটা গোটাগুটি ধারণা করা যায়, এবং তার গোড়ার দিকে যতই myth-এর মিশ্রণ থাক—যেমন ইন্দ্রের সঙ্গে জুপিটারের মিল—পরে আর কোন মিথের সঙ্গে গাঁথা পড়েনি। পুরাণে ইন্দ্র সম্বন্ধে যেটুকু নতুন কথা পাওয়া যায় তাতে আগেকার গল্প-সুতোই টেনে পাকানো হয়েছে।

সুতরাং ইন্দ্র যে মানববীরের কল্পনাদর্শে সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর পিতা হলেন ত্বষ্টা, যজ্ঞের নির্মাতা।

ভূমিষ্ঠ হয়েই ইন্দ্র পিতাকে অভিভূত করে তাঁর পাত্রভর্তি সব সোম পান করে নিয়েছিলেন (৩. ৪৮. ৪)। নবজাতক ইন্দ্র জন্মেই বাপের পা ধরে আছাড় মেরে মাকে বিধবা করেছিলেন (৪. ১৮. ১২)। পুত্রের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে মা ভয়ে লুকিয়ে পড়েন। ইন্দ্র তাঁকে খুঁজে বার করেন ("পরায়তীং মাতরম্ অবচষ্ট") (৪. ১২. ৩)। তারপর লজ্জায় ও ভয়ে (?) পুত্রকে কিছুদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন। ("অবদ্যম্ ইব মন্যমানা গুহাকং ইন্দ্রং মাতা") (৪. ১২. ৫)।

ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রের পত্নীর উল্লেখ অনেকবার আছে। তবে তাঁর নাম পাওয়া যায় দুটি—ইন্দ্রাণী ও শচী। ইন্দ্রাণী নামটি 'ইন্দ্র' নাম থেকে তৈরি। শচী নামটি ইন্দ্রের নামান্তর 'শক্র' (অর্থাৎ শক্তিমান পুরুষ) থেকে উৎপন্ন। পরবর্তী কালে শচী নামটি ইন্দ্রপত্নীর ব্যক্তিগত নাম বলে গৃহীত হয়েছে।

ঋগ্‌বেদের এক স্থানে (৪.১৮.৮) উল্লিখিত আছে যে ইন্দ্রের মা (?) তাঁকে এক মুহূর্ত জলে ফেলে দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কুষবা (রাক্ষসী ?) গ্রাস করে নিয়েছিল কিন্তু পরমুহূর্তেই ইন্দ্র জল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এ ঘটনা নবজাতককে লুকিয়ে রাখবার ব্যাপার হতে পারে, অন্য কাহিনীও হতে পারে।

অথর্ববেদে (৭. ৩৮. ২) একটি অভিনব কাহিনীর আভাস আছে। কোন এক অসুর নারীর আকর্ষণে ইন্দ্র দেবসভা ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। যজুর্বেদের জৈমিনীয় সংহিতায় (১. ৪৭. ৯) এই গল্পই একটু বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের অসুর (বা দানব) প্রেমিকার নাম বিলিস্টেঙ্গা। এর সঙ্গে মিলিত হবার কারণে ইন্দ্র কখনো মেয়ে কখনো বা পুরুষ রূপ ধরে অসুরদের সঙ্গে কিছু কাল বাস করেছিলেন। (মনে হয় এই কাহিনীই মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা-অর্জুন আখ্যানের বীজ।)

ইন্দ্র যে গোড়ায়, সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে, মেয়েলি তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে বিষয়ের একটা বড় প্রমাণ এখন দাখিল করছি। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে বিবাহ-সূক্তের পরেই একটি দীর্ঘ সূক্ত আছে (৮৬)। সেটি পড়লে অবশ্যই মনে হবে যে এটি ইন্দ্র সম্পর্কিত কোন মেয়েলি কাহিনীর ছড়া। কাহিনীতে ইন্দ্রের মহিমা ব্যক্ত করার চেষ্টা আছে। সব শ্লোকের শেষেই ভণিতা আছে এই পদটি—"বিশ্বস্মাৎ ইন্দ্র উত্তর"! অর্থাৎ সবার চেয়ে ইন্দ্র উঁচু। সূক্তটির সম্পূর্ণ অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায় না। তবে এতে মেয়েলি কোঁদলের টুকরো আছে, এবং তার মধ্যে স্থানে স্থানে অশ্লীলতার অভাব নেই। পাত্র তিন জন অর্থাৎ উক্তি আছে তিন জনের—ইন্দ্রের, ইন্দ্রাণীর ও বৃষাকপির। তবে আরও একজনের উপস্থিতি ছিল। তিনি বৃষাকপির পত্নী ("বৃষাকপায়ী", শ্লোক ১৩)। স্পষ্ট করে বলা না থাকলেও মনে হয় বৃষাকপি ইন্দ্রের পুত্র এবং প্রিয়, ইন্দ্রাণীর সপত্নীপুত্র (এবং প্রেমাভিলাষী ?)। বৃষাকপির পত্নীও শ্বশুরের প্রিয়, কেননা তিনি সম্পন্ন গৃহস্থবধূ, পুত্রবতী, শ্বশুরকে ভালো করে রেঁধে ষাঁড়ের মাংস খেতে দেন। ইন্দ্রাণীর কথায় বোঝা যায় যে তিনি বৃষাকপায়ীকে পছন্দ করেন না। সুতরাং ঝগড়া ঘরোয়া ও মেয়েলি। সম্পূর্ণ গল্পটি পেলে ভালো হত।

॥ ৬ ॥

পুরাণের আওতায় এসে ইন্দ্র পাকাপাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রথম শ্রেণীর দেবতার মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গে যে ব্রহ্মার নাম হয়, সেই ব্রহ্মার—অর্থাৎ অর্বাচীন বৈদিক ঐতিহ্যের প্রজাপতির—সঙ্গে তুলনা করলে তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর দেবতা বলতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর দেবতারা মানুষের মতো, তবে তাঁদের জরা নেই, মৃত্যুও নেই। সদা সুখভোগ তাঁদের একমাত্র কর্ম। তবে তাঁদের অদৃষ্টে দুঃখভোগও দৈবাৎ ঘটে। কোন কোন অসুর ব্রহ্মার অথবা শিবের বর পেয়ে প্রবল হয়ে দেবতাদের স্বর্গরাজ্য থেকে হটিয়ে দেয়, তখন তাঁদের দুঃখভোগ করতে হয়। পুরাণ-পাঠকের এমন গল্প অজানা নয়।

পুরাণের কোন কোন গল্পে ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর বিরোধ দেখা যায়। এখানে বিরোধ ঠিক বিষ্ণুর সঙ্গে নয়, কৃষ্ণের সঙ্গে। (পৌরাণিক সাহিত্যে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এক হয়ে গিয়েছেন।) বিষ্ণু ইন্দ্রের চিরকালের সখা। কিন্তু ঋগ্‌বেদে দেখি যে কৃষ্ণ ইন্দ্রের বিপক্ষ। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণের কোনই সম্পর্ক নেই। কৃষ্ণ এক মহাবীর দলপতি। ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়েছিল। (বেশ কিছুকাল আগে চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিষ্ণু-কৃষ্ণ কথা' প্রবন্ধে আমি এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলুম। কৌতূহলী পাঠক তা দেখতে পারেন।) বিষ্ণু-কৃষ্ণ এক হয়ে যাবার পর বিষ্ণু ক্রমশ কৃষ্ণে লীন হয়ে যান এবং অবশেষে বিষ্ণু কৃষ্ণের অধস্তন স্বরূপ বলে একটু নীচে নেমে যান। ঋগ্‌বেদের বিষ্ণুর উর্ধ্বতম ধাম গোলক কৃষ্ণ অধিকার করেন। বিষ্ণুর জন্য অভিনব অধস্তন বৈকুণ্ঠধাম সৃষ্ট হয়। পুরাণে যখন কৃষ্ণ বিষ্ণুর উপরে উঠে গেলেন তখন ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধের স্মৃতিও - হয়ত ইন্দ্রপূজার সঙ্গে কৃষ্ণপূজার বিরোধ জেগে উঠল। গোবর্ধন-ধারণে, পারিজাত-হরণে ইন্দ্র-কৃষ্ণ বিরোধের পৌরাণিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

ইন্দ্রের প্রতিপত্তি যখন প্রবলতম, তখন ঋগ্‌বেদে দেখেছি তিনি উষার শকট ভেঙে ফেলেছেন, উষার উপর অত্যাচার করেছেন। পুরাণে পৌঁছে দেখি যে উষার তাৎক্ষণিক প্রতিনিধি দেবী পার্বতীর কাছে সকল দেবতার সঙ্গে ইন্দ্রও এসে সাহায্যভিক্ষা করছেন মহিষাসুরের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে। দেবীর অনুগ্রহে পরিত্রাণ পেলেনও। এ কাহিনী আছে মার্কেণ্ডেয় পুরাণে।

হরিবংশ ও বিষ্ণু-পুরাণে আছে আর এক কাহিনী। দেবী ঊষা জন্ম নিয়েছেন দেবকীর আতুড় ঘরে কংস কারাগারে কৃষ্ণের ভগিনীরূপে। কংস দৈববাণীতে জেনেছিল যে তার ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে তার হাতে কংসের মৃত্যু ঘটবে। দেবীকে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান মনে করে কংস শিশুকে শিলাপটে আছড়ে মারতে যায়। শিশুর আত্মা দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে চিল হয়ে আকাশে উড়ে পালায়। বিষ্ণু তাঁকে বলে দেন যে স্বর্গে গেলে ইন্দ্র তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করবেন। ইন্দ্র তাই করেছিলেন। এই থেকে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যে দেবীপূজার আরম্ভ।

॥ ৭ ॥

পুরাণ কাহিনীতে ইন্দ্র যে শুধু দেবতাশ্রেণীতে নীচে নেমে গিয়েছেন তা নয়, কখনো কখনো অসুরের মতো দুষ্কৃতকারীও হয়েছেন।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে একটি গল্প আছে। গল্পটি ইন্দ্রের মাহাত্ম্যসূচক নিশ্চয়ই। একদা দীর্ঘজিহ্বী নামে এক অসুর রমণী (বা রাক্ষসী) খুব যজ্ঞবিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। দেবতাদের যজ্ঞভাগ সব সে খেয়ে নিত। তাকে কিছুতেই জব্দ করা যাচ্ছিল না। দীর্ঘজিহ্বীর বিশেষত্ব ছিল এই যে তার অঙ্গে অঙ্গে গাঁটে গাঁটে ছিল যোনি। সুতরাং তাকে কোন পুরুষই কাবু করতে পারত না। অবশেষে ইন্দ্র নিজের অঙ্গে গাঁটে গাঁটে মুষ্ক সৃষ্টি করে দীর্ঘজিহ্বীকে কাবু করেছিলেন।

এই গল্পটি রূপান্তর লাভ করেছে পুরাণে রামায়ণে গৌতম-অহল্যা-ইন্দ্র-রামের 'আখ্যানে'। ইন্দ্র এখানে কামুক, দুষ্কৃতকারী অসুরতুল্য। তিনি গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করেছিলেন বলে গুরুর শাপে তাঁর অঙ্গে অঙ্গে গাঁটে গাঁটে যোনি চিহ্ন উৎপন্ন হয়। (পরে এই চিহ্ন চক্ষুচিহ্নতে পরিণত হয়ে ইন্দ্রের বিশিষ্ট লক্ষণে দাঁড়ায়।) বৈদিক গল্পের ইন্দ্রে স্থান নিয়েছেন রাম। তিনি যেভাবে অহল্যাকে—বেদের গল্পের দীর্ঘজিহ্বীর প্রতিনিধি—তাতে অন্য একটি মিথ্যের ছায়া পড়েছে।

একদা ইন্দ্র যে অসুরদের দলেও ছিলেন তার আভাস আমরা অথর্ববেদে ও কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পেয়েছি এবং সে উল্লেখ আগে করেছি। এখন অবৈদিক পরবর্তী সাহিত্য থেকে সে বিষয়ে দুটো-একটা খুচরো প্রমাণ দিই—দুটি শব্দে। একটি সাধারণ শব্দ—'ইন্দ্রজাল' আর একটি ব্যক্তিনাম—

'ইদা মেট্যা' ইন্দ্রজাল শব্দটি ঋগ্‌বেদে নেই, আছে অথর্ববেদে, একবার, মানে 'ইন্দ্রের পাশ (অস্ত্র)'। সংস্কৃত সাহিত্যে শব্দটির মানে দাঁড়িয়েছে—"বিভ্রম, magic"। এই মানেই এখন পর্যন্ত চলে এসেছে। এখানে 'জাল' শব্দটি 'মায়া' শব্দের সমার্থক, তবে ঋগ্‌বেদে ব্যবহৃত অর্থে—(যেমন, "বরুণস্য মায়া") নয়, সংস্কৃতে ব্যবহৃত অর্থে (যেমন 'আসুরী মায়া')। ইন্দ্রজাল শব্দের এই অর্থ-বিকারের মধ্যে ইন্দ্রের অধোগমনের যেমন প্রমাণ থাকতে পারে, সেই রকম "ইন্দ্রিয় জাল" শব্দের কিছু অর্থপ্রভাব থাকতে পারে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে এক মায়াবী অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক চোরের উল্লেখ আছে। তার নাম "ইদা মেট্যা" অর্থাৎ ইন্দ্র ভুঁইয়া। সে রাত্রিতে গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করতে যাবার আগে মন্ত্র পড়ে ও তুক-তাক করে গৃহস্থকে ঘুম পাড়িয়ে দিত তারপর নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে চুরি করত। এই নামটিতে অসুরভাবাপন্ন ইন্দ্রের কিঞ্চিৎ প্রমাণ (clue) রয়ে গেছে বলে মনে করি।

॥ ৮ ॥

একের নম্বর দেবতার স্বরূপে না থেকে মহনীয়রূপে, দেবরাজরূপে ইন্দ্রের কিঞ্চিৎ সমাদর এদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত টিকে ছিল। সে হল স্বাধীন রাজার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে। তারই জের চলে এসেছিল সেদিন পর্যন্ত দেশের কোন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামন্ত-ভুঁইয়াদের মধ্যে "ইন্দ্রধ্বজ (শক্রধ্বজ) উত্থান" পরবে। এরই স্মৃতি বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে বাঁশবাজিরূপে বিভ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

॥ ৯ ॥

অন্দরমহলে মেয়েলি অনুষ্ঠানের দেবতারূপে ইন্দ্রের আসন সমানভাবে—অর্থাৎ স্থান-কাল বিবেচনা করে যথাসম্ভব—বজায় আছে। ঋগ্‌বেদের সূক্তে যে দেবতার যেমন অনুষ্ঠান অপালার প্রসঙ্গে দেখেছি ঠিক তেমনি অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত দিয়েছেন পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) একটি সূত্রের উদাহরণে। এক থুবড়ো আইবুড়ো মেয়ে ইন্দ্রকে আরাধনা করে খুশি

করেছিল। ইন্দ্র তাকে একটি মাত্র বর দিতে রাজি হলে চালাক মেয়েটি একটি মাত্র বর চেয়ে তিনটি বরের কাজ আদায় করেছিল। মেয়েটি ইন্দ্রের কাছে এই বরটি চেয়েছিল - "আমার ছেলেরা যেন কাঁসার থালায় দুধভাত খায়।" একে সে গরীবের মেয়ে, তার উপর, তার বিয়েই হয়নি। একটি মাত্র বর চেয়ে সে ইন্দ্রকে ঠকিয়ে তিনটি বর আদায় করেছিল,—স্বামী লাভ, সন্তান লাভ এবং সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ। তখনকার দিনে বড়লোক না হলে কেউ কাঁসার বাসন ব্যবহার করতে পারত না।

অপালা ও বৃদ্ধ কুমারীর মতো এখনও প্রাচীনপন্থী ঘরের বাঙালী অবিবাহিত মেয়েরা ইন্দ্র ব্রত করে পতিপুত্র লাভের সৌভাগ্য চায়। ব্রতটির নাম একটু একটু বদলে গেছে, হয়েছে "ইতু"। এই নামটি নিয়ে পণ্ডিতেরা একটু গোলে পড়েছেন। "ইন্দ্র" নামের সঙ্গে পুরোপুরি মিল না পেয়ে তাঁরা এটিকে "ঋতু"-র (অর্থাৎ ফসলের কালের অথবা fertility cult-এর) বিকৃত রূপ বললেন। কিন্তু শব্দবিদ্যায় ঋতু শব্দের অর্ধতৎসম রূপ ধরলে "ইতু"-কে নিতান্ত আধুনিক শব্দ বলে নিতে হয়। তাহলে ওঁদের যুক্তি টেকে না।

শব্দবিদ্যার সাহায্য নিলে "ইতু" শব্দটির এমন একটি ব্যুৎপত্তি ধরা যায় যা ইন্দ্রপূজা নির্দেশ করে। ইন্দ্র উপাসনার বিশিষ্ট ঋগ্‌বেদীয় সূক্তগুলির একটি নাম ছিল 'ইন্দ্রস্তুত' (অর্থাৎ ইন্দ্রস্তব)। অনুমান করি যে এই শব্দটির প্রাকৃতে আনুমানিক "ইন্দথু" হয়ে শেষে বাংলায় 'ইতু' রূপ পেয়েছে।

তন্ত্রের আদ্য কথা

আমাদের দেশে ধর্মের ব্যাপারে 'তন্ত্র' শব্দটির অর্থে একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সেই তাৎপর্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা হয়েছে তাই এই প্রবন্ধটিতে পাঠক-সাধারণের কাছে নিবেদন করছি। বিশেষ তাৎপর্যটিতে পৌঁছবার আগে শব্দটির মৌলিক অর্থ অনুসরণ করা আবশ্যক। 'তন্' ধাতুতে 'ত্র' প্রত্যয় করে, পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে, 'মন্ত্র, যন্ত্র, বস্ত্র, পবিত্র, অরিত্র' ইত্যাদি শব্দের মতো। এই 'ত্র' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি প্রায় সবই বাস্তব "উপায়" (অর্থাৎ instrument অর্থে রূঢ় হয়েছে। 'মন্ত্র'ও তাই। যাতে করে মনে করা যায়, স্মরণ করা যায়,—আউড়ে যাবার উপায়। এইরকম মৌলিক অর্থে তাঁত যন্ত্র বোঝাতে 'তন্ত্র' শব্দের ব্যবহার ঋগ্‌বেদ থেকে পাণিনি হয়ে চলে এসেছিল সংস্কৃত ভাষায়। এই মৌলিক অর্থ থেকে সহজেই এসে গিয়েছিল একটু নতুন অর্থ "তাঁতের মতো টানা-পোড়েন করে বোনা বা গাঁথা।" আমাদের দেশে প্রস্তুত সংস্কৃত ভাষার সবচেয়ে পুরোনো গল্পের বইটির নাম 'পঞ্চতন্ত্র-আখ্যান', সংক্ষেপে 'পঞ্চতন্ত্র'। এই নাম হবার কারণ বইটির মধ্যে প্রায়ই একটি গল্পের মধ্যে আর একটি গল্প তার মধ্যে আর একটি গল্প—এইভাবে টানা-পোড়েনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, যাকে ইংরেজিতে বলে boxing of tales, যার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ মিলছে আরব্য-উপন্যাসে।

সঙ্গে সঙ্গে শব্দটির আরও একটি গৌণ অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল,—কাঠামো (frame-work), কল, কৌশল technique, (technical matter), যন্ত্রের কাজ (mechanical matter), দেহযন্ত্রের কাজ (physical exertion) ইত্যাদি এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার মিলছে বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও পরবর্তী-কালের জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তকে। 'প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র' ইত্যাদি এখনকার সুপরিচিত শব্দে 'তন্ত্র' কথাটির ব্যবহার—"বিধান, ব্যবস্থা" ইত্যাদি অর্থ এই পথেই এসেছে।

ধর্মক্ষেত্রে 'তন্ত্র' উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। 'তন্ত্র' এসেছিল 'যোগ'-এর সহযোগে। 'যোগ' মানে জুড়ে দেওয়া। 'যোগী' মানে যিনি দেবতার সেবকরূপে যুক্ত। এখানে প্রাচীনতর শব্দ হল 'ভক্তি' ও 'ভক্ত'। এ দুটি শব্দ এসেছে 'ভজ' ধাতু থেকে, মানে অংশ পাওয়া, ভাগীদার হওয়া।

দেবতা যেন feudal lord বা রাজা বা জমিদার, তিনি ভগবান,—সকল সৌভাগ্যের ভাণ্ডারী। ভক্ত যেন তার জোতদার প্রজা। তাঁর ভাণ্ডারের অংশভাক্ তারা। দেবতা (ভগবান) ও উপাসকের (ভক্তের) মধ্যে এই যে অংশীদারি ভাব তারই নাম ভক্তি, ইংরেজিতে sharing বা rationing। এই মূল অর্থ থেকে সহজেই এখনকার প্রচলিত অর্থ উদ্গত হয়েছে। ভক্ত শব্দের মূলে যেমন feudalistic ধারণা ছিল, যোগ শব্দের মূলেও তেমনি imperialistic (অর্থাৎ প্রভুভৃত্য) সম্বন্ধের গন্ধ ছিল। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—service—অর্থে 'যোগ' কথার ব্যবহার যত প্রাচীন, 'যোগী' শব্দের ব্যবহার তত প্রাচীন নয়। দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক হিসাবে 'যোগী' শব্দের ব্যবহার, আমার ধারণা ভারতবর্ষের বাইরের প্রভাব থেকে এসেছে। সে কথা স্পষ্ট করে বলবার আগে 'যোগ'-এর সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক।

বিশেষ অধ্যাত্মপথ বুঝোতে 'যোগ' কথাটি উৎপন্ন হয়েছিল সংসারত্যাগী উদাসীন নিরীশ্বর তপস্বীদের মধ্যে। ঋগ্‌বেদে এমন তপস্বী বা সাধক সমাজের উল্লেখ আছে। তারা মানুষের সামাজিক ব্যবহার অনুসরণ করতেন না। দশম মণ্ডলের একটি ঋকে (১৩৬) এঁদের সম্বন্ধে যা উল্লিখিত আছে তা ইতিহাসের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে কথিকাটি এখানে অনুবাদ-সমেত উদ্ধৃত করছি।

কেশী অগ্নিং কেশী বিষং
কেশী বিভর্তি রোদসী।
কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে
কেশীদং জ্যোতির উচ্যতে॥ ১ ॥

'দীর্ঘকেশধারী (তিনি) ভরণ করেন অগ্নিকে, তিনি (ভরণ করেন) বিষ, তিনি ভরণ করেন উর্ধ্বলোক দুটি। দীর্ঘকেশধারী তিনি (শক্তি দেন) বিশ্বকে আলো দেখাতে। দীর্ঘকেশধারীকেই বলা হয় এই জ্যোতিঃ॥'

মুনয়ো বাতরশনা পিশ গা বসতে মলা।
বাতস্যানু ধ্রাজিং যন্তি
যদ্ দেবাসো অবিক্ষত ॥ ২ ॥

'মুনিরা যাদের কটিবন্ধ (অর্থাৎ বসন) বায়ু, যাঁরা গেরুয়া ধুলো গায়ে মাখেন তাঁরা ঝড়ের পিছু পিছু ধাওয়া করেন যখন দেবতারা পড়েন মুশকিলে॥'

উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতাঁ
আ তস্থিমা বয়ম্।
শরীরেদ্ অস্মাকং যূয়ং মর্তাসো
অভি পশ্যথ ॥ ৩ ॥

'মুনিব্রতের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে আমরা ঝড়ের উপর চড়ি। এখন আমাদের দেহ, মানব তোমরা দেখে নাও ॥'

অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা
রূপাণ্য চাকশৎ।
মুনির্দেবদেবস্য সৌকৃত্যায়
সখা হিতঃ ॥ ৪ ॥

'আকাশে ওড়েন, সকল রূপ দেখাতে পারেন। প্রত্যেক দেবতার সৎকাজের জন্যে মুনি লেগে আছেন সখা রূপে ॥'

বাতস্যাশ্বে বায়োঃ সখা
অথো দেবেষিতো মুনিঃ।
উভৌ সমুদ্রাব আ ক্ষেতি
যশ্‌ চ পূর্ব উতাপরঃ ॥ ৫ ॥

ঝড়ের ঘোড়া, বায়ুর সখা মুনি, (তাঁকে) দেবতারা (সর্বদা) চান। তিনি দুটি সমুদ্রেই বাস করেন, যে সমুদ্র পূবের আর যে (সমুদ্র) পশ্চিমের ॥'

অপসরসাং গন্ধর্বানাং
ম গনাং চরণে চরণ্‌।
কেশী কেতস্য বিদ্বান্
সখা স্বাদুর্ মদিন্ তমঃ ॥ ৬ ॥

'অপ্‌সরাদের, গন্ধর্বদের, বনপশুর চরাটে বিচরণ করে কেশী জানবার যা কিছু তা জেনে নিয়ে, কেশী (হয়েছেন) অত্যন্ত আনন্দময় মধুর সখা ॥'

বায়ুর অস্মা উপামন্থৎ
পিনষ্টি স্মা কুনন্নমা।
কেশী বিষস্য পাত্রেণ
যদ্ রুদ্রেণা পিবৎ সহ ॥ ৭ ॥

'এঁকে (বিষ) মন্থন করে এনে দিয়েছিল বায়ু, বেঁটে দিয়েছিল কুন্নমা (তখন), যখন কেশী রুদ্রের সঙ্গে এক পাত্রে বিষ পান করেছিলেন ॥'

কবিতাটির তাৎপর্য অনেক। কোন এক অধ্যাত্ম সাধক সম্প্রদায়ের বিবরণ এতে আছে। 'যোগ বা যোগী' নামটি এর মধ্যে পাওয়া না গেলেও এতে যোগী সম্প্রদায়ের পূর্বইতিহাস সম্বন্ধে কিছু অনুমানের সূত্র পাওয়া যায়। সম্প্রদায়টির নাম করা হয়নি। এঁদের বলা হয়েছে 'মুনি।' এঁদের কর্তা বা গুরু গোসাইকে নাম করা হয়েছে 'কেশী' বলে। 'মুনি' শব্দটির মানে আমরা মোটামুটি জানি। এঁরা ছিলেন সংসারত্যাগী বনবাসী, বাগবত। 'কেশী' শব্দটির মানে দীর্ঘ কেশধারী। মুনিরা সবাই চুল রাখতেন যোগী, সিদ্ধাদের মতো অথবা মাথা মুড়োতেন জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো সে বিষয়ে কিছু বলবার উপায় নাই। সেকালের প্রথাগত ব্যবহারে রাজার বা কর্তার ব্যক্তিগত ভৃত্য-পরিচারক নেড়ামাথা হত। এও সেইরকম ছিল কিনা কে জানে। তা যদি হয় তবে বুঝব চুল রাখতেন শুধু গুরু, চেলারা মাথা মুড়োতেন। তাই গুরুই "কেশী" বলে উল্লিখিত হয়েছেন।

ঋগ্‌বেদের কবিতাটিতে জানতে পারি (২ কখ) যে মুনিরা দিগম্বর থাকতেন, গায়ে গেরুয়া (অথবা রাঙা) ধুলো মাখতেন। এঁরা পান করতেন ভাঙের মতো কোন উগ্র বিষজাতীয় (narcotic) পানীয়। এ পানীয় রুদ্রের সঙ্গে কেশী এক সঙ্গে একপাত্রে চুমুক দিয়ে পান করতেন। কেশী রুদ্রের সমকক্ষ ছিলেন।

কেশীর মাহাত্ম্য দেবতাদের মহিমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দেবতারা মুস্কিলে পড়লে তাঁদের সাহায্য করতে ছুটতেন কেশী, তাঁদের প্রিয় সুহৃৎ (৪. ৫. ৬)। এঁদের শক্তির কাছে কোন বাধাই ছিল না। বলতে পারা যায় যে, সিদ্ধত্বের সব লক্ষণ কেশীর (এবং মুনিদের) ছিল।

কবিতাটি থেকে বোঝা যায় যে এই সম্প্রদায়ে গুরু গোঁসাই শ্রেষ্ঠ দেবতাদেরও উপরে উঠে গেছেন। প্রথম শ্লোকেই তা বলা হয়েছে। এঁদের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান বলে (৩ গ)।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক থেকে অনুমান করা যায় যে এঁরা যাযাবর ছিলেন এবং সর্বত্র এঁদের অবাধ গতি ছিল।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলা ও কোন কোন নব্যভারতীয় আর্য ভাষায় যে শিব মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ মালগুরি ইত্যাদি যোগীসিদ্ধ গুরুদের ছবি পাচ্ছি লোকগীতে ও যোগী-সম্প্রদায়ের গানে, তার ক্ষীণ কিন্তু নিশ্চিত পূর্বাভাস পড়েছে ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে সঙ্কলিত এই কবিতাটিতে। কবিতাটি

ঋগ্‌বেদের প্রাচীনতম কবিতাগুলির সমবয়সী নয় কিছুতেই। তবে এটির রচনাকাল ৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের পরে নয়।

প্রাচীন বৈদিক ধর্মে ছিল দেব উপাসনা। দেবতাকে আহ্বান করে তাঁর উদ্দেশে অগ্নিতে উত্তম খাদ্য ও পেয় আহুতি দিয়ে তাঁকে তুষ্ট করা। দেবতাদের তুষ্টিতে উপাসকের জীবনে বাঞ্ছিত লাভ হত, দুঃখ বিপদ এড়ানো যেত। এ যেন রাজার সঙ্গে দীন প্রজার সম্পর্ক। দেবতাদের প্রতিভূ—একমাত্র অগ্নি। এ ছিল অগ্নিহোত্র (fire cult)।

এই উপাসনার পরের ধাপ হল উপাসকের অন্তরে দেবতার শক্তি আবির্ভাবের কল্পনা। এ-কল্পনা এল সোমযোগের (Soma Cult এর) অনুষঙ্গে। অগ্নিহোত্রীরা দেবতাদের উদ্দেশে যা আহুতি দিতেন তা নিজেরাও খেতেন। সোমযাজীরা সেই সঙ্গে সোমরস আহুতি দিতেন এবং নিজেরাও প্রচুর পান করতেন। (অগ্নিহোত্রের তুলনায় সোমযাগ অনেক দিন ধরে চলত।) এঁদের মুখ দিয়েই বেরিয়ে ছিল প্রথম অনুভূতি মানবের দেবত্ব লাভের পথে।

অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম
অগন্ম জ্যোতির্ অবিদাম দেবান।
কিং নূনম্ অস্মান্ কৃণবদ্ অরাতিঃ
কিম্ উ ধূর্তির্ অমৃতম্ মর্ত্যস্য ॥ ৮. ৪৮. ৩ ॥

'(আমরা) সোমপান করেছি, অমর হয়েছি।
জ্যোতিতে পৌঁছেছি, দেবতাদের খুঁজে পেয়েছি।
ওগো অমর, এখন শত্রুতা আমাদের কী করতে পারে?
কী (করতে পারে) মানুষের বিদ্বেষ?'

বৈদিক গদ্য গ্রন্থাবলীর একাধিক ব্রাহ্মণে একটি অশেষ মূল্যবান উক্তি আছে,—

আত্মসংস্কৃতির বৈ শিল্পানি।
'নিজেরই সংস্কৃতির প্রতিফলন শিল্পসমূহে।'

এই অর্থে কোন জনসমষ্টির অধ্যাত্ম চিন্তা ও সাধনাকে শিল্প বলতে পারি।

তা যদি হয় তবে বলব আমাদের ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম শিল্পে যোগ-যোগী যোগিনী এই ধ্যান ও ধারণার বীজ এসেছিল সুদূর বাইরে থেকে। এশিয়া মাইনরে (এবং মেসোপোটেমিয়ায়) খুব প্রাচীন উপাস্যা দেবী ছিলেন। সে দেবীর উপাসনার ব্যাপার ছিল অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য, আর সে রহস্যের

ভূমিকা ছিল দেবীর যাজক-যাজিকাদের হাতে। এঁদের কার্যক্রমের যে ইঙ্গিত-উদ্দেশ পাওয়া গেছে তাঁর থেকেই আমি উপরে উক্ত অনুমান করেছি। (এখানে বলে রাখা ভালো যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেবীর রূপ কিছু ভিন্ন ভিন্ন ছিল এবং উপাসনাতেও কিছু কিছু ইতরবিশেষ ছিল। আমি তা জড়িয়ে নিয়ে একটা মোট তাৎপর্য খাড়া করে নিয়েছি। এছাড়া উপায় নেই। খৃষ্টপূর্ব সহস্রাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর পশ্চিম এশিয়া মাইনরে ফ্রিজিয়রা বাস করত। (হোমারের ইলিয়দে এই ফ্রিজিয়দের সঙ্গে সমবেত গ্রীক জাতিদের সংঘর্ষই বর্ণিত হয়েছে, ট্রয়-যুদ্ধ রূপে।) ফ্রিজিয়দের ভাষা পৃথক ছিল কিন্তু তাঁদের নিজস্ব কোন বর্ণমালা ছিল না। তাঁরা গ্রীক অক্ষরই ব্যবহার করতেন। আমাদের সংস্কৃত যে গোষ্ঠীর ভাষা গ্রীক ভাষার মতো, ফ্রিজিয় ভাষাও সেই গোষ্ঠীরই অন্তর্গত। এশিয়া মাইনরের এই চিরকালাগত মাতা দেবীকে ফ্রিজিয়রা নিজেদের উপাস্য করে নিয়েছিলেন। এঁকে তাঁরা নিজেদের ভাষায় বলতেন 'গ্‌দান মা,' অর্থাৎ "পৃথিবী-মাতা"। (তুলনীয় ঋগ্‌বেদের এই বহু পুনরুক্ত ছত্র,—"তদ্‌ দ্যৌশ ধত্তাং পৃথিবী চদেবী"।) ইনি বিশ্বমাতা, দেবমাতা তো বটেনই। ভারতবর্ষে আসবার আগে আমাদের আর্যভাষী পূর্বপুরুষ এই দেবীর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। হয়ত কোন কোন দল দেবীর ভক্তও হয়েছিলেন। বৈদিক ধর্মে এ দেবীর উপাসনার কোন স্পর্শ দেখা যায় না। তবে বৈদিক সাহিত্যে ফ্রিজিয় দেবীর কিঞ্চিৎ আভাস পড়েছে বলে মনে হয়। ঋগ্‌বেদে এক দেবী আছেন যিনি দেব-সমাজে বেশ উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিতা কিন্তু তাঁর মূর্তি খুব স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয় নি। ইনি দেবমাতা। মূর্তিতে গোমাতা। নাম অদিতি। অখণ্ডন বা 'অসীম' এই অর্থ ধরে নামটিকে পৃথিবীর নামান্তর মনে করা হয়। কিন্তু ঋগ্‌বেদে স্বতন্ত্র পৃথিবী মাতার উল্লেখ আছে, সে উল্লেখ অদিতির চেয়ে অনেক বেশি। (পৌরাণিক ঐতিহ্যে অদিতি কাশ্যপের ভার্যা এবং দেবতাদের মাতা।) আমার মনে হয় এই অদিতির সঙ্গে এশিয়া মাইনরের মহাদেবী—যিনি দেবমাতা—তাঁর মিল আছে। মহাদেবীর কোন নির্দিষ্ট ভর্তার উল্লেখ নেই। অদিতিরও নেই। 'অদিতি' নামটির একটি মানে 'নির্বান্ধন'। যিনি কোন পুরুষের সহিত পত্নী রূপে বাঁধা নন তিনি অদিতি। এ নাম দুটি দেবতার পক্ষেই খাটে· মহাদেবীর দুরকম প্রকাশ ছিল—দুর্গম গুহামন্দিরের অভ্যন্তরে—অদৃশ্য, আর দুর্গম গুহামন্দিরের দ্বারদেশে

—দূর। (ভক্তকে দূরে থাকতে হত।) অদিতির বেলায়ও এমনি ইঙ্গিত মেলে। তিনি থাকেন তাঁর শালার ("পস্ত্যা") অভ্যন্তরে, কখনো কখনো তাঁর মুখ দেখা যায় গুহাদ্বারে। ঋগ্‌বেদে কবিদের কাছে অদিতি তাঁর এই অপ্রকাশ-রূপ দুটিতে এক বা এক জোড়া নূতন (?) দেবীতে পরিণত হয়েছিলেন। ইনি (বা এঁরা একত্র) হলেন 'অহর' বা দিবারাত্রি। দিবারাত্রি অহর-এর দুই প্রকাশ—অন্ধকার ও আলোকময়, রাত্রি ও দিবা। রাত্রি হল কালো দিন ("অহ্‌শ্চ কৃষ্ণম্"), আর দিবা হল সাদা দিন ("অহর অর্জুনং")। বৈদিক কবি রাতকে ধরেছেন পুরোপুরি আর দিনের বদলে ধরেছেন দিবামুখ উষাকে। ঋগ্‌বেদের কবি গুহাদ্বার থেকে নির্গম্যমান উষাকেই বলেছেন অদিতির বদন ("অদিতির অনীকম্")। একই দেবীর কালো-ধলো রূপ দুটি পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে দুটি পৃথক দেবসত্তায় পরিণত হয়েছে—কালী ও গৌরী। কালী ক্রূর, নিষ্ঠুর। গৌরী শান্ত, মধুর। ঋগ্‌বেদে কিন্তু রাত্রি মোটেই নিষ্ঠুর নন, তিনি রজনীর—শান্তির বিশ্রামের সুনিদ্রার দেবতা, ধরিণী। ঋগ্‌বেদের উষা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছেন দশভুজা দুর্গায়। সেই সঙ্গে মিলে গিয়েছিল তুষার শৃঙ্গ পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—আসলে এশিয়া মাইনরের মহাদেবীর এক রূপ—উমা হৈমবতী। ঋগ্‌বেদে জমাট জলের এই দেবীর কোন উল্লেখ নেই, তবে প্রবহমান জলের দেবীর উল্লেখ আছে, 'গৌরী' বলে। ইনি বাগ্‌দেবীও বটেন, কারুশিল্পীও বটেন (১. ১৬৪. ৪১)। অনেক পরবর্তীকালে পূর্ব ভারতে ইনি মনসা দেবী বলে পূজা পেয়েছেন। দেবী ভারতবর্ষে যেমন মনসা হয়েছিল, ইউরোপে তেমনি হয়েছিলেন Venus। নাম দুটির মূল একই।

অবান্তর কথা ছেড়ে বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। আমাদের ধর্ম সাধনায় ও দর্শনচিন্তায় 'যোগ' শব্দটির বিশেষ যে তাৎপর্য আছে তার সূত্র নির্দেশ করেছি। এই সূত্র ধরে এগোলে আমরা পৌঁছই কালিদাসের আমলে খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীর গোড়ার দিকে। রঘু-বংশীয় ব্যক্তিদের মাহাত্ম্য বর্ণনায় কালিদাস বলেছেন যে, তাঁরা জীবন অন্তেযোগ অবলম্বন করে কায়োৎসর্গ করেন, যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।

এখানে 'যোগ' মানে কী? প্রাণায়াম কুম্ভক করে? না ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে? আমার মনে হয় শেষের অর্থই ঠিক। কেননা অভিজ্ঞান শকুন্তলের ভরতবাক্যে কালিদাস নিজের অন্তিমকালের জন্যে যে প্রার্থনা করেছেন তা সংসার-

বন্ধন টুটে যাবার জন্যেই। যমাপি চ ভবং ক্ষপয়ন্তু নীললোহিতং। ভবকমনই মানবাত্মাকে ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে।

কালিদাসের উক্তিতে যোগের দার্শনিক দিকের পরিচয় রয়েছে। প্র্যাকটি-ক্যাল দিকের আভাস পাই অনেক পরবর্তীকালে লেখা পবনবিজয় স্বরোদয়-এর মতো হটযোগপ্রদীপিকা জাতীয় নিবন্ধে। আসলে, যোগ যাঁরা করতেন সেই যোগীদের ধর্ম ছিল নিরীশ্বর। তাঁদের ধারণায় প্রাণবায়ু স্থির ও চিত্ত অচঞ্চল রাখতে সমর্থ হলেই মানুষ কাল জয় করে অজর-অমর হতে পারে তখন যোগী হন সিদ্ধ অর্থাৎ ঈশ্বর। এঁদের উপাস্য কোন পরমেশ্বর ছিল কি না সে সম্বন্ধে কোন অনুমান করা যায় না। মনে হয় বৌদ্ধদের নির্বাণের মতো জৈনদের অর্হত্বপ্রাপ্তির মতো এই যোগীদের সাধনার চরম উদ্দেশ্য ছিল সিদ্ধি অর্থাৎ সিদ্ধত্ব-প্রাপ্তি। যোগী-সম্প্রদায় বোধ করি বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের চেয়েও প্রাচীন। আগে ঋগ্‌বেদের একটি কবিতায় মুনি-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা আলোচনা করেছি—সিদ্ধ-সম্প্রদায় তাঁদের চেয়েও পুরোনো মনে হয়। ঋগ্‌বেদের পুরুষ সূক্তে "সাধ্য" দেবতার উল্লেখ আছে। (১০. ৯০. ১৬)। এই 'সাধ্য'—দেবতাই কি সিদ্ধ ?

যোগীদের প্রাকৃটিকাল সাধনা ছিল দ্বিমুখী,—প্রাণায়ামে আর ব্রহ্মচর্যে। তন্ত্রের অর্থাৎ যাকে আমরা তন্ত্র-সাধন বলি তার ভিত্তিও এই দুটি। নিরঞ্জননাথ-পন্থী যোগীরা এই সাধনা করতেন অজর-অমর হবার জন্যে। তাঁদের বিশেষ প্রযত্ন ছিল ব্রহ্মচর্য পালনে অর্থাৎ বীর্য-রক্ষায়। তাই তাঁদের সাধনায় নারীর সঙ্গ চলত না। সিদ্ধ হলে পরে অবশ্য নারী সঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল না। কালিদাস মেঘদূতে হিমালয়বাসী যে সিদ্ধদের উল্লেখ করেছেন তাঁরা সহচরীসমেত থাকতেন।

নিরঞ্জননাথপন্থী যোগসাধনা ভারতবর্ষের নিজস্ব চিন্তালব্ধ বলে মনে হয়। আমাদের প্রাচীন ধর্মমত জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তার সঙ্গে—বিশেষ করে জৈন চিন্তার সঙ্গে নাথপন্থী যোগীমতের বেশ মিল আছে। তবে পরে আরও একটা যোগী-মত বাইরে থেকে এসে আমাদের প্রাচীন যোগ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই যুগ্ম যোগীমতের শৃঙ্খল ছিলেন শিব। আমাদের শাস্ত্রে—পুরাণে শিব পরমেশ্বর, অথচ যোগী। কিন্তু তিনি কোন্ আরো বড় দেবতার একনিষ্ঠ সাধক বা যোগী ? এ প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না আমাদের মিথলজিতে। এর উত্তর খুঁজতে গেলে দৌড়তে হবে দু সহস্রাব্দীরও বেশি কাল পেরিয়ে

আনাতোলিয়ার, পশ্চিম এশিয়া মাইনরে মেসোপোটেমিয়ার। সেখানকার মহা মাতৃদেবী ও তাঁর সহচর-সচিব (—প্রধান কর্মকর, যোগিন্—) এখানকার মহাদেবী ও শিবের সঙ্গে মিলে গিয়ে যে যুক্ত মিথলজির সূত্রপাত করেছিল তার সবচেয়ে পুরোনো বিবরণ কিঞ্চিৎ পাই কালিদাসের কুমারসম্ভবে। পরে কোন কোন পুরাণে এই কাহিনীর নানা রকম তাঁত বোনা হয়েছে। সে কথা কিছু কিছু অন্যত্র বলেছি।

গৌরী-পার্বতীর সঙ্গে যোগী শিবের যোগাযোগ হবার পরে আমরা যাকে তন্ত্রসাধনা বলি তার গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই সাধনার লক্ষ্য পূর্বতন যোগসাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে অমরত্বের চিন্তা তেমন নেই, আছে অজরত্বের চেষ্টা। সে হল সকল ইন্দ্রিয়ের যা কিছু ভোগ তা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা, কিন্তু তার ফলে মানুষের দেহে মনে যে প্রতিক্রিয়া ও বিকার উৎপন্ন হয় তা এড়ানো। সে জন্যে চাই দেবতার শক্তি। দেবতা হয়ে গিয়ে দেবতাকে ভোগ করা হল এই সাধনার উদ্দেশ্য। পূর্বতন যোগ-সাধনার উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্ম হওয়া, পরবর্তী কালের অর্থাৎ নির্বাণের মতো অবস্থা পাওয়া। তান্ত্রিক প্রয়োগ-সাধনার উদ্দেশ্য হয়েছিল নিজ দেহে দেবতার শক্তি সঞ্চার করা, দেবীর সখা দেব হওয়া ; আমাদের দেশের নিজস্ব (?) ঐতিহ্যে—কেন উপনিষদের উমা হৈমবতী ও ইন্দ্রের সংলাপে—শিবই বড়, ব্রহ্ম ; দেবী—তাঁর অনুচরী, ব্যাখ্যাতা। পরবর্তীকালে তান্ত্রিক-সাধনার ঐতিহ্যে শেষ পর্যন্ত -কালীমূর্তিতে- দেবীই বড়, শিব তাঁর পদতলে শব। এ ধারণা বাইরে থেকে এসেছে পরবর্তীকালে।

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থে শিবের প্রাচীন মহিমা খর্ব হয় নি। এ গ্রন্থ—আগমই হোক, আর পটলই হোক—(আগম মানে যা শিবের মুখ থেকে এসেছে, আর পটল মানে শিবের অথবা তৎস্থানীয় ভৈরবের নির্দেশিত প্রক্রিয়া-উপদেশ সংহিতা) শিব-উৎসাগত। ('আগম' বোঝায় তন্ত্রশাস্ত্র। শব্দটি 'নিগম' শব্দের বিপরীতে) পরিকল্পিত। 'নিগম' মানে বেদসংহিতা। যা ব্রহ্মার অথবা ঋষিদের মুখ থেকে অপৌরুষেয়ভাবে নির্গত হয়েছিল। 'আগম' মানে যা এসেছে কোন পুরুষ-বিশেষের মুখ থেকে। নিগম অপৌরুষেয়, আগম পৌরুষেয়।)

যোগী শিব কোন দেবতার উপাসক-সাধক ছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় গোরখনাথের কাহিনীতে। শিব, মচ্ছন্দর, গোরখ—এঁরা ছিলেন মহাদেবীর আশ্রমে তাঁর সেবক। এই সেবকদের মধ্যে শিব ছিলেন প্রধান। তিনি মহাদেবীর অনুগ্রহ সর্ব প্রথম লাভ করে তাঁর সহচর হতে পেরেছিলেন।

মহাদেবীর ইচ্ছা ছিল অপর সেবক দুজনও শিবের পথ অনুসরণ করেন। মচ্ছন্দর ও গোরখ দেবীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাই তাঁরা দেবীর আশ্রয় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

[নাথপন্থীদের কাহিনীতে শিব ছাড়া প্রধানত চার সিদ্ধার নাম পাওয়া যায়। মচ্ছন্দর (মৎস্যেন্দ্র), গোরখ, জালন্ধরি ও শিশু (কাহ্ন)। আসলে এঁরা দুজনই, চারজন নন। মৎস্যেন্দ্র = জালন্ধরি; গোরক্ষ মানে গোপাল = শিশু (সেই সূত্রে কৃষ্ণলীলা থেকে এসেছে কৃষ্ণনাম)। গল্পটির মধ্যে সুপ্রাচীন মিথ ও যোগী-মতের রূপক সূক্ষ্মভাবে মিশিয়ে আছে।]

পাদটীকা

১। এই শ্লোকটি এক মুনির উক্তি।

———

লঙ্কাহ্রদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে-কামিনী ?

মাইকেলের কবিতার ছত্রের প্রথম শব্দটি বদলে দিয়ে এই প্রবন্ধের নাম করলুম। কেন যে করলুম তা প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে বোঝা যাবে। প্রশ্ন চিহ্নেরও তাৎপর্য উপলব্ধ হবে।

চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানের ক্লাইম্যাক্স জাগরণ অংশে মুকুন্দ দেবী চণ্ডীকে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। ধনপতি বাণিজ্য করতে সিংহলে চলেছেন। বাড়ি থেকে বেরোবার মুখেই তিনি দেবীকে অপমান করেছিলেন তাঁর পূজোর ঘট পায়ে ঠেলে ফেলে। দেবীও পথে ঝড়বৃষ্টি করিয়ে বান ডাকিয়ে তাঁর বাণিজ্যতরী ডুবিয়ে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন। তবুও ধনপতি সে সব ক্ষতি গ্রাহ্য না করে সিংহলের দিকে চলেছিলেন। সেতুবন্ধ পিছনে রেখে ধনপতির নৌকা লঙ্কার পরিসরে পৌঁছল সংকীর্ণ জলপথ (ছাড়খাল) সাঁতাকুলি দিয়ে। লঙ্কার মরালে যক্ষরাজার দেশে চন্দ্রচূড় পর্বত পেরিয়ে পৌঁছল অকূল সাগরে। তার মধ্যে কালিদহ। কালিদহে দেবী অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়ে ধনপতিকে ছলনা করলেন। সমুদ্রের বক্ষে পদ্মবন। তাতে বসে আছে এক ষোড়শী সুন্দরী এক হাতে একটা হাতি ধরে। নারী সে হাতিকে একবার গিলে ফেলে পরক্ষণেই উগরে ফেলছেন। ধনপতিকে দেখে মোহিনী নারী তাঁর উপর কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করলেন। ধনপতি মোহমুগ্ধ হলেন। ধনপতি তাঁর মাঝিমাল্লাদের বললেন, তোমরা দেখলে তো ? তারা বললে, আমরা কিছুই দেখলাম না, শুধু চারদিকে জল থই থই করছে। তখন ধনপতি নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করলেন। ইতিমধ্যে দৃশ্যটি অদৃশ্য হয়েছে। তারপর যথাসময়ে ধনপতির নৌকা সিংহলের রত্নমালা শহরের ঘাটে এসে লাগল। ধনপতি সিংহলে পৌঁছলেন। রাজার সঙ্গে তাঁর জিনিসপত্র বদলের কাজ ভালোভাবেই হল। কথায় কথায় তিনি রাজাকে কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দৃশ্যের কথা বলে ফেললেন। রাজা সে দৃশ্য দেখতে চাইলে ধনপতি দেখাতে পারলেন না। উৎকট রকমের মিথ্যাবাদী বলে রাজা ধনপতি সওদা মাল সব বাজেয়াপ্ত করলেন। সওদাগরের বারো বছরের কারাবাস হল। এই বারো বছরের মধ্যে ধনপতির ছেলে শ্রীপতি বড়ো হয়েছে আর সেও নৌকা সাজিয়ে সিংহলের দিকে রওনা হয়েছে বাবার খোঁজে ব্যবসা উপলক্ষ্য করে। যথাসম্ভব

নির্বিঘ্নে সে পৌঁছল লঙ্কার মশানে। বাপের মতো সেও কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দৃশ্যের ফাঁদে পড়ল। রাজাকে দেখাব বলে সে দেখাতে পারল না বাপেরই মতো। ছেলেমানুষ মিথ্যাবাদীর উপর রাজা ক্ষেপে গেলেন। তার মাল সব বাজেয়াপ্ত তো হলই, তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। দেবী অভয়া চণ্ডী তার বৃদ্ধা পিতামহী সেজে এসে রাজার কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। ব্যর্থ হয়ে নিজের পিশাচ সৈন্য জড়ো করে রাজাকে পরাস্ত করলেন। শ্রীপতি পিতাকে কারাগার থেকে উদ্ধার করলে। তার হাতে রাজা কন্যা সমর্পণ করলেন। পিতা ও পত্নী সমভিব্যাহারে শ্রীপতি দেশে মায়ের কাছে ফিরে এল।

মুকুন্দ কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতাকে অভয়া চণ্ডীর সঙ্গে এক করে দেখেছেন, কেননা তিনি সেইরকমই গল্পে পেয়েছিলেন। কিন্তু এ ধারণা যে ভুল তা তাঁর লেখা থেকেই বোঝা যায়। ধনপতির বেলায় কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার আচরণের তবু কিছু ব্যাখ্যা করা যায়। সওদাগরকে ভোলাবার উদ্দেশ্য তাকে অপদস্থ করা হতে পারে। কিন্তু শ্রীপতিকে ভোলাবার উদ্দেশ্য কী? তা যে-দেবী অপদস্থ করলেন সে দেবী তো তাকে উদ্ধার করলেন না। কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার সঙ্গে বুড়ী অভয়া চণ্ডীর কোন দিকেই তো কোন মিল নেই। কমলে-কামিনী-কুঞ্জর হলেন মোহিনী দেবতা শ্রীমতী। শ্রীর প্রতীক পদ্ম তাঁর আলয়। ফাঁদ পাতা ওঁর পুরুষের জন্যেই। এ দেবতার চরিত্র যে চণ্ডীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তা মুকুন্দের বর্ণনা থেকে ধরতে পারা যায়। ধনপতি (এবং পরে শ্রীপতি) যে দৃশ্য দেখেছিলেন তার বর্ণনা করছেন নাবিকদের কাছে,—

শুনরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি
কহিব রাজার আগে সভে হইয়ো সাক্ষী।
প্রমাণিক যোজন গভীর বহে জল
ইথে উপজিল তাই কেমতে কমল।
পবন জিনিঞা অতি বেগে বহে নীর
ইহাতে অবলা জন কেমনে হয় স্থির!…
নিবাস পদ্মিনী তথি ধরিয়া কুঞ্জর
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর!…
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ।…

অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন
পঞ্চম গায় অলি নাচে শিকগণ।…
তার মাঝে বিকশিত কমল কানন
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ।
উগারিয়া মত্ত করী ধরে বাম করে
ঈষৎ হাসিয়া পুন চৌদিগ নেহালে।
ক্ষণে ক্ষণে হাসে বামা নাচে ভুজ তুলি
পঞ্চম গায় রাগ-রাগিণী মেলি।
রবাব মারজ ডমরু করয়ে বাদন
অঙ্গভঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ।…
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত
হেন বুঝি মোরে কিবা বিধি বিড়ম্বিত।
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ॥

পুষ্টি কান্তি ও সৌন্দর্যের দেবতা রূপে শ্রী ও সীতা (ভূমিতে লাঙলের দাগ) ঋগ্‌বেদের কালেই বন্দিত হতে শুরু হয়েছিল এবং তা অচিরে দেবশরীর লাভ করেছিল। সীতা রাম-কথায় পরে জুড়ে গিয়েছিল। সেই সূত্রে লাঙলের সঙ্গেও যোগাযোগ। মুকুন্দের বর্ণনায় যে লঙ্কার মরালে সংকীর্ণ স্রোতপথ সীতাকুলির উল্লেখ আছে মনে হয় তা শ্রী-দেবতারই সম্পর্কিত। রামায়ণ কাহিনীতে সমুদ্র বন্ধন করা হয়েছিল. কোন খালের উল্লেখের কোন সম্ভাবনাই নেই সেখানে।

যাই হোক মুকুন্দ বর্ণিত কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার সঙ্গে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী অথবা রক্ষয়িত্রী দেবীর কোন সম্পর্ক আছে কিনা দেখা যাক। পুরানো পালি সাহিত্যে পাই যে সিংহল দেশ আগে যক্ষ রাজার অধিকারে ছিল। (রাবণও যক্ষ ছিলেন।) যক্ষ রাজার দুহিতা কুকুর সেজে সিংহলে নবাগত বিজয় সিংহ ও তাঁর অনুচরদের ভোলাতে চেষ্টা করেছিল। মহাবংশের এই কাহিনীতে সিংহল লঙ্কার মোহিনী যক্ষিণীর গল্পসূত্রের টুকরো পাওয়া যায়। কিন্তু তা ওই পর্যন্তই।

জলমধ্যে পদ্মাসীনা সালঙ্কৃতা নারীমূর্তি, তার মাথায় হাতি জল ঢালছে, এমন ছবি বৌদ্ধ স্থাপত্যে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় দু হাজার বছর আগে থেকে। সাঁচীর স্তূপের একটি তোরণের শীর্ষে এই মূর্তি খোদাই আছে। এই ধরনের

বৃহত্তম মূর্তি রয়েছে ইলোরার কৈলাস মন্দিরে। এই দেবী পরে গজলক্ষ্মী নামে পূজা পেয়েছেন। গজলক্ষ্মী মূর্তি কমলে-কামিনী-কুঞ্জরে মূর্তির শোভন সংস্করণ, তবে কমলে-কামিনী-কুঞ্জর মূর্তি অশোভন সংস্করণ নয়। কেন তা পরে বোঝা যাবে।

লঙ্কার প্রহরী (বা অধিষ্ঠাত্রী) রূপে দেবী বা দানবী (যক্ষিণী রাক্ষসী) প্রায় সব রাম-কথায় কোন না কোনভাবে উল্লিখিত আছে। অভিনন্দের রামচরিতে (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী) ইনি দেবী চণ্ডীর সঙ্গে একীভূত হ'য়ে গেছেন। আশ্চর্যের বিষয় দেবীর কীর্তি প্রসঙ্গে অভিনন্দ দেবীর গজদলন ব্যাপারের ইঙ্গিত করেছেন।

অভিনন্দ বলেছেন যে, হনুমানকে সমুদ্র লঙ্ঘন করতে বাধা দিয়েছিলেন দেবমাতা সরমা (বা সুরমা)।[১] অগত্যা হনুমান তাঁকে স্তবস্তুতি করে প্রসন্ন করেছিলেন। স্তবে দেবীর দুটি শত্রুদমন কাহিনীর উল্লেখ আছে—গজাসুরের গ্রাস আর মহিষাসুরের বিনাশ—

জগ্রসে গজতনুর্ দনুসূনুর্
গাঢ়নতবপুষা বপুষা তে।
অব্‌কোশমমৃদুনা মহিষঃ প্রাক
চুক্ষুদে স চ রণে চরণেন ॥

—'গজদেহধারী দৈত্যপুত্র গোটাগুটি গাঢ় নত দেহ তোমার গরাস হয়েছিল। আগেই মহিষ (-অসুর) যুদ্ধে তোমার পদ্মকেশর কোমল চরণে চূর্ণ হয়েছিল॥'

তলিয়ে দেখলে অভিনন্দের বর্ণনা কামিনী-কুঞ্জরে খাটে না। দেবীর যে বর্ণনা এখানে—গাঢ়নত বপু—তা খাটে যদি দেবীকে সর্প কূর্ম অথবা কুম্ভীর কল্পনা করি। গজকচ্ছপ অথবা গজকুম্ভীরের দ্বন্দ্ব অনেক পৌরাণিক আখ্যানে উল্লিখিত আছে। এখানে তেমনি একটি ব্যাপার হওয়া সম্ভব, যেখানে দেবীর শত্রু গজাকৃতি আর দেবী কুম্ভীরাকৃতি অথবা সর্পাকৃতি। লঙ্কার রক্ষয়িত্রীর পক্ষে এ ব্যাপার খুবই সম্ভব।

আরও একটা কথা। মুকুন্দর দেবতা হাতি নিয়ে খেলা করছেন, তাকে দমন করছেন না। প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পে হাতিকে দেখেছি দেবীকে অভিষেক করতে। দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে স্থাপত্য শিল্পে দেখছি জল-ও সর্পদেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন এবং গজারূঢ়। মনসামঙ্গলে দেবীর বাহন

("রথ") হল ধামাই (অর্থাৎ ঢেমনা সাপ)। (হাতি ও সাপ দুই-ই "নাগ" সুতরাং সমান) ধামাই মনসার সহায়ও বটে। এখানে অর্থাৎ মুকুন্দর কাহিনীতে নাগ যে ক্রীড়াবস্তু হবে তাতে আর বৈচিত্র্য কী? হয়ত এখানে হাতি আসলে সাপই ছিল। হাতি গেলা ও উগরে ফেলার চেয়ে সাপ গেলা ও উগরে ফেলা অনেক সহজ ও সরল প্রক্রিয়া। এখান স্মরণ করতে পারি কোন কোন রূপকথার নায়িকা রাজকন্যার মুখ দিয়ে সাপ বেরোনোর কথা। এমন রাজকন্যা সাধারণত জলাশয়বাসিনী হতেন। অবশ্য হাতি গেলা ব্যাপারকে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। এ ব্যাপার অত্যন্ত অবিশ্বাস্য, তাই মুকুন্দ গল্পটির যে রূপ পেয়েছিলেন তাতে সাপের পরিবর্তে হাতি ছিল। (একদা কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে এ ব্যাপারের একটু নতুন রকম ব্যাখ্যা শুনেছিলুম। তাঁদের মতে এখানে হাতি গেলা মানে হাতিকে দিয়ে "গিলা" অর্থাৎ অভিষিক্ত হওয়া। হিন্দী ধাতুর সাহায্যে ব্যাখ্যাটিকে খাড়া করা যায় বটে তবে গ্রহণ করা যায় না। বাংলায় ধাতুটি আছে 'গেলা" রূপে। গলার বস্তু নরম। তরলতা,-তরলতাপ্রাপ্ত, আর্দ্রতাপ্রাপ্তও বলা যেতে পারে। কিন্তু স্নান বা অভিষেক পর্যন্ত টেনে আনা চলে না)।

দুই

সমুদ্রের উপরে পদ্মদ্বীপ। এর সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা যাক। আমাদের দেশে যোগী-যোগিনীদের ট্র্যাডিশনে তাঁদের মূলপীঠ "সাগর মধ্যে লোহার গড়" উল্লিখিত আছে। (সেকশুভোদয়ায় উদ্ধৃত যোগিনীদের গান দ্রষ্টব্য।) এমন লোহার গড়ের আভাস উল্লেখ ঋগ্‌বেদে আছে জলদেবী সরস্বতীর সম্পর্কে।

সরস্বতী ধরুণম্ আয়সী পূঃ ॥ (৭-৯৫-১)
— 'সরস্বতী (যেন) লৌহ দুর্গের সমাশ্রয়।'

ইঙ্গিতটির অর্থ দুদিক দিয়ে বোঝা যায়। এক, সরস্বতী বাস করেন লোহার গড়ে। দুই, সরস্বতী পুষ্টির ও সমৃদ্ধির দেবতা, ভক্তের অভয় দুর্গ।

কমল-কামিনী-বৃত্তের দেবতার লোহার গড় ছিল বলে উল্লেখ নেই। থাকলেও ঋগ্‌বেদে পদ্মফুলের উল্লেখ নেই। তা ছিল পদ্মবনের অভ্যন্তরে।

বৈদিক পরবর্তীকালে পদ্মের উল্লেখ প্রচুর আছে। পদ্ম কালটের আমদানী হয়েছিল বাইরে থেকে। সেই কালটের প্রভাব এদেশের সংস্কৃতিতে গোড়া থেকেই গেড়ে বসেছিল।

আপাতত কমলে-কামিনী-কুঞ্জরের ধাঁধা করতে পদ্মের সন্ধানে এগোবার প্রয়োজন নেই।

ভারতীয় আর্যভাষীদের এক দূর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাসে এক দেবীর বর্ণনা মিলেছে যিনি অনেকটাই মুকুন্দর বর্ণিত কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার অনুরূপ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে রোমান লেখক তাকিতুস্ (Tacitus) জর্মান জাতিগোষ্ঠীগুলির ইতিহাস লিখেছিলেন। জর্মানদের সম্বন্ধে এখানেই প্রথম ও বিশদ খবর কিছু পাই। বইটির নাম সংক্ষেপে গের্মানিয়া (Germania)। বইটি লেখবার সময়ে তাকিতুস পশ্চিম জর্মানিতে বাস করছিলেন। বইটিতে লেখক জর্মানদের কয়েকটি গোষ্ঠীর উপাসিত এক দেবীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে মুকুন্দ-বর্ণিত দেবীর বেশ মিল আছে। তাকিতুসের বর্ণনার মর্ম দিচ্ছি।

'রেনডিডিঙ্গি (Rendidingi) বা রেনডিডিগনি (Rendidigni), আবিওনেস (Avionds), আঙ্গিলি (Angili), বারিনি (Varini), এউদোসেস (Eudoses), স্বাবিনিস (Suavinis) আর মুইতোনেস (Nuitones)— এই দলগুলি যে সব অঞ্চলে বাস করে তা জঙ্গলময় ও নদীপ্লাবিত। গোষ্ঠী হিসেবে এ দলগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বলবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু এইমাত্র যে এরা সবাই পৃথিবী-মাতা নের্থুসের (Nerthus) উপাসক। এদের ধারণায় দেবী মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ইনি মানুষের শহরে শোভাযাত্রা করে সফর করেন। এঁর মূল অধিষ্ঠান সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে। সেখানে আছে মনোরম কুঞ্জবন। তার মধ্যে আছে ওঁর দিব্য রথ বিচিত্র বসনে আবৃত। দেবীর অনুগ্রহভাজন পূজক (বা পুরোহিত) আছেন একটিমাত্র। তিনিই সে পবিত্র রথ স্পর্শ করতে পারেন। পূজক দেবীকে দেখতে পান না, শুধু অনুভবে বুঝতে পারেন দেবীর উপস্থিতি। দেবীর রথ টানে গোরুতে। রথের পিছু পিছু পূজক চলেন পরম ভক্তিভরে নত হয়ে। তারপরে কয়েকদিন ধরে সবাই মিলে আনন্দ উৎসব করে। সর্বত্র কাজের ছুটি। দেবীর পছন্দমত যত খুশি লোকের অভ্যর্থনা ও পূজা তিনি গ্রহণ করেন। লোকে তখন যুদ্ধ করে না, অস্ত্রশস্ত্র ধারণও করে না। প্রত্যেক যুদ্ধাস্ত্র সরিয়ে রাখা হয়। তখনই সর্বত্র শান্তি

ও স্বস্তি বিরাজ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পূজক দেবীকে তাঁর কুঞ্জবনে ফিরিয়ে নিয়ে না যান। ইতিমধ্যে দেবী মানুষের সঙ্গে থেকে তাদের পূজা পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছেন। তারপর, যদি আপনারা বিশ্বাস করতে রাজি হন, সেই রথ, রথের আবরণ বস্ত্র ও দেবী স্বয়ং একটি নির্জন হ্রদে ধৌত ও স্নাত হন। এ কাজে হাত লাগায় ক্রীতদাসেরা। তারপর তখনি তারা এই হ্রদের জলে ডুবে মরে। এইমত এই ব্যাপারে এমন ধর্মশীলতার সঙ্গে অজ্ঞান ও অদ্ভুত মোহ জড়িয়ে আছে যে দেবীর সম্বন্ধে কোন রকম স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়,—যে দেবীকে নয়নগোচর করলেই মানুষের জীবনান্ত হয়।

তাকিতুসের বর্ণিত নের্থুস দেবীর সঙ্গে মুকুন্দ-বর্ণিত কমলে-কামিনী দেবীর খানিকটা মিল সহজেই নজরে পড়ে। দুই দেবীরই বাস সমুদ্রগর্ভে নির্জন দ্বীপে কুঞ্জবনের মধ্যে। দুজনেই নৃত্যগীত কৌতুক ভালোবাসেন। নের্থুস শহরে এসে মানুষের মধ্যে তা উপভোগ করেন আর কমলে-কামিনী নিজের পদ্মবনে নিকুঞ্জেই। তফাৎ রয়েছে, পদ্মবনে ও হাতিতে। তাকিতুসের কুঞ্জবন আর মুকুন্দর পদ্মবন প্রায়ই একই ব্যাপার। তাকিতুসের রথ হয়ত মুকুন্দের গল্পের বীজে দেবীর ক্রীড়নক ছিল না, বাহন ছিল। এই দিক দিয়ে এখানেও একরকম মিল পাওয়া গেল। আগে আমি বলেছি হয়ত হাতি আসলে ছিল সাপ-অর্থে নাগ। এখন বোধ হচ্ছে, হাতির ব্যাখ্যায় নাগ-সাপ ধরবার আবশ্যকতা নেই। দেবী হলেন স্রোতময়ী জলদেবতা। তাঁর পক্ষে হাতিকে নাকানি-চোবানি খাওয়ানো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পৌরাণিক জাহ্নবীও ঐরাবতকে এইরকম দুর্গতি দিয়েছিলেন। জলদেবীর বাহন মকর সাপ-হাতি নাগেরই মতো।

আর একটি মিল রয়েছে—দেবীদর্শনের ফলে। নের্থুসের পূজক তাঁর দিকে তাকাতেন না, তাকাতো ক্রীতদাসেরা যারা উৎসবরাতে ধোওয়া-পাখলার কাজ করত। তাদের প্রাণান্ত হত। মুকুন্দর কাহিনীতে ধনপতি-শ্রীপতির অবস্থা নের্থুসের ক্রীতদাসদের মতোই। দেবীকে তারা চাক্ষুষ করেছিল, তাই তারা প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে না।

মুকুন্দ দেবীর নাম জেননি, চণ্ডীর রূপান্তর বলেই চালিয়েছেন। জর্মনদের দেবীর নাম নের্থুস্। বৈদিক সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ নামটি হয় নৃতুস্। মূল

অর্থাৎ প্রত্ন-ইন্দোইউরোপীয় ভাষায়ও তাই হবে। অর্থ, 'বীরনারী', 'নৃত্যকারিণী'। বাংলার তান্ত্রিক সহজিয়াদের মধ্যে দেবী বাশুলীর পরিচারিকার নাম নিত্যা। (যেমন, "নিত্যার আদেশে বাশুলী চলিল সহজ জানাবার তরে")। মনসামঙ্গল কাব্যের উপাখ্যানে মনসার সখী ও পরিচারিকার নাম নেতো। মনে হয় এই নাম দুটি—নিত্যা ও নোতো—জার্মানদের দেবী নের্থুসের নামের সঙ্গে অভিন্ন। বৈদিক 'নৃত্' শব্দ সংস্কৃতে নেই। তাই তার স্থানে তখনকার চলিত কথায় ছিল নৃত্য (তুলনীয় নৃত্যকালী)। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের দেবী সরস্বতীর ভূমিকাও স্মরণীয়। ইনি নৃত্য-গীতবাদ্যের অধিদেবতা। তবে 'নিত্যা' নামটির প্রসঙ্গে এটাও বলতে হয় যে দেবী চণ্ডী বা ধরিত্রীর পক্ষে নামটির সহজতর ব্যাখ্যা অর্থাৎ চিরন্তন—এই অর্থ সমানভাবে উপযোগী।

তিন

এখন প্রশ্ন জাগে তাকিতুসের ও মুকুন্দর দেবীবর্ণনার মধ্যে যে মিল তা কি আকস্মিক ঘটন-জোটনা, না কোন এক প্রাচীন মূল থেকে আগত? মিল যে পরিমাণে গভীর তাতে তা যে আগাগোড়া আকস্মিক তা বলা চলে না। এক মূল থেকে যদি এসে থাকে তা তাহলে সে মূল সম্পত্তি ছিল না। জর্মান আর ভারতীয় এই দুটি শাখায় শুধু এ দেবতার দর্শন মিলছে আর কোন শাখায় নয়। ভারতীয় শাখায় যদি ঋগ্‌বেদে মিলত তবে অনুমান করা তেমন যেতে পারত। কিন্তু ঋগবেদের অন্তত হাজার বছর পরে কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার দেখা মিলছে স্থাপত্য শিল্পে—সাহিত্যে নয়। সাহিত্যে পাই আরও হাজার খানেক বছর পরে। সুতরাং বলতেই হয় যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে এ দেবী বহিরাগত। জর্মানদের বেলায়ও অনুরূপ কল্পনা করা যায়।

ঋগ্‌বেদে পদ্মের নাম নেই, অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যেও নেই—শুধু একবার পদ্মের রঙ (?) বোঝাতে "পদ্মঃ" শব্দ। পদ্ম ভারতবর্ষের ফুল সন্দেহ নেই, তবে ভারতবর্ষের একচেটে নয়। মধ্যপ্রাচ্যে, মিশরে ও ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তে পদ্ম খুবই পরিচিত ফুল ছিল। মিশরে পদ্মফুল রীতিমত কাল্‌ট বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এশিরিয়ায় পদ্মফুলের আধ্যাত্মিক মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল। দেবীর যে স্বভাব—হাসিখুশি স্ফূর্তি করা ও মানুষকে

শস্য-সম্পদ দান করা এবং বংশবৃদ্ধি করা তাও মধ্যপ্রাচ্যে ও এশিয়ামাইনরে অনেক জাতির মধ্যে অনেকরূপে অনেক নামে প্রচলিত ছিল। (এঁরা কেউ কেউ আমাদের দেশে এসেছেন, অন্যত্রও গিয়েছেন। তার প্রমাণ আছে।) কমলে-কামিনী দেবীও মনে হয়, এসিরিয়া-এশিয়া মাইনর থেকে ফিনিশীয় বণিক ও রোমান নাবিকদের মারফৎ এদেশে আনীত হয়েছিলেন। রোমানদের এমন কারবারের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। রোম সাম্রাজ্যের শেষের দিকে রোম-নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছিল। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো ইনিও সাংসারিক ও সামাজিক কল্যাণের দেবতা। এঁর নাম হয়েছিল 'রোমা,' অর্থাৎ রোমের দেবী। আমাদের দেশেও এই দেবীরও এই নামের প্রচার কিছু হয়েছিল বলে মনে হয়। লক্ষ্মী 'রমা' নামটি 'রোমা' থেকে আগত মনে করা ছাড়া অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। নামটির 'লক্ষ্মী' অর্থের ব্যবহার মিলছে অর্বাচীন সংস্কৃতে—ভর্তৃহরি-শঙ্করাচার্যের কবিতায় ও ভাগবত পুরাণে।

একদা বিদেশাগত দুটি কাহিনীকে মুকুন্দ চণ্ডীমঙ্গলে গেঁথেছেন। কাহিনীর মূলভাণ্ডার নির্দেশ করেছেন "ভৃগুবংশ" বলে। জানি না এই নামে—"হরিবংশ"-এর মতো কোন গল্পকাহিনীর সঙ্কলন ছিল কিনা। তবে ভৃগু নামটি থেকে সন্দেহ হয় এসব গল্প যে আসলে ফ্রীজিয়দের ছিল সে স্মৃতি ক্ষীণ হলেও তখনো একেবারে লুপ্ত হয়নি। মনে হয় বিষ্ণুর কীর্তি যেমন হরিবংশে গাঁথা হয়েছিল দেবীর কীর্তি তেমনি ভৃগুবংশে। এখানে বলে দিই যে এ নাম দুটিতে বংশ শব্দের অর্থ সন্তানপরম্পরা নয়,—বংশীধ্বনি অর্থাৎ কীর্তি-গাথা। কালিদাসও এই অর্থে 'রঘুবংশ' নাম দিয়েছিলেন। (আমার এই উক্তিতে যিনি তর্ক তুলবেন তাঁকে বলি যে, কালিদাসের কাব্যের বংশকর্তা রঘু নয়, দিলীপ।)

পাদটীকা

১। সরমা দেবশুনী। মহাবংশে সিংহলের যক্ষরাজ কন্যা কুকুরীর রূপ ধরে বিজয় সিংহকে ভোলাতে এসেছিল। নামটি আসলে হওয়া সম্ভব। সুরমা=পাতালগঙ্গা। বিদ্যাপতির 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণীতে' সুরসা জলদেবী ও সর্পদেবী মনসার প্রাচীন নাম।

মহাদেবী নিত্যা

চণ্ডীদাসের ভনিতায় একটি সহজ সাধনা ঘটিত পদের আরম্ভ হয়েছে এই বলে,—"নিত্যার আদেশে বাশুলী চলিল সহজ জানাবার তরে।"

কে এই নিত্যা যাঁর আদেশে মহাদেবী বাশুলী—ষোড়শী চণ্ডী—চণ্ডীদাসকে সহজ সাধনার দীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন?

এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মনে জেগেছিল এবং তাঁরা কেউ কেউ মনে মনে প্রশ্নের উত্তরও পেয়েছিলেন কিন্তু কিছুই বলেননি অর্থাৎ লেখেননি এ বিষয়ে। অনুমান করি তাঁরা বাশুলী দেবীকে মনসার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে নিত্যাকে মনসার সহচরী-অভিভাবক নেতা বলে ঠিক করেছিলেন।

কিন্তু তা ঠিক নয়। বাশুলী আর মনসা দু দেবী উৎপত্তিতে হয়ত অভিন্ন ছিলেন কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁরা বিভিন্ন দেবীতে পরিণত হয়েছিলেন। এবং তাঁরা আর কোন দেবীর শাসনাধীনে ছিলেন না।

তবে মনসা-কাহিনীর নেতা (নেতো) আসলে যে নিত্যা দেবী হতে পারেন তার ইঙ্গিত কাহিনীর মধ্যেই রয়েছে। কাহিনীতে নেতা মর্যাদায় মনসার চেয়ে খাটো বটে কিন্তু ক্ষমতায় সে প্রধান। মনসার চালচলন নেতার উপদেশ অনুসারে। কাহিনীতে নেতার যে চরিত্র তা মূল দেবীর আদল থেকে অনেকটাই ভ্রষ্ট হয়েছে। তার কারণ বলছি।

মনসা-কাহিনী বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁদের ঐতিহ্যে মনসা-কাহিনী রামায়ণ মহাভারতের চেয়েও পুরোনো। এঁদের মতে মনসার কাহিনী সত্যযুগের ঘটনা, যেমন রামায়ণ ত্রেতা যুগের এবং মহাভারত দ্বাপর যুগের। যোগী সম্প্রদায়ের মতে চাঁদ সদাগরের উপাখ্যান সত্যযুগের মহাকাব্য। (মদীয় Vipradasa's Manasamangal, Asiatic Society, Calcutta, Introduction দ্রষ্টব্য।) কাহিনীটির বীজ খুব পুরোনো বলে মনে হয়। মৃত পতির দেহ নিয়ে যমপুরীতে (স্বর্গপুরীতে) যাত্রা ভারতীয় সাহিত্যের ট্র্যাডিশনের পক্ষে অভিনব এবং বিদেশিগন্ধী বলে মনে হয়।

সে যাই হোক, যোগীদের ঐতিহ্যে মনসার বিশেষ কোন স্থান নেই, যেটুকু আছে তা অ-পছন্দের। সেটা স্বাভাবিক। তবে নেতা এঁদের ঐতিহ্যে হঠযোগের পরম গুরুর মতো। স্পষ্ট উল্লেখ করা না হলেও তিনি মহাদেবী।

জল নিয়ে তাঁর কারবার। (তুলনা করুন ঋগ্‌বেদের উক্তি—"গৌরীর মিমায় সলিলানি তক্ষতী:" ১.১৬৪.৪১।) যোগীরা নিত্যাকে ভুলে গিয়েছিলেন কিন্তু নামটিকে ছাড়েননি। তাঁরা তাঁদের হঠযোগের কঠিনতম প্রক্রিয়া বস্ত্রখণ্ড দিয়ে অন্ত্র ধৌত করাকে বলতেন "নেতিধৌতি", অর্থাৎ নিত্যার সংস্কার কর্ম। নামটির পিছনের ছবি হারিয়ে যাওয়ায় তাঁরা যে নতুন অর্থ জুড়ে দিয়েছিলেন তার ফলে নেতি-ধৌতির মানে হল—নেতের (অর্থাৎ সরু কাপড়ের) দ্বারা ধোওয়া। ওঁরা নাকি বিশ বাইশ হাত লম্বা বস্ত্রখণ্ড অন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দেহযন্ত্রকে পরিষ্কার করেন।

যোগীদের মধ্যে চলিত ছড়াতেও নেতার যে খণ্ডচিত্র আছে তাতে নিত্যার ইঙ্গিত কিছু কিছু পাওয়া যায়। মনসাকে নেতাই বাধ্য করেছিল বেহুলার উপর প্রসন্ন হতে। নেতার রজকিনী হওয়া অনেকটা "নেত" কাপড়ের সূত্র ধরেই। (নেত 'সরু কাপড়' সংস্কৃত 'নেত্র' 'ছাঁকনি' থেকে।)

মনসামঙ্গল কাহিনীতে "নেতা" নামটির অন্যরকম ব্যুৎপত্তি কল্পনা করে তার অন্যরকম উৎপত্তি বলা হয়েছে। গৃহিণী চণ্ডীর কোপ থেকে মনসাকে বাঁচাবার জন্যে শিব তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় সিজুয়া পর্বতে একলা ফেলে রেখে আসবার সময় মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে একফোঁটা জল পড়েছিল। সেই নেত্রজলবিন্দু থেকে একটি মেয়ে উৎপন্ন হয়। শিব তাঁকে সিজুয়া পর্বতে পাঠিয়ে দেন মনসার অভিভাবক করে। ইনিই হলেন নেতা। এখানে শব্দটির মধ্যে 'নেত্র' শব্দের দুটি অর্থই নিহিত আছে,—(১) চোখ, (২) নায়কত্ব। নেতা মনসার পরে জন্মালেও তাঁকে মনসার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নেতা-মনসার সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদের নিত্যা-বাশুলীর অন্তর্গত যোগ আছে। সে কথা পরে ভেঙে বলছি।

দুই

পরবর্তীকালে লৌকিক ঐতিহ্যে যে নেতা-নিত্যাকে পাওয়া গেল তার খোঁজ ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যেও মেলে, তবে নিতান্ত ক্ষীণভাবে। নিত্যা নামটি—সম্বোধনে "নিত্যে"—আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী-সপ্তশতীতে। (আছে সেই সূত্রে কবিকঙ্কণের অভয়ামঙ্গলে। অন্যত্র এদিকে ওদিকে থাকতে পারে, তবে তা নজরে পড়ার মতো নয়।) নামটি পুরোনো, এবং বাইরের ঐতিহ্য থেকে

আগত বলে মনে হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে-দেবীর মহিমা বর্ণিত হয়েছে তিনি দুর্গা-পার্বতী, নিত্যা নন। (কেন নন তা পরে বলছি।) দেবীনামাবলির মধ্যে গাঁথা হয়ে ওখানে চলে এসেছে।

তিন

'নিত্যা' নামটির অর্থ বিচার করলে আমরা দেবীর সুপ্রাচীনত্বের হদিস পাই। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। পুংলিঙ্গ 'নিত্য' মানে অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর। মানের দিক দিয়ে ঋগ্‌বেদের 'অদিতি' নামটির ঘনিষ্ঠ মিল আছে, এমন কি প্রতিশব্দ বলা চলে। অদিতি একদিকে অবিচ্ছিন্নপ্রসার পৃথিবী, অপরদিকে অবন্ধনা নারী। অদিতি দেবতাদের - ঋগ্‌বেদে অনেক দেবতার, পুরাণে সকল দেবতার — মা। কিন্তু তাঁর কোন বিশেষ পুরুষ সঙ্গীর উল্লেখ নেই। উল্লিখিত আছে অনির্বচনীয় বা অনির্দিষ্ট "দ্যৌঃ" (গ্রীকে জেউস্, লাতিনে জুপিটার)। আকাশ থেকে বৃষ্টি প'ড়ে পৃথিবীকে উর্বরা করে। তেমনি অদিতি উর্বরা হয়েছিলেন দ্যৌ-এর বীর্য-ক্ষেপে।

এই আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে নিত্য (নিত্যা) শব্দের অর্থবিচার আবশ্যক। শব্দটি যেমন সংস্কৃতে তেমনি আরও কোন কোন ইন্দো-ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষায় প্রচলিত ছিল।

চার

এশিয়া মাইনর অঞ্চলে অনেক অনেককাল আগে থেকে মাতৃদেবতার পূজা শুরু হয়েছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ ব্যাপারের ব্যাখ্যা করেছেন, Fertility Cult অর্থাৎ জীবজন্ম-পূজা। দেবতার প্রতীক ছিল নারী-লিঙ্গ। (এ প্রতীক ছদ্মবেশে এখনকার দিনেও আমাদের দেশে চলিত রয়েছে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতে দেবীযন্ত্রে)। আসলে এ প্রতীক পৃথিবীর। ঋগ্‌বেদে "পৃথিবী চ দেবী", হোমরের স্তবে Meter XOhon—মাতা ক্ষমা, পৃথিবী, ক্রীটীয় ভাষায় Gdan Ma ক্ষমা—পৃথিবী—মা')।

সম্ভবত কিছু পরবর্তীকালে, যখন সন্তানের উৎপত্তিতে পিতার দান বোঝা গেছে, তখন নারী-পুরুষ প্রতীক পূজা চলিত হয়েছিল এশিয়া মাইনরের

কোন কোন অঞ্চলে। এশিয়া মাইনরে ও পূর্ব ইউরোপের সন্নিহিত অঞ্চলে কোথাও কোথাও উভয়লিঙ্গযুক্ত আফ্রোদিতের মূর্তি ও পূজার উল্লেখ মিলেছে। আমাদের দেশে যুক্তলিঙ্গ প্রতীকের পূজা দেখতে পাই গৌরীপট্টযুক্ত শিবলিঙ্গে। যেসব প্রাচীন শিবলিঙ্গ সেগুলি থাম বা থামের মত, সেগুলি যথার্থ শিবলিঙ্গ। এগুলি কৃত্রিম আছে, স্বাভাবিকও আছে। যুক্তলিঙ্গগুলি সবই কৃত্রিম, এবং আধুনিক। মনে হয় এই যুক্তলিঙ্গ প্রতীকের নির্মাণের ইঙ্গিত এসেছিল দেবীযন্ত্রের থেকে। দেবীযন্ত্র যুক্তলিঙ্গ।

পাফোসের নিকটবর্তী আমাথুস (Amathus) শহরে যে উভয়লিঙ্গধারিণী আফ্রোদিতের মূর্তি পূজা প্রচলিত ছিল খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে তার অনুরূপ মূর্তি আমাদের দেশেও চলিত হল খ্রীষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে। শিব-পার্বতীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সাহিত্যে উল্লিখিত থাকলেও বাস্তবে পাওয়া গেল বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবতা হেরুক-নৈরাত্মার যুগনদ্ধ মূর্তিতে। এর অনুকরণে ব্রাহ্মণ্য মতেও অর্ধনারীশ্বর মূর্তি গড়া হল। কিন্তু সে মূর্তি যুগনদ্ধ নয়, পাশাপাশি আধাআধি বসানো, অথবা শিবের কোলে পার্বতী। সেন রাজাদের আমলে অর্ধনারীশ্বর হর-পার্বতীর নজিরে অর্ধনারীশ্বর লক্ষ্মীজনার্দন মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশে।

এশিয়া মাইনরে ও মেসোপটেমিয়ায় সুদূর প্রাচীনকালে মহাদেবীকে (Great Mother Goddess) বিভিন্ন নামে পাওয়া গেছে। প্যালেস্টাইনে যে সব ছোটখাট মূর্তি ও খোদাইকরা ছবি পাওয়া গেছে তার কোনো কোনটিতে দেবীর হাতে পদ্মফুল আছে। ঐতিহাসিকেরা এ ব্যাপারে মিসরের প্রভাব অনুমান করেন। সিরিয়ায় মহাদেবীর নাম ছিল আস্টার্টে (Asterte) বা আশ্‌টোরেথ (Ashtoreth)। জেরুসালেমে সলোমোন এই দেবীর বড়ো মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই দেবীই প্যালেস্টাইনে পূজিত হতেন। সেখান থেকে এ দেবীর পূজা সাইপ্রাসে প্রচলিত হয়। সেখান থেকে ঈজিয়ান সমুদ্রের কোন কোন দ্বীপে, এবং সেখান থেকে গ্রীসে পৌঁছয়। পরে রোমেও যায়। রোমে দেবী পরে রোম শহরের অধিদেবী বলে পূজিত হন। তখন তাঁর নাম হয় রোমা (Roma)। এই নামটিই এদেশে এসে 'রমা' রূপধারণ করে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিশব্দ হয়েছে বলে মনে করি।

সুমেরদের কাছে মহাদেবীর নাম ছিল ইনান্না (Inanna)। এই দেবীর

পূজা আক্কাদদের মধ্যেও প্রচলিত হয় এবং ইশ্‌তার (Ishtar) নামে প্রসিদ্ধ হয়। নামে গুণে ইশ্‌তার-আস্টারটের মধ্যে তফাৎ নেই। ইশ্‌তার নামটি পাওয়া যাচ্ছে ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে। নামটির অর্থ অনুমান করা হয় "দ্যৌ-দেবী।" সুমেরিয়ার রাজা গুডেআ (Gudea) ও আসিরিয়ার রাজা হম্মুরবী (Hammurabi) দেবীকে "যুদ্ধদেবী" (Lady of battles) বলেছেন। এ অঞ্চলে—ব্যাবিলোনীয়ান-আসিরিয়ার—দেবীমূর্তি সিংহারূঢ় অস্ত্রহস্ত দেখা যায়। ইশ্‌তার কামবাসনার দেবীও। তিনি পুরুষের প্রেম খোঁজেন ; যে পুরুষকে তিনি অনুগ্রহ করেন তাকে তিনি বাড়ান। ইশ্‌তার গণিকাদেরও ইষ্ট। তাঁর পূজিকা-সেবিকাদের মধ্যে যে গণিকাও ছিল সে কথা গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের উক্তি থেকে জানা যায়। (এখানে তুলনা করতে পারি,—দুর্গাপ্রতিমা গড়ায় বেশ্যাবাড়ির মাটি নেবার ব্যাপার।) সুমের আক্কাদদের দেবী ইশ্‌তার পরে গ্রীক দেবী আফ্রোদিতের (ও রোমান দেবী ভেনাস্-এর) সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন।

সুমেরীয়-আক্কাদীয় মহাকাব্যের (খণ্ডিত রূপে প্রাপ্ত) কাহিনীতে ইশ্‌তারের এক ভগিনী ছিলেন। পাতালের রানী, নাম এরেশ্‌কিগাল (Ereshkigal)। তাঁর অধিকার মৃতদের উপর। এঁর যিনি পতি, দেব নিনাজু (Ninazu), তাঁকে আবার পুত্রও বলা হয়েছে। (বিষহরি মনসার সকাশে জরৎকারু ও আস্তীক। জরৎকারুই কি আস্তীক ?)

এরেশ্‌কিগালের সঙ্গে ভগিনী ইনান্না-ইশ্‌তারের খুব ঝগড়া ছিল। (তুলনা করুন, চণ্ডী ও মনসা।) এরেশ্‌কিগালের পুত্র নামতার (Namtar) হলেন মৃত্যু ভৈরব। দেবীর প্রচুর ক্ষমতা। তিনি সব ইন্দ্রজাল-তুকতাকের দেবী। তাঁর অনুগ্রহ হলে দেহ থেকে অপদেবতার অধিকার দূর হয়ে যায়, রোগী সুস্থ হয়। এঁর পূজা পশ্চিমে মিশর পর্যন্ত ছড়িয়েছিল।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে মহাদেবীকে প্রথম পাওয়া যায় উত্তর এশিয়া মাইনরে ফ্রীজীয়দের (Phrygian) মধ্যে। ফ্রীজীয় ভাষা গ্রীক অক্ষরে লেখা হত। গ্রীক ভাষার সঙ্গে কিছু সাম্যও আছে। তবে এটি সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসীক, বালটিক স্লাভিক প্রভৃতির মত 'শতম্'-গুলোর অন্তর্গত। তাই অনেক বিষয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধরা পড়ে। মহাদেবী উল্লিখিত হয়েছেন Gdan Ma অর্থাৎ ক্ষমা (=পৃথিবী) মাতা বলে। ওঁর সঙ্গে আমাদের অরণ্যানী-সিংহবাহিনী-দুর্গা-পার্বতীর বেশ

মিল আছে। এঁর যোগী (অর্থাৎ পরিচারক) পূজকদের বলত কুর্বন্তেস্ (Kurbentes) অর্থাৎ ছেলেরা।

পাঁচ

কি ভারতবর্ষে কি এশিয়া মাইনর-মেসপোটমিয়ায় মহাদেবীর স্বরূপ দ্বিধা প্রকটিত। একরূপে তিনি উদার পৃথিবী, ধরিত্রী, ক্ষমা, মাতা—জীবসৃষ্টি করেন, জীব ধারণ করেন, জীব সংহার করেন। অপর দিকে তিনি জলে ক্রীড়াময়ী, স্থলে লীলাময়ী ছলনিতা মোহিনী দেবী। অর্থাৎ একদিকে তিনি "নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিঃ", অন্যদিকে তিনি "সুধা-অক্ষয়া নিত্যা।" একরূপে তিনি জনস্থানবাসিনী নিত্যা, অপরদিকে তিনি দুর্গমস্থানবাসিনী অরণ্যানী পার্বতী, দুর্গা। বিদেশে নিত্যারূপে পাই সুমের-আক্কাদে ইশ্‌তারকে, দুর্গারূপে পাই ক্রীজিয়ায় গ্‌দান্-মাকে, গ্রীসে আফ্রোদিতে-এথিনাকে, রোমে ভেনাসকে। আমাদের দেশে এই দু রূপের একীভবন ঘটেছিল।

এদেশে দেবীর প্রাচীন দ্বৈধ রূপ অন্যভাবে চলে এসেছিল। এখানে কিছুদিন পরে এক হয়ে যায় এবং তার পরে নতুন করে দ্বিধাবিভক্ত হয়। এই দ্বিধাভাগ ঘটেছিল অনেকটা যোগী সম্প্রদায়ের দ্বারা বলে অনুমান করি। বুঝিয়ে বলছি।

ঋগ্‌বেদে দুটি বিশিষ্ট ও খুব প্রাচীন নারী দেবতার উল্লেখ আছে,—অদিতি (পৃথিবী) ও উষা (নক্ত্)। আসলে এই দেবীদ্বয় একই। অদিতির মুখ হল উষা আর দেহ হল নক্ত্ (অর্থাৎ রাত্রি)। তরুণী যুবতী লাস্যময়ী উষা ঋগ্‌বেদের প্রধান দেবতাদের মধ্যে একটি। যদিও বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডে উষার স্থান নেই, তবুও এঁর প্রাধান্য স্বীকার করতে হবে যেহেতু এঁর নামে অনেকগুলি সূক্ত অর্থাৎ স্তব ঋগ্‌বেদে গাথা রয়েছে। তবে এটাও ঠিক আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে উষা অনুপস্থিত থাকলেও যে দেবী লৌকিক কর্মকাণ্ডে অপূজিত ছিলেন না সে অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে। তা আমি অন্যত্র প্রদর্শন করেছি। আমি আরও দেখিয়েছি যে দেবী উষাই কালক্রমে দশবাহু দুর্গার মূর্তি পেয়েছিলেন। নক্ত্ অর্থাৎ রাত্রি যে দুর্গার কালিমারূপ তা দেখিয়েছি।

ঋগ্‌বেদের দু একটি সূক্তে এক দেবীকে বলা হয়েছে 'গৌরী'। ইনি

জল নিয়ে কাজ করেন, খেলা করেন, সৃষ্টি করেন। আগে এঁর উল্লেখ করেছি। একটি সূক্ত (১.১৬৪) বেশ প্রহেলিকাময় ও অত্যন্ত দুর্বোধ্য, প্রায়-আধুনিক কালের যোগীদের চার্যা চর্জার মতো। এই সূক্তে যিনি গৌরী অভিহিত তিনি গৌরগাত্রী, আক্ষরিক ও প্রতীক দু-অর্থেই। সুতরাং তাঁকে ধরতে পারি অদিতি (পৃথিবী)-র আর এক স্বরূপ যাতে তিনি জল নিয়ে খেলা বা কাজ করেন। এই জলময়ী অদিতিই বাক্‌দেবী। ইনিই অক্ষর জুড়ে জুড়ে ছন্দ সৃষ্টি করেছেন।

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষতীব্
একপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী
সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪১ ॥

—'জল কেটে কেটে গৌরী নির্মাণ করলেন, একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী—পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা হতে ইচ্ছা করে॥'

দেবীর নারীরূপ বহু এবং অনির্দিষ্ট হলেও তিনি পুরুষ বলেও পরিচিত। (অর্থাৎ আসলে অর্ধনারীশ্বরও)

স্ত্রিয়ঃ সতীস্তা উ মে পুংস আহুঃ
পশ্যদ্ অক্ষ্বান্ ন বি চেতদ্ অন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈম্ আ চিকেত
য স্তা বিজানাৎ স পিতুষ্ পিতাসৎ ॥ ১৬ ॥

—'তাঁরা নারী হলেও শোনা যায় পুরুষ বলে। যার চোখ আছে সে দেখেছে, যে দেখেনি সে অন্ধ। যে পুত্র তত্ত্বজ্ঞানী সেই জেনেছে। তাদের যে চিনেছে সে হয়েছে বাবার বাবা॥'

মহাদেবীর তিনটি প্রধান রূপ, স্বরূপও বলা যায়। এই কারণে মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবীকে "ত্র্যম্বিকা", অর্থাৎ নারীত্রয়ী বলা হয়েছে—বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নারীত্রয়ীর নাম পাওয়া যায় অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা (অর্থাৎ মা, ছোট মা, আরও ছোট মা)। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে মহাদেবী-ত্রয়ীকে বলতে পারি,—(১) অদিতি-ক্ষমা পৃথিবী-নিত্যা, (২) অরণ্যানি-হৈমবতী (পার্বতী) দুর্গা, এবং (৩) গৌরী (ঋগ্‌বেদ)-প্রসূ মনসা-বাশুলী।

ত্রিদেবীর সমস্বর মূর্তি রোমে পূজিত হত। এ মূর্তির তিনমুখ, ছয় হাত, দু দু হাতে দোধারি কাটারি, প্রজ্জ্বলিত মশাল। কুণ্ডলও দুটি সাপ প্রহরী।

তিনটি মাথায় একটি মুকুট। (The Great Mother by Erich Newmann, translated by Ralf Mouheim, New York 1955, পৃঃ ১৩৯।)

অর্বাচীন পুরাণে ও তান্ত্রিক নিবন্ধে দেবীর এক বিশিষ্ট নাম পাওয়া যায় 'ত্রিপুরসুন্দরী', সংক্ষেপে 'ত্রিপুরা,' সংযোগে 'ত্রিপুরা-ভৈরবী'। এ নামটির সঙ্গে দেবীর অগ্নীস্বরূপের কোন সম্পর্ক মেলে না। এ নামটি বিদেশের আমদানী। গ্রীকদেবী আফ্রোদিতে (আমাদের গৌরী-প্রভু মনসা-বাশুলী) অর্ধনারীশ্বর রূপেও পূজিত হতেন। এসিয়া মাইনরের বাইরে তিনটি স্থানে দেবীর পূজা খুব জাঁকজমকে হত। খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর দিকে সাইপ্রাসের পাফোস (Paphos) শহরে, পাফোসের নিকটবর্তী আমান্থুস্ (Amanthus) শহরে (—এখানে পূজিত হত দেবীর উভয়লিঙ্গ মূর্তি), এবং গ্রীসের করিন্থে (Corinth) শহর—এই তিন হল মহাদেবীর প্রধান পীঠস্থান। দেবী কুমারী, কিন্তু তাঁর উপাসিকাদের মধ্যে কুমারীও ছিল গণিকাও ছিল। এ গণিকারা (religious prostitutes) সমাজে মান্য ছিলেন। (আমাদের যোগী-ঐতিহ্যে এরাই যোগিনী।)।

পাফোস-আমান্থুস্-করিন্থের দেবীর থেকেই ত্রিপুরসুন্দরী নামের উৎপত্তি বলে অনুমান করি।

ছয়

আমাদের ঐতিহ্যে মহাদেবীর তিন প্রধান স্বরূপ। প্রথমত তিনি আদি দেবী—অদিতি, ক্ষমা (পৃথিবী), নিত্যা—"আধারভূতা জগতস্ ত্বম্ একা", মহামাতা। তিনি সর্বত্র আছেন, সর্বদা আছেন। দ্বিতীয়ত তিনি দুর্গমস্থানে অধিষ্ঠিত দেবী—অরণ্যানি, হৈমবতী (পার্বতী), দুর্গা। তিনি দূর থেকে দুর্গতদের রক্ষা করেন, তিনি নিত্যার মত উপগম্য নন। আসলে তিনি নিষ্ঠুর দেবতাও। ইনি কারও মাতা নন। নিত্যার যেমন পতি ছিল না (আদিতে উভয়লিঙ্গ বলে), এঁর তেমন নয়, এঁর পতি আসলে—শিব। তৃতীয়ত তিনি লাস্যময়ী ষোড়শী—প্রভু মনসা-বাশুলী। ইনি কুমারী, এবং মানুষের প্রেমে লোভ আছে। ইনিই ঋগ্বেদের গৌরী। তার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ হল মনসামঙ্গলে ও লোকব্যবহারে এঁর নামান্তর জগদ্গৌরী (আসলে "জগাৎ"—অর্থাৎ জবরদস্ত গৌরী)।

তিন মহাদেবীর স্বরূপ বৈদিক অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার যথার্থ অর্থবহ। অম্বা=অম্মা (the great mother goddess, the Earth)। অম্বিকা তো দুর্গার নামান্তর। মানে তরুণী নারী। অম্বালিকা (< অম্বা+বালিকা ?)—আরো তরুণী, শিশু কুমারী।

বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে (তৈত্তিরীয়-সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ) অম্বিকা রুদ্রপত্নী। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (১৬. ১৯. ৪.) অম্বিকাকে রুদ্রের ভগিনীও বলা হয়েছে ("শরদ্ বা অম্বিকা স্বসা")। এখানে শরৎ=শারদা, হৈমবতী, পার্বতী।

সাত

প্রত্ন ইতিহাসের নিত্যাদেবীর ঐতিহ্য বহন করে এনেছে যোগী সম্প্রদায়। এঁরা বরাবরই যাযাবর। আমাদের ঐতিহ্যে যখন থেকে ধরা পড়লেন তখন থেকেই এঁরা শিবের সঙ্গী অথবা অনুচর। ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তে (১০. ১৩৬) এঁদের বলা হয়েছে "কেশিন্", অর্থাৎ দীর্ঘকেশধারী। ঋগবেদের যে সূক্তে গৌরীর কথা বলা আছে সেই সূক্তে এঁর দীর্ঘ কেশধারী তিন উপাসকের উল্লেখ আছে। এঁরা ক্ষমতাশালী যোগী,—যেন তিন দেবতা অগ্নি, সূর্য, বায়ু।

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বি চক্ষতে
সংবৎসরে বপতে এক এষাম্।
বিশ্বম্ একো অভিচষ্টে শচীভির্
ধ্রাজির্ একস্য দদৃশে ন রূপম্ ॥ ৪৪ ॥

—'তিনজন কেশীকে ঠিকমত চেনা যায়। একজন বছরে একবার ক্ষৌরী করেন। একজন জগৎকে উদ্ভাসিত করেন তেজের দ্বারা। (আর) মনের বেগ (অনুভূত হয়, তার) রূপ দেখা যায় না॥'

এইবার কিঞ্চিৎ কল্পনার সাহায্য নিচ্ছি। রুদ্র-শিব ছিলেন একদা নিত্যার প্রধান যোগী (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচালক)। যেন ইশতারের প্রধান পুরোহিত। এই কল্পনার সূত্র পাওয়া যায় মৎস্যেন্দ্রনাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী থেকে। এই কাহিনীর গোড়ার গৌরী যেন নিত্যা, আড়্ডাধারিণী। তাঁর জনকতক সেবক "যোগী"। এঁদের প্রধান হল শিব। এঁকে দেবী পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু অপর দু তিন জনকেও প্রেম

বিতরণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। দেবীর প্রস্তাবে দোনামনা করায় মৎস্যেন্দ্রনাথ নির্বাসিত হন। গোর্কনাথ দেবীকে উপেক্ষা করে দল ছেড়ে চলে যান। পরে ইনি মৎস্যেন্দ্রনাথকেও উদ্ধার করেন। এই দুজন হলেন নারী-সঙ্গ-পরাংমুখ যোগী সম্প্রদায়ের মূল। বলতে পারি এঁরা মহাদেবী নিত্যার আসলে বিদ্রোহী সেবক। তাই এঁদের ঐতিহ্যেই নিত্যা-বাশুলী-মনসার কাহিনী বা allegory যাই বলুন তা পাচ্ছি। তান্ত্রিক আর যোগী দুটি মতই উৎপন্ন হয়েছে প্রাক্-ইতিহাসের ক্ষমা-নিত্যা উপাসনা থেকে। হালকা কথায় বলা যায় যে দলবাজিই ক্ষমা-নিত্যার উপাসনায় ভিন্ন মতের কারণ। ক্ষমা-নিত্যার উপাসিকা-উপাসক দুই-ই ছিল। উপাসিকা "যোগিনী"-রা প্রধান হয়ে এবং যাকে ভদ্রভাষায় বলে fertility cult তাকে অর্থাৎ জীব-জীবনের একটি মুখ্য আনন্দকে বড়ো করলেন এবং মাতৃ ও মাতৃকাতন্ত্রের পথে চললেন। উপাসক "যোগী"-রা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়ানন্দকে তুচ্ছ করে—তাই ঘৃণা করে, ত্যাগ করে—ঊর্ধ্বরেতাঃ হয়ে অখণ্ড জীবনের সাধনায় নিরত হলেন। প্রথম সম্প্রদায় চাইলেন ইন্দ্রিয়ানন্দকে দীর্ঘস্থায়ী করতে, দ্বিতীয় সম্প্রদায় খুঁজলেন অজর-অমর হবার পন্থা। যোগিনী সম্প্রদায়ের উপাস্যা—আসল কথায় ঠিক উপাস্যা নন, সাধন গুরু, সাধন-উপাসিকা হলেন মহাদেবী নিত্যা। তাঁর প্রধান সহচরী, অর্থাৎ দেবীর স্বরূপে প্রধান উপাসিকা হলেন মনসা-বাশুলী। যোগী সম্প্রদায়ের উপাস্য বলে কেউ বা কিছু নেই। আছেন গুরু, যিনি সাধনের পথে সিদ্ধির পথ বাতলে দেন,—আদি যোগী (অর্থাৎ নিত্যার মুখ্য উপাসক) রুদ্র-শিব ও তাঁর সহকারী সহ-"যোগীরা"—মৎস্যেন্দ্র (মীন্)-জালন্ধরি, গোর্ক-কৃষ্ণ ইত্যাদি।

যে অস্পষ্ট সাধক সম্প্রদায়কে আমরা এখন "বাউল" অথবা "সহজিয়া" নামে চিহ্নিত করেছি তাঁরা আমাদের বাংলাদেশের বিশিষ্ট যোগী-সম্প্রদায়। এঁরা শিব-গোরক্ষ ইত্যাদি সিদ্ধাদের ছেঁটে ফেলেছেন বটে কিন্তু নিত্যা-বাশুলীর (মনসা) ঐতিহ্য একেবারে বাতিল করে দেননি। তার প্রমাণ রয়েছে "সহজিয়া" পদাবলীতে ইতস্ততঃ আকীর্ণ। তবে এঁরা গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার সূত্রে আগত ভক্তিরসের সঙ্গে আদিরসের ফোড়ন এবং সর্বোপরি চৈতন্যের বিনয় ও কারুণ্যধর্ম। ঠিক মতো বলতে গেলে বাউল-সহজিয়ারা হলেন যোগী-তান্ত্রিক-বৈষ্ণব। এঁদের তান্ত্রিকতাটুকু অর্থাৎ দেহ-সাধনা তা

সিদ্ধাইয়ের জন্যে নয়, অভিজাবের জন্যেও নয়। এঁদের তান্ত্রিকতাটুকু অত্যন্ত সুগোপন, তা এঁদের দেহচর্যারই অন্তর্গত বলে আমি অনুমান করি। যোগী-তান্ত্রিক ভাবের আমদানি চৈতন্যমতেও হয়েছিল প্রায়-গোড়ার দিক থেকে। চৈতন্য-পরবর্তী পরকীয়া মতে এই ব্যাপারেরই প্রতিফলন, তবে সিধের প্যাটার্ন বদল করে।

আট

প্রশ্ন মনসা ও বাশুলীকে আমি একই দেবস্বরূপ বলছি। কিন্তু তার প্রমাণ কী ?

'মনসা' দেবী-নাম হিসাবে খুব প্রাচীন না হলেও শব্দ বা নামটি পুরোনো বটে। 'মনসা' নামটি সিদ্ধ করবার জন্যে পাণিনিকে একটি সূত্র করতে হয়েছে (৬. ৩.৪)। (এ বিষয়ে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের ভূমিকা, পৃষ্ঠা—xxxii দ্রষ্টব্য।)। মনসা নামটি লাটিন Venus নামটির সমার্থক ও প্রতিরূপ। একই প্রত্যয় যোগে এটি এসেছে মন্‌-ধাতু থেকে (অর্থ—জোর কামনা করা), অপরটি বন্‌-ধাতু থেকে (অর্থ—প্রেম কামনা করা, বাসনা করা)। দেবীদ্বয়ের ঐক্য বিষয়ে আগে লিখেছি (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৬, পূজা সংখ্যা 'লঙ্কাহ্রদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে-কামিনী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। মনসার সঙ্গে মহাদেবী নিত্যার যোগ বিষয়ে একটি নতুন প্রমাণ মনে এসেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রাপ্ত মহাদেবীর সবচেয়ে পুরোনো নাম হল * Khthon ('পৃথিবী'),* Khthon Mater ('পৃথিবী মাতা')। মহাদেবীর এই নামটি পাই মার্কণ্ডেয়-পুরাণে এবং পরে অন্যত্র "ক্ষমা" রূপে। ('ক্ষমা করা' অর্থে ক্ষম্‌-ধাতুর ব্যবহার প্রাচীন নয়। ধাতুটি আসলে ক্রিয়া ছিল না, ছিল শব্দ। সংস্কৃতে ক্রিয়ার অর্থ এসেছে শব্দ-অর্থ থেকে। পৃথিবীর মত সহনশীল কে ?)। অনাধুনিক বাংলা ভাষায় মনসার নামান্তর রূপে "ক্ষমা" শব্দটি পাই কয়েকজন মনসামঙ্গল-কবি-গায়কদের নামান্তর বা উপাধি—"ক্ষেমানন্দ"-থেকে। "ক্ষেমানন্দ" নাম হিসাবে অত্যন্ত অর্থহীন। বাংলায় অর্ধতৎসম উচ্চারণে "ক্ষমা" হয় "ক্ষ্যামা" ("ক্ষেমা")। সুতরাং আসলে নামটি 'ক্ষমানন্দ'। এই নামটির সঙ্গে তুলনা করতে পারি 'নিত্যানন্দ', 'দুর্গানন্দ', 'কালিকানন্দ', 'ভবানন্দ', 'সদানন্দ', 'দেবানন্দ', 'কৃষ্ণানন্দ', 'রামানন্দ', গোবিন্দানন্দ' ইত্যাদি পুরোনো ব্যক্তিনাম

যার প্রথম-অংশ দেবতার নাম। দ্বিতীয় অংশের অর্থ,—প্রশংসা-ধ্বনিকারী আনন্দবর্ধক (পুত্র)। বাসুলী (বাশুলী) নামটি 'মনসা'র মতো এতদিন আগে পাওয়া না গেলেও অর্বাচীন বলে মনে হয় না। কোন এক দেবীর নাম বলে মিলছে মধ্য-বাংলা সাহিত্যে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে। আগে দেবীর পরিচয় বিচার করি তবে নামের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি বিচার করব।

নামটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়, তবে "বাসলী" রূপে। নামটিকে প্রাচীন প্রতিপন্ন করবার জন্যে একদা পণ্ডিতেরা কষ্ট-কল্পনা করে 'বজ্রেশ্বরী' থেকে উৎপন্ন বলে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শব্দবিদ্যার তরফ থেকে এ ব্যুৎপত্তি সমর্থন করা যায় না। পক্ষে যুক্তি ছিল একটি মাত্র,—"বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস," এখানে ছন্দে এক অক্ষর কম পড়ছে, সুতরাং বাসুলী=বাঅসলী। এ যুক্তি অসমীচীন। "বা", "লী"—এই দুটি অক্ষরের যে কোনটিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করলে সমস্যা সহজে মিটে যায়, নূতন একটি অক্ষরের কল্পনা করতে হয় না। সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হল "বাসোলী" উচ্চারণ-কল্পনা। তাহলে বাসুলী (বাশুলী)-র সঙ্গে অভিন্নতা চট করে ধরা পড়ে।

বাসুলী সম্বন্ধে আমি আগে যেসব আলোচনা করেছি তাতে নামটিকে চামুণ্ডা-চর্চিকার নামান্তর মনে করা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক হয়নি। বাসুলী রুদ্রমূর্তি অথবা হিংসামুখী দেবী নন। ইনি নবযুবতী (ষোড়শী) সুন্দরী কুমারী দেবী। বৌদ্ধমহাযানতন্ত্রে ইনিই চুন্দা বলে পূজিত হয়েছেন বলে মনে করি বাসুলী হলেন প্রত্ন-মনসা, মহাদেবী নিত্যার পোষ্য-শিষ্য অনুচরী-কন্যার মতো। নামটির ব্যাখ্যা দু-তিনভাবে করা যায়। এক, প্রাকৃত ও অর্বাচীন্ 'বাসু' শব্দ থেকে, মানে বালিকা, নবযুবতী। দুই, সংস্কৃত 'বাসুরা (বাশুরা)' থেকে, মানে রাত্রী, বিশ্রামদায়িনী দেবী। তিন, বৈদিক 'বাশ্রা' (বাস্রা')', সংস্কৃত 'বাশিতা' '(বাসিতা)' থেকে, মানে "কথানিয়া গাই।" বাসুলী নিত্যা-দুর্গার সংযোগকারিণী দেবী, হৈমবতী-দুর্গার বালিকা-রূপ বলা যায়। এ দেবী ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দুর্গা-চণ্ডী থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। বৃন্দাবনদাস ও মুকুন্দ চক্রবর্তী দু'জনেই চণ্ডী ও বাসুলীকে পৃথক্ দেবতা রূপে উল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, "বাসলীকে পূজয়ে কেহ নানা উপচারে": "মঙ্গল-চণ্ডীর গীত": "দুর্গোৎসব কালে বাস্তু

বাজাবার তরে।" মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ দেবী বাসুলীর 'সাগা'-বস্তু (Saga) উল্লেখ করেছেন।

বর্ধমানে ধুসদত্ত তারে মানে ষোল সত্ত
মহাকুল বাস্তোর প্রধান
বাসুলীর পূজা ঘুচি দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান।

—কে এই ধুস দত্ত যে সাত ষোল অর্থাৎ একশবারো ঘর বেনের প্রধান, যে বাসুলীর পূজা প্রত্যাখ্যান করে বারো বছর কারাবাসের অপমান পেয়েছিল দেবীর হাতে? এ কাহিনী হারিয়ে গেছে। থাকলে ভাল হত। হয়ত এই গল্পের সাহায্যে এশিয়া মাইনরের নিত্যা ও তাঁর অনুচরী দেবীদের সম্পর্কের কিছু সূত্র পাওয়া যেত।

বাসুলীর একদা নামান্তর ছিল 'ইচ্ছাই' (<ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ ইচ্ছামাতা)। এ নাম মিলেছে সেকালের নারীনামে এবং 'ইচ্ছাই-ঘোষ' নামে (=নিত্যানন্দ)। তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে ইনি "ইচ্ছা মহত্তরায়ী", অর্থাৎ ইচ্ছা-ঠাকুরাণী।

তবে কবিকঙ্কণ এই সঙ্গে একটি মূল্যবান খবর দিয়েছেন। এ খবর থেকে বুঝতে পারছি যে পরবর্তীকালে বাসুলী হারিয়ে যাননি, নাম বদল করে 'বিশালাক্ষী' হয়েছেন। বর্ধমান জেলায় অনেক গ্রামে 'বিশালাক্ষী' প্রাচীন গ্রামদেবতা। এঁর মূর্তি নেই। হয় পাথরের টুকরো (উল্কা খণ্ড সম্ভবত,), নয় "বারি" (অর্থাৎ জলপূর্ণ ঘট)। 'বিশালাক্ষী' মানে যার চোখে বিষ। অর্থাৎ দৃষ্টিযোগে চিত্ত হরণ করতে পারেন, প্রাণহরণও করতে পারেন। এই নামের মধ্যে দিয়ে মনসার সঙ্গে বাসুলীর পার্থক্যও জানা যাচ্ছে। মনসা সর্পবিষের ভাণ্ডারী, নিজে বিষধারিণী নন, তবে বিষহারিণী বটেন। বিষবিদ্যার দেবী বলে এঁর সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীনতম নাম হল 'বিষহরি'।

চণ্ডী ও বাসলী যে পৃথক দেবতা তা বাসুলীর সেবক বড়ু-চণ্ডীদাসের সাক্ষ্যতেও পাই। সে কথা বলতে ভুলে গেছি। বড়ু চণ্ডীদাসের বাসলী যে দেবী চণ্ডী নন তা তাঁর উক্তি থেকেও ধরা যায়। হারাণকে পাওয়ার জন্ত বড়াই রাধাকে উপদেশ দিয়েছিল চণ্ডীর পূজা মানসিক করতে ("চণ্ডীরে পূজা মানিঅাঁ)। চণ্ডী হলেন হারা দেওয়ার দেবতা।

প্রত্ন-মনসা বলতে আমি বাসুলীকেই বুঝেছি। এঁর সঙ্গেই Venus-এর অন্তরঙ্গ মিল। অর্বাচীন মনসার উৎপত্তি হয়েছে অন্যথা। তবে চাঁদো বেনের কাহিনীতে প্রত্ন-মনসার মিথ মিশিয়ে আছে। কবিকঙ্কণ মনসার কাহিনীও জানতেন। তিনি উল্লেখ করেছেন চাম্পাইনগরবাসী বণিকদের প্রধান চাঁদোর, "যার গৃহে ছয় বধূ নিবসয়ে রাঁড়।"

নয়

এইবার গোড়ার কথায় ফিরে যাই। চণ্ডীদাসের একটি রাগাত্মিক পদ শুরু হয়েছে এই বলে,

'নিত্যার আদেশে বাসুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে ;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে।'

কবিতাটির ভাষা খুব প্রাচীন নয়, গাঁথুনিও অর্বাচীন। তবে বিষয় খুব প্রাচীন। মহাদেবী নিত্যার সেবিকা—সহচরী-কন্যা বাসুলী নিত্যা-চণ্ডীর সেবককে সহজানন্দ সুখের পরিচয় দিতে আদিষ্ট হয়েছেন মহাদেবী কর্তৃক। নিত্যার সঙ্গে ধোয়া পাখলার সম্পর্ক তা আগেই বলেছি যোগীদের প্রসঙ্গে। বাসুলী তাই উল্লিখিত হন "রজক-ঝিয়ারী" অর্থাৎ "রজককন্যা" সুতরাং "রজকিনী" রূপে। নিত্যার সেবক-সেবিকাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনুমান করতে পারি ব্যাবিলনের ইশ্‌তার সম্বন্ধে হেরোডোটাস (Herodotus) উক্তি অনুসারে। আর নান্নুর? এ নামটিও প্রাচীন এই ঐতিহ্য থেকে পরিকল্পিত মনে করতে পারি। সহজসাধনা আসলে নিরঙ্কুশ দৈহিক আনন্দের সাধনা। এ সাধনার পীঠস্থান হল নিত্যার নগর—নিত্যানন্দপুর>নন্দপুর। নন্দপুর শব্দ বা নামটি শব্দবিদ্যার সমস্ত সিঁড়ি পেরিয়ে এখনকার "নান্নুর" হয়েছে।

'নিত্যা' নামটি হারিয়ে গেছে বটে কিন্তু রেশ রয়ে গেছে 'নিতাই' (<নিত্যা-আর্যিকা, অর্থাৎ নিত্যা ঠাকুরাণী) ও 'নিত্যানন্দ' এই নাম দুটিতে ॥

দুর্গাপূজায় বোধন কেন

যারা দুর্গাপূজা কখনো আগাগোড়া দেখেছেন তাঁরা জানেন যে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী ব্যাপী পূজা কাণ্ডের আগে একদিন অথবা অনেক দিন ধরে দেবীকে উদ্‌বোধনের অনুষ্ঠান "বোধন" পূজা করতে বসতে হয়। এ পূজার আয়োজন যৎসামান্য কিন্তু এ দুর্গা পূজার অপরিহার্য উপক্রমণিকা।

বারোয়ারি দুর্গাপূজায় বোধন হয় শুধু ষষ্ঠীর দিনে। কোন কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীগত কালধারাবাহিত পূজা অনুষ্ঠানেও এক দিনের বোধন হয়। কিন্তু যেখানে দুর্গাপূজা বহুকাল ধরে বংশানুক্রমে ঘটে আসছে সেখানে বোধন হয় ছ দিন কিংবা তেরো দিন ধরে। বোধনের শাস্ত্রীয় নাম হল "কল্পারম্ভ"। 'কল্প' মানে বৈদিক প্রথাগত ধর্মঘটিত ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসব। (দুর্গাপূজা আসলে উৎসব।)। যেখানে তেরো দিন ধরে বোধন হয় সেখানে বলে "নবম্যাদি কল্পারম্ভ"। অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের নবমী থেকে কাজ শুরু হয়েছিল শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিন পর্যন্ত। যেখানে বোধন হয় ছ দিন ধরে সেখানে বলে "প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ"। অর্থাৎ মহালয়া অমাবস্যার পরদিন প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠীর দিন পর্যন্ত। শুধু ষষ্ঠীর দিনে হলে বলে "ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ"। যাঁরা পাঁজি ওলটান তাঁরা নিশ্চয়ই "ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ", "প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ" ও "নবম্যাদি কল্পারম্ভ" কথা তিনটি অবশ্যই জানেন। তবে তার তাৎপর্য হয়ত সকলে জানেন না। তাই এত কথা বলতে হল।

দুর্গাপূজা বছরে দুটি হয়। একটি শরৎকালে—আশ্বিন-কার্তিক মাসে, অপরটি বসন্তকালে—ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। বোধন অনুষ্ঠান তা একদিনের হোক বা তেরো দিনেরই হোক—শরৎকালের পূজাতেই হয়, বসন্তকালের পূজাতে নয়। বসন্তকালের পূজায় ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় দেবীর অধিবাস হয়। সে প্রধানত মেয়েলি কাণ্ড। তা শরৎকালের পূজাতেও হয়। এ অনুষ্ঠানকে অনেকস্থানে "বেলবরণ" বলা হয়। পাঁজিতে "বিল্ববৃক্ষমূলে দেব্যাঃ বোধনম্"।

বসন্তকালের পূজায় বোধন নেই। শরৎকালের পূজায় অতিঅবশ্য আছে। এ অসঙ্গতির ব্যাখ্যা পূজার ব্যবস্থাকারেরাই দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, যেহেতু শরৎকাল দেবতাদের রাত্রি (—আমাদের বছর দেবতাদের অহোরাত্র, মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত ছ মাস দেবতাদের দিন-মান, শ্রাবণ

থেকে পৌষ পর্যন্ত ছ মাস দেবতাদের নিশাকাল—) সেইহেতু তাঁরা ঘুমিয়ে থাকেন। ছ মাসের ঘুম। হঠাৎ হাঁক ডাক করে তাঁদের ঘুম ভাঙালে ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তাই ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরে পূজা প্রার্থনা করে দেবীকে আস্তে আস্তে জাগাতে হবে। ঠিক যেমন করে সেকালের রাজাদের ঘুম ভাঙানো হত নরম সুরে সানাই বাজিয়ে।

মানুষের বছর দেবতার সারাদিন—এ কল্পনার আভাস মাত্রও বেদে নেই। পুরাণ রচয়িতারা এই কল্পনার উদ্ভাবক। এই কল্পনা অনুসারে তাঁরা বোধনের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের কল্পনা থেকে বোধনের উদ্ভব হয় নি। এটা বড়ো তাৎপর্য-পূর্ণ ব্যাপার, দুর্গাদেবীর পূজা ইতিহাসের পক্ষে।

আসলে বৈদিক যাগযজ্ঞের দিনেও এমনি একটু বোধনের ব্যাপার ছিল এক দেবীর উপাসনায়। সে দেবী হলেন উষা, বেদে উল্লিখিত দেবীদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো, যদিও যজ্ঞকাণ্ডে তাঁর কোন স্থান ছিল না। অর্থাৎ তাঁর নামে হোমের কোন ব্যবস্থাই নেই বেদে। তবে যজ্ঞের বিধান সেকালে এবং সেকালের আগে থেকে খুবই ছিল। তার প্রমাণ ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি। এ মন্ত্রগুলি থেকে বলা যায় যে উষাকে লোকে ধ্যান করত, উপাসনা করত সেই উদ্দেশ্যে যে উদ্দেশ্যে পরে দুর্গার পূজা করা হত। অর্থাৎ সেই দাও দাও। ধন দাও, মান দাও, পুত্র দাও, আয়ু দাও, "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি"। পুরুষেরা যেমন মেয়েরাও তেমন উষার দোহাই দিত। তবে বৈদিক উপাসকেরা উষাকে জাগাত না, উষার উদয়ের জন্য প্রার্থনা করত। উষাই জগৎকে জাগাতেন। উষা উদিত হয়ে যেন জড়বৎ সুপ্ত জগৎকে জাগিয়ে দেন। অর্থাৎ বোধন ছিল দেবতার নয়—দেবতার দ্বারা জগতের প্রবোধন। বৈদিক কবির ব্যাকুল প্রার্থনা ছিল উষার উদয়ের জন্য।

সহ বামেন ন উষো বি উচ্ছা দুহিতর্ দিবঃ ॥ ১. ৪৮. ১ ॥

—'হে উষা, দ্যৌয়ের কন্যা, শোভা সম্ভার নিয়ে তুমি আমাদের কাছে প্রকাশিত হও (অর্থাৎ সকাল থেকে।)'

উষার বোধন করবে কী? উষা তো সকলের আগে জেগে ওঠেন।

পূর্বা বিশ্বস্মাদ্ ভুবনাদ্ অবোধি ॥ ১. ১২৩. ১ ॥

—'বিশ্ব সংসারের আগে (উষা) জেগেছেন।'

উষার উপাসনা ধীরে ধীরে নানা বাঁক পেরিয়ে দুর্গাপূজায় পরিণত

হয়েছিল। তবে উষার সঙ্গে দুর্গার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পুরাণকারদের বেশ গোচর অথবা অনুমানগম্য ছিল না। তাঁরা প্রাচীন "বোধন" উপাসনাটি পেয়েছিলেন কিন্তু তার মর্মটি পান নি। সেই কারণে বোধন কাণ্ডের ব্যাখ্যার জন্যে দেবতাদের দিন রাত্রি কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

শারদীয় পূজায় বোধন আছে অথচ বাসন্তী পূজায় বোধন নেই। এ কেমন করে হল? কেন হল?

উত্তর কঠিন নয়। দেবতা দুটি এক নয়, পৃথক। শারদী দুর্গা এসেছেন বেদ থেকে, উষার (ও উষার প্রতিরূপ বা ভগিনী রাত্রির) উত্তরাধিকার সূত্রে। উষা স্বর্ দেবতা, তাই তাঁর বাস হিমগিরিতে। এই সূত্রেই দুর্গা দেবীর সব চেয়ে পুরোনো নাম পাই 'হৈমবতী' অর্থাৎ 'হিমবৎ-বাসিনী'। (এখানে কিছু বিদেশী প্রভাব থাকতে পারে। সে কথা পরে বলছি।)। বাসন্তী দুর্গা পৃথক দেবতা। ইনি জলদেবী বা নদী দেবতা। বেদে এ দেবতার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। এ দেবতার ভাবনায় ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী ঐতিহ্যের মিশ্রণ অনেকটা থাকতে পারে। পরবর্তী কালের পুরাণ কাহিনীতে এই জলদেবীর এক সংস্করণ জাহ্নবী হয়ে শিবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। উষার সঙ্গে বাসন্তী দুর্গার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তাই সে পূজায় বোধনের স্থান নেই। যেটুকু হয়েছে তা শারদীয়ারই প্রভাবে। বাসন্তী দেবীর পূজাকে দুর্গা পূজা বলায় কোন অন্যায় বা অসঙ্গতি ঘটে না। দুর্গা মানে যে দেবী দুর্গম স্থানে বাস করেন, যাঁকে ধরা ছোঁয়া যায় না, যিনি দূর থেকে শাসন করেন, সাহায্য করেন। ইংরেজী করে বললে ঠিক বলা যায়, the unapproachable Goddess। এই ভাবে বিচার করলে আমরা কম বেশি তিনটি দেবীর উপাসনা (অর্থাৎ সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে পূজা করি)—একই দেবতার তিন রূপ মনে করে। তিন জনেই দুর্গমস্থানবাসিনী, সুতরাং দুর্গা। একজন হলেন হিমাচল শৃঙ্গবাসিনী হৈমবতী পার্বতী দেবী, একজন হলেন হ্রদ অথবা সমুদ্র-বাসিনী পদ্মাসনা কমলা (বা কমলে-কামিনী) যাঁর সঙ্গে দেবী মনসা মিলিয়ে আছেন। ইনিই বাসন্তী দুর্গা। আর একজন হলেন দুর্গম অরণ্যবাসিনী যাঁকে ঋগ্‌বেদের একটি অর্বাচীন সূক্তে দেবী অরণ্যানী বলে স্তব করা হয়েছে এবং পুরাণে বিন্ধ্যবাসিনী বলা হয়েছে। ইনি বনবাসিনীও বটেন, পর্বত-বাসিনীও বটেন—বিন্ধ্য অরণ্য ও পর্বতমালা দুইই। হিমালয় ও বিন্ধ্য

ভারতবর্ষের দুই দিগন্ত চিহ্ন-স্বরূপ পর্বত। এ দু স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাই দুজনেই পর্বতবাসিনী। সুতরাং 'পার্বতী' নাম দু দেবীর পক্ষেই খাটে। পুরাণ থেকে জানা যায় যে দেবী বিন্ধ্যবাসিনী শবরদের পূজিতা ছিলেন। তারা মদ্য-মাংস দিয়ে অশ্লীল গান গেয়ে তাণ্ডব নাচ করে তাঁর পূজা-উৎসব করত। এখনকার আমাদের দুর্গাপূজায় প্রাচীন শবরোৎসবের অনেকটাই একদা ঢুকে গিয়েছিল। এখন তার চিহ্ন রয়ে গেছে শুধু পশুবলিদান কাণ্ডে আর সন্ধিপূজায় দেবীকে পশুর মাংস ও রুধির (এবং মদ্য ?) দানে।

অরণ্যানী দেবী স্বতন্ত্রভাবেও টিকে আছেন কোথাও কোথাও তবে নিতান্ত ক্ষীণভাবে এবং পাড়া গাঁয়ে। হিন্দুরা তাঁকে বলেন, 'বনদুর্গা' (—স্থানীয় অন্য নামও যথেষ্ট আছে।)। কোন কোন অঞ্চলে মুসলমান অধিবাসীরাও খাতির করেন এই দেবীকে 'বনবিবি' বলে।

* * *

শারদী দুর্গাপূজা বৈদিক উষা-উপাসনা থেকে এসেছে—এ ইঙ্গিত আগে দিয়েছি। কিন্তু এ দেবতার কল্পনায় বিদেশের প্রভাবও বেশ কিছু আছে। সে কথা বলবার আগে উষার সঙ্গে হৈমবতীর মিল দেখাই।

একটা বড়ো মিল হল "বোধন" কাণ্ডে। তা আগে দেখিয়েছি। এ "বোধন" কাণ্ড অপর দুটি দেবীর—বিন্ধ্যবাসিনীর ও বাসন্তীর বেলায় খাটে না।

দেবী কর্তৃক বিশ্বসংসারের বোধন থেকে উপাসক কর্তৃক দেবীকে (চতুর্থ মণ্ডলে) বোধন পরিণতির আভাস ঋগ্‌বেদেই মিলবে। একটি ঋকে আছে এই কথা, কবি ঋষি বলছেন—

প্রতি স্তোমৈর্‌ অভুৎস্‌মহি।

—'এই স্তব দিয়ে যেন (তোমাকে) জাগাই'।

সপ্তম মণ্ডলের একটি ঋক্‌ থেকে জানতে পারি যে দেবীর উষার বোধন স্তব বা গান প্রথম করেছিলেন বা গেয়েছিলেন বসিষ্ঠ বংশজাত ব্যক্তিরা।

প্রতি স্তোমেভির্‌ উষসং বসিষ্ঠা

গীর্ভির্‌ বিপ্রাসঃ প্রথমা অবুধ্রন্‌।

—'ছন্দে গাথা বাণীতে স্তব করে উষাকে প্রথম জাগিয়েছিলেন বসিষ্ঠ-বংশীয় বিপ্রেরা।'

উষা সুন্দরী, সুবেশা, সু-অলঙ্কৃতা। যখন তিনি উদিত হন তখন বোধ হয় যেন মা মেয়েকে সাজিয়ে দিয়েছে—"মাতৃমৃষ্টেব যোষা"। কেন উপনিষদে হৈমবতীর যে বর্ণনা পাই তা তো উষারই মতো—"বহুশোভমানা"। আমাদের দুর্গা প্রতিমাও তাই—মাতৃমৃষ্টেব যোষা, বহুশোভমানা।

শারদী দুর্গা "দশ বাহু চণ্ডী" ও দশভুজা, ঋগ্‌বেদে কিরণময়ী উষার আবির্ভাব কালে তাঁকেও একবার দশবাহু বলা হয়েছে ("অস্তর্‌ দশহু বাহবু") তাঁর অঙ্গ স্বরূপ যে গোরূপধারিণী অদিতি (অর্থাৎ পৃথিবী) তাতেও একবার তাঁকে দশভুজা বলা হয়েছে ("পৃথিবী দশভুজিঃ")।

শারদী দুর্গা বিশ্বমাতা। ঋগ্‌বেদে উষা দেবতাদের মা ("মাতা দেবানাম্‌")।

শারদী দুর্গা মহিষাসুরকে, শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করে দেবতাদের উপকার করেছিলেন। ঋগ্‌বেদে একস্থানে বলা হয়েছে যে দেবী এগিয়ে এসে কৃষ্ণ-বর্ণ কিস্তৃতকিমাকার ভয়ঙ্করকে বাধা দেন।

বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণম্‌ অভ্বম্‌ ॥ ১.৯১.৫ ॥

শারদীয়া দুর্গার যে প্রতিমা বছর বছর গড়ে পূজা করা হয় তাতে দেবীর মূর্তিতে নানারকম ভেদ দেখতে পাওয়া যায়। এ ভেদ হাতের সংখ্যায়, হাতে অস্ত্রশস্ত্রের অস্তিত্বে অনস্তিত্বে, অসুর ও সিংহের অস্তিত্বে অনস্তিত্বে। একটা বিষয়ে কোথাও অমিল নেই। তা হল প্রতিমার মাথার উপরে চালের বা চালচিত্রের। কেন এ চাল? পূজা তো মন্দিরের মধ্যে। মন্দিরের মধ্যে তো অমন ছাঁচা-চাল থাকে না। তবে কেন? কেন ছবি?

এ প্রশ্ন ইতিপূর্বে কোন পণ্ডিত ঐতিহাসিকদের মনে জেগেছে বলে জানি না। তবে আমার মনে জেগেছে। আমি তার উত্তরও খুঁজে পেয়েছি।

চাল হল মন্দিরের ছাঁচা। চালচিত্র আসলে ছাঁচার চালের নীচের নকশা বা কারুকার্য। সেকালের মাটির বাড়িতে এরকম হত। আর মাটির বাড়ির অনুকরণে মন্দির গড়া চালু হলেও তাতেও হত। তবে সেখানে তো ছাঁচা-চাল নেই। তাই সেখানে কারুকার্য নকশা ছবি আঁকা হত মন্দির দ্বারের উপরে, ঠিক চালচিত্রের স্টাইলে।

এরপর প্রশ্ন জাগে কেন দেবীকে ছাঁচার প্রদর্শন করিয়ে পূজা করা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের বিদেশী ইতিহাসের পাতা

ঘাঁটাতে হবে। তবে দেশীয় ইতিহাসে তার ইঙ্গিত যে নেই এমন নয়। সে ইঙ্গিত হল দেবীর 'দ্বারবাসিনী' নাম। এ নামের ইঙ্গিত হরিবংশে আছে ("দ্বারট্টালকবাসিনী")।

আমরা যে দুর্গাপ্রতিমার পূজা করি তা দ্বারবাসিনী দেবীর। দ্বারবাসিনী দেবীর রুদ্রমূর্তির একটি পুরোনো ছড়া আছে মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলে। তাতে আছে এই ছত্র—

দ্বারে বসে খাইছু মুড়ি চৌদ্দ ঘর পড়শী।

দ্বারবাসিনীর ইতিহাস খুঁজতে গেলে এশিয়া মাইনরে যেতে হবে। সেখানে খুব প্রাচীন কাল থেকে (আনুমানিক ৩০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) দেবতাদের মহা-মাতার (Great Mother of the Gods) পূজা প্রচলিত ছিল। পরে এই দেবতা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষী—সুতরাং আমাদের দূরসম্পর্কিত জাতি ফ্রীজিয়রা (Phrygians) গ্রহণ করে। এই দেবীকে তাঁরা "মোন্ মা" (সংস্কৃতে 'ক্ষমা') অর্থাৎ পৃথিবী মাতা বলে পূজা করতেন। এই দেবীর খুব প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। সে মূর্তি পাহাড়ের উপরে খোদাই করা। দেবী রয়েছেন তার মন্দিরের (বা গুহার) দরজায়। এ কল্পনা বৈদিক উষার সঙ্গেও দেখা যায়। উষা প্রকাশ করতেন আপনাকে রাত্রি-অন্ধকার রূপ গুহার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থেকে। ঋগ্‌বেদের অনেক উষা সূক্তে এই ছবি আঁকা আছে।

আমাদের দুর্গাপ্রতিমাও এই সূত্রে পাওয়া—বেদ থেকে এবং / অথবা ফ্রীজীয় ঐতিহ্য থেকে। এ ঐতিহ্য যে আমাদের দেশে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দার গোড়ার দিকে রোমানদের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে এসেছিল তার অনেক অবান্তর প্রমাণ আছে।

দেবীর সিংহবাহিনীত্বও আনাতোলীয় ফ্রীজিয় সূত্রে আগত। উমা হৈমবতী বা পার্বতীর কোন পৌরাণিক উপাখ্যানে সিংহের উল্লেখ নেই। সিংহ আছেন দেবীর রথের বাহন রূপে অথবা পার্শ্বচর রূপে এশিয়া মাইনরে প্রাপ্ত দেবীর মূর্তিতে। মুকুন্দ কবিকঙ্কণ তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে দেবী অভয়া চণ্ডীর যে নামাবলী দিয়েছেন তার একটি হল 'সিংহরথা'। এ নাম নিশ্চয়ই বিদেশ থেকে এসেছে। বেদে অবশ্য উষার রথের উল্লেখ আছে। তবে সে রথ টানত ঘোড়ায় অথবা গাই-গোরুতে কিংবা ষাঁড়ে। তাদের

রং ছিল লাল। (প্রাচীন ইণ্ডো-ইউরোপীয়দের সময়ে প্রথমে গোরুই গাড়ি টানত, পরে ঘোড়াও ব্যবহৃত হয়েছিল)।

আমাদের দেশে এসে দেবী রথ ছেড়ে দিয়ে সিংহের পিঠে চেপে-ছেন। এই পরিবর্তনের একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন কালিদাস রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গে। রাজা দিলীপ পুত্রকামনায় গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে তপশ্চর্যা করছেন। তপশ্চর্যা আর কিছু নয়, শুধু দিনভর গুরুর গোরু চরানো। হিমালয়ের পাদদেশে এক গুহায় একদিন গোরুটি ঢুকেছিল। সেই অপরাধে এক সিংহ এসে গোরুকে আক্রমণ করে। তখন দিলীপ নিজের দেহ দান করে গুরুর গোরুর মুক্তি চাইলেন। রাজার এই মনোভাবে খুশি হয়ে সিংহ নিজের স্বরূপ অভিব্যক্ত করলেন। তিনি আর কেউ নন, গৌরীর অনুগৃহীত পাদপীঠ নিকুম্ভের মিত্র কুম্ভোদর। গৌরীর অনুগৃহীত পাদপীঠ এই কথাটি থেকেই সিংহবাহিনী দেবীর প্রাচীনতর রূপ গ্যান্-মা-এর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আনাতোলিয়ায় প্রাপ্ত কোন কোন মূর্তিতে দেবীর উচ্চ সিংহাসনের পাশে সিংহ শুয়ে আছে। আমাদের দেশে পশু মূর্তিতে দেবীর পদ্মাসনে অথবা পাদপীঠের নীচে উপবিষ্ট সিংহমূর্তি দেখা যায়।

খুব সম্প্রতি গোয়ায় কতকগুলি প্রাচীন (আবিষ্কর্তারা অনুমান করেন খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত) শিবালয়গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকটি গুহায় শিবমূর্তি—অর্থাৎ শিবলিঙ্গ বিনষ্ট হয়েছে। একটি গুহায় শিবলিঙ্গের মাথাটি সিংহমুখাকৃতি। এই প্রাচীন শিলাবস্তুটির আবিষ্কারের মূল্য ইতিহাসের পক্ষে অপরিসীম। এটি শিব-লিঙ্গ নয়, এটি সিংহধ্বজ। সম্ভবত দেবীর প্রতীক। (যেমন গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর প্রতীক)। দেবীর শক্তির প্রতীক সিংহ (যেমন বিষ্ণুর শক্তির প্রতীক গরুড়)। তাহলে এখন আমাদের দেশে যা বরাবর পূজা পেয়ে-আসছে সেই শিবলিঙ্গের অন্তত দুটি পৃথক্ উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। প্রথম হল লিঙ্গ। লিঙ্গপূজার প্রাচীনতর ইতিহাস আনাতোলিয়ার ঐতিহ্যে লভ্য। রোমান ইতিহাসেও তার গভীর ছাপ আছে। তারপর হল এই সিংহধ্বজ। প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা জানেন যে কোন কোন প্রাচীন শিবলিঙ্গে মুখ আঁকা দেখা যায়। কেন এই মুখ—এ প্রশ্নের একটা উত্তর সহজে মেলে, এ মুখ শিবের, সুতরাং এটা যেন লিঙ্গকে

শিবের নাই। কিন্তু তাই বা হবে কেন? "মুখলিঙ্গম্" তো অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক। এই যে প্রশ্ন তার কোন উত্তর মেলেনি আগে, তার উত্তর মিলছে সিংহধ্বজের আবিষ্কারের ফলে। মুখলিঙ্গম্ এল মুখধ্বজ থেকে, আর এই মুখধ্বজ এল সিংহধ্বজ থেকে। তবুও এ উত্তরে একটু খিঁচ রয়ে যায়। কী কারণে সিংহের মুখ শিবের মুখে পরিণত হল? কী পথে?

এ খিঁচ সরিয়ে দেওয়া যায় একটু ভেবে দেখলে। শিব ঈশ্বর—পরমেশ্বর, কিন্তু তিনি উপাসক, "যোগী"। যোগী মানে অন্তরঙ্গ পরিচারক, যিনি প্রভুর ব্যক্তিগত যোগানদার, সুতরাং তিনি উপাসকও। আনাতোলিয়ার মহাদেবীর বা পৃথিবীমাতারও এমনি ঘনিষ্ঠ সেবক-পুরোহিত ছিল। যোগী শিবের মূলস্থান সন্ধান করতে হলে সেখানকার ঐতিহ্য অনুসন্ধান করতে হবে। সিংহও এক হিসাবে দেবীর ঘনিষ্ঠ সেবক ছিল। তাই পরবর্তী কালে লোককল্পনায়—হয়ত বা পূজকদের ভাবনায়ও—কখনো কখনো বাহন সিংহ আর যোগী ভৃত্য মিলে গিয়ে এক হয়ে পড়েছিল। এই ধারণার ফলে সিংহধ্বজ মুখধ্বজে মুখলিঙ্গে পরিণত হয়েছিল (শুধু লিঙ্গও ধ্বজরূপে পূজিত হত। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত তার অবশেষ চিহ্ন আছে—চড়কে। চড়কগাছ বিচ্ছিন্ন লিঙ্গের প্রতীক। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আগে অন্যত্র আমি করেছি।)। আমার এই অনুমানের সমর্থনে সংস্কৃত শব্দকোষ থেকে প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারি। সংস্কৃত অভিধানে সিংহের এক বিশেষণ নামান্তর হল পঞ্চাস্য বা পঞ্চানন —মানে পাঁচ (অর্থাৎ বিস্তৃত প্রকাণ্ড) মুখো। আবার "পঞ্চবক্ত্র" "পঞ্চানন" শিবকেও বোঝায় (শিবের পঞ্চমুখের যে পুরাণে গল্প আছে তা অর্বাচীন এবং তা পঞ্চানন বিশেষণ নামেরই ব্যাখ্যা হিসাবে তৈরি।)। শিবের মাথায় পাকানো ঝুঁটি ("কপর্দ") অথবা জটা এবং মুখভরা দাড়িগোঁফ। সুতরাং দেখতেও কতকটা সিংহের মতো। এই ভাবনার বশেই পশু-ভৃত্য আর যোগী-ভৃত্য এই নামটির মধ্যে দিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল।

একটু আগে যে কথা বলেছি তার সংশোধন করতে হচ্ছে। আমি বলেছি যে গোয়ার প্রাচীন গুহায় প্রাপ্ত সিংহী মুখ "শিবলিঙ্গ"টি সিংহধ্বজ এবং এটি সম্ভবত দেবীর প্রতীক। সম্ভবত কথাটি তুলে দিতে হবে। এটি যে দেবীর প্রতীক সে বিষয়ে নিশ্চয়তা পেয়েছি হরিবংশ থেকে। হরিবংশে

(২. ১০৭) দেবীকে বর্ণনা করা হয়েছে সিংহস্ত বদনম্ (অর্থাৎ সিংহবদনা) এবং "সিংহপ্রবরকেতনা" বলে। শেষ কথাটির মানে সিংহধ্বজা (দেবী)।

সিংহধ্বজ ছিল শারদা (হৈমবতী পার্বতী) দেবীর। বিন্ধ্যবাসিনী (অরণ্যানী-পার্বতী) দেবীর ছিল ময়ূরধ্বজ। আর বাসন্তী (কমলা-মনসা) দেবীর ছিল নাগবাহন অর্থাৎ নাগধ্বজ। নাগ মানে হাতি, মকর, সাপ—অর্থাৎ ভীষণ জলজন্তু (ইংরেজীতে Sea Monster)।

হরি-হর, সাদা-কালো দেবতা ও তিন কালী

আমরা জানি হরি বিষ্ণু-কৃষ্ণের নামান্তর, হর শিবের। কিন্তু কেন এ নাম?

এ প্রশ্নের উত্তর সোজা হরির বেলায়। হরি শব্দটি প্রাচীন। এটি বেদে আছে, আবেস্তায়ও আছে। বেদে-আবেস্তায় নামটির—আসলে বিশেষণটির—মানে ছিল, ব্রাউন রঙ, হলদে, অগ্নিবর্ণ, মধুরঙা ও সমুজ্জ্বল। মধু, সোমরস, যজ্ঞাগ্নিশিখা ইত্যাদির বিশেষণ ছিল। তার থেকে ঘোড়ার মতো জন্তুর ও ইন্দ্রের মতো দেবতারও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হত। আবেস্তায় পাওয়া গেছে সোমের অর্থাৎ দেবতাত্মা সোমরসের বিশেষণ হিসেবে ("হওম. জইরে"—হে সোম হরে!)।

ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু অক্ষয় মধুভাণ্ডারের অধিকারী ব্রাহ্মণে তিনি অধিদেব যজ্ঞ পুরুষ। মধুর রঙ হরি যজ্ঞাগ্নির বর্ণও হরি। সুতরাং বিষ্ণুর হরি নাম সহজেই এসে গিয়েছিল। কালক্রমে মাধব বিষ্ণু যখন কৃষ্ণে পরিণত হলেন (মদীয় কৃষ্ণবিষ্ণু কথা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—চতুরঙ্গ ১৩৮৩।) তখন হরি কৃষ্ণকেও বোঝাতে লাগল। হরিবংশ এই গ্রন্থ নামটি—মানে 'হরির গাথা'—কৃষ্ণকেই বোঝাচ্ছে বিষ্ণুর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী রূপে। এই নামটি গোড়া থেকেই বৈষ্ণবদের খুব প্রিয় হয়েছিল। তার কারণ নামটির একটি বিশেষ ব্যুৎপত্তি কল্পনা। সংস্কৃতে হৃ ধাতুর মানে হরণ করা যিনি অনুগত ভক্তের দুঃখ-দৈন্য-পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। (যেমন তৃ ধাতু থেকে তরি, 'তৃ' ধাতু থেকে তার তেমনি।) ঈশ্বরের নাম এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?

হরের বেলায় উত্তর দেওয়া সহজ নয়, জানি না কেউ আমার আগে এ সমস্যার আলোচনা করেছেন কিনা। যাঁরা শাস্ত্রপন্থী তাঁরা বলবেন এর উত্তর তো সোজা। হরির মতো হরও তো 'হৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন—সুতরাং হরির যা অর্থ হরের তাই হবে না কেন? (তুলনা করুন চলতি গান 'হরি হরি হরি? হর হর হর।')

এ ব্যাখ্যা শব্দবিদ্যার দিক দিয়ে আমি মানতে প্রস্তুত নই। 'হর' শব্দটি বেদে নেই। আছে পরবর্তী কালের রচনায়। ভবকারী, ধ্বংসকর্তা রূপে শিবের 'হর' নাম স্বীকৃত হয়েছে আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে (ও অন্যত্র)।

এই অর্থ স্বীকার করলে 'হর' শব্দকে বৈদিক 'হরস্' শব্দের সঙ্গে সমান করা যায়। তাহলে নামটিকে বৈদিক কোপন দেবতা রুদ্রের নামান্তর বলে নেওয়া যায়।

দুই

ঋগ্‌বেদে কালো রঙের একটি মাত্র দেবতার উল্লেখ আছে। তিনি হচ্ছেন নক্ত্ ('রাত্রি'), রজনী ('চন্দ্রতারাময় রাত্রি') 'রাত্রী', কৃষ্ণী ('কালো মেয়ে')। এঁর প্রতিরূপ বা অর্ধাংশ হল অরুষী ('অরুণবর্ণ দেবতা') অর্থাৎ দিবা যার মুখ হল উষা ('সূর্যোদয়ের প্রাক্‌কাল)। বৈদিক কবিভাবনায় কৃষ্ণী আর অরুষী যমজ ভগিনী রূপে কল্পিত হয়েছে। এই যমজ দেবতার কোন পূজার ব্যবস্থা ঋগ্‌বেদে নেই তবে স্তব আছে। এ কথা অনুমান করবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, এ দুই যমজ দেবতার পূজা বেদের কালে সাধারণ লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। ঋগ্‌বেদে উষার উপাসনা থেকে যে পরবর্তীকালে দুর্গা পূজার উৎপত্তি হয়েছিল তা আমি আগে কটি প্রবন্ধে দেখিয়েছি। (দুর্গা পূজায় বোধন কেন?—দক্ষিণীবার্তা ১৩৮৯)। রাত্রী বা কৃষ্ণী দুর্গার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। কী কারে তা বলছি।

নক্ত্-উষা, কৃষ্ণী-অরুষী যোড়া দেবভাবনা হলেও এর উৎপত্তি যে এক দেবভাবনা থেকে হয়েছিল সে অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদে। আসলে দেবতা হলেন নক্ত্ কৃষ্ণী—রাত্রির সর্বজীবের কর্মবিরতি ও বিশ্রামের কাল কবিভাবনা নির্ভয় আশ্রয়-আরামের আবাস, অন্ধকার গুহা, যেখানে কোন অশান্তি উপদ্রব আসতে পারে না। এই আরাম-আশ্রয় আবাস বৈদিক ঋষির কল্পনায় দেবমাতা অদিতির প্রতীক। রাত্রিবেলায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বজীব গুহায় বিশ্রাম করে। সকাল হলে অদিতি গুহার দ্বার খুলে দেন। সকলে—দ্বিপদ চতুষ্পদ নিজের নিজের কাজে—খোঁয়াড়-মুক্ত গোরুর মতো চরতে বেরিয়ে পড়ে। উষা হল রাত্রিগুহাদ্বার মোচনকারিণী অদিতির প্রসন্নবদন। তাই ঋগ্‌বেদে কবি বলেছেন, উষা "অদিতের্ অনীকম্"। অর্থাৎ অদিতি যখন অন্তঃপুরে—গুহার ভিতরে থাকেন, যখন তিনি গুহাস্বরূপিণী—তখন তিনি রাত্রিকৃষ্ণী, যখন তিনি বাইরে আসেন তখন তিনি উষা-অরুষী।

পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডীর মধ্যেও এই কৃষ্ণী-অরুষীর দ্বিত্বের সন্ধান পাই। পার্বতী দুর্গা গুহার মধ্যে থাকলে তিনি কালী, গুহামুখে অর্থাৎ গুহার বাইরে থাকলে

তিনি গৌরী। জনসমাজে পূজা পাবার জন্যে দেবী গুহামুখেই থাকেন গৌরী-রূপে। তাই তাঁর একনাম দ্বারবাসিনী। দুর্গার এই দ্বারবাসিনী গৌরীরূপই আমরা পূজা করি।

দেবীর এই ভিতরে কালো বাইরে সাদা রূপের উল্লেখ মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবীর কাহিনীতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের আগে দেবী পার্বতী দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়ে তাঁর অম্বিকা স্বরূপ (গৌরীরূপ) প্রকট করলেন তখন দেবতাদের মনে হয়েছিল তাঁর দেহ থেকে অম্বিকা সত্তা বেরিয়ে আসবার পর যে খোলস দেহ রইল তা কালী হয়ে গেল। (অর্থাৎ কৃষ্ণী অংশ গুহায় পরিণত হল।) মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই অংশ (৮৫ অধ্যায় থেকে) উদ্ধৃত করছি।

দেবতারা শুম্ভ ও নিশুম্ভর কাছে পরাজিত হয়ে হিমালয়ে গিয়ে সকলে মিলে দেবী বিষ্ণুমায়াকে স্তব করতে লাগলেন। এই সময় দেবী পার্বতী সেখানে এলেন গঙ্গায় স্নান করবার উদ্দেশ্যে। তাঁদের স্তব করতে শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখন কার স্তব করছ? বলতে বলতেই তাঁর শরীরকোষ থেকে বেরিয়ে এসে শিবা (অর্থাৎ দেবী কল্যাণী) বললেন – দৈত্য শুম্ভ ও নিশুম্ভ দ্বারা পরাস্ত দেবতারা আমারই এই স্তব করছে। সেই পার্বতীর শরীরকোষ থেকে নির্গত হয়েছিল বলে তার অম্বিকা (অর্থাৎ তরুণী দেবী) নাম। তারপর থেকে সমস্ত লোকে কৌশিকী (অর্থাৎ শুটি থেকে বেরনো) বলে গীত হচ্ছেন। তিনি (অর্থাৎ অম্বিকা) বেরিয়ে গেলে পর সেই পার্বতীও কালো হয়ে গেলেন। হিমালয়স্থিত তিনি কালিকা এই নামে কীর্তিত হয়ে আসছেন। (ইত্যিক্তামতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্। জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবু:…এবং স্তবাদি যুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী। স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন। সাব্রবীৎ তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা। শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ পার্বত্যানিঃসৃতাম্বিকা। কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো তস্যাং বিনির্গতায়াং তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী। কালিকেতি সমাখ্যাতা…)।

এই কাহিনীটুকুর অত্যন্ত ঐতিহাসিক মূল্য আছে। পার্বতী হলেন পর্বত-বাসিনী দেবী, যাঁকে কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে হৈমবতী উমা, যাকে পুরাণে বলা হয়েছে দেবী শারদা (অর্থাৎ হৈমবতী)। ঋগ্‌বেদের বর্ণনায় দেবী হলেন আসলে গুহাবাসিনী আত্মরদাত্রী অন্ধকারের—রাত্রির দেবী। তিনি প্রকাশ হন উষা রূপে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের গল্পেও ঠিক তাই। দেবতারা যেন স্তব

করছিলেন দেবমাতা অদিতির গুহাদ্বারে বসে। গুহার ভিতর থেকে তরুণী ঊষা বেরিয়ে এলেন। পিছনে পড়ে রইল অন্ধকার গুহা। ইনিই কৃষ্ণী নক্ত্‌।

বৈদিক ভাবনায় এই আপাত ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে পরবর্তী কালের লৌকিক ভাবনার ছাপ থাকতে পারে। আমাদের প্রাচীন অনেক কাহিনীতে "কালী গৌরী—দুটি মাও"র উল্লেখ পাই। তার ছাপও এ কাহিনীতে অল্প-স্বল্প পড়তে পারে। কিন্তু বৈদিক নক্তোষাসার ছবিও তো "কালী গৌরী" দুটি মেয়ের চিত্র। রাত-দিনের ওই রকম নারী-রূপায়ণ মানবচিন্তার একটি প্রাচীনতম ফল।

অনেক পরবর্তী কালে, তবে প্রথম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আগেই আর দুটি সাদা-কালো নারীদেবতা অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এঁরা হলেন হিমালয়-জাতা দুটি প্রায়-যমজ নদী (এই ভাবনার বশেই একটির নাম যমুনা। কথাটি আসলে গঙ্গা যমুনা, অর্থাৎ যমজ দুই গঙ্গা নদী।)। যমুনা কালো অর্থাৎ যমুনার জল নীলাভ বা কালচে, গঙ্গার জল সাদা বা ঘোলাটে। যমুনার প্রতিষ্ঠা কম হয়েছিল, যেহেতু এর অপর পারে দেশের যে বৃহত্তর ভূখণ্ড ছিল তা প্রায়ই জঙ্গল ভূমি, সেখানে ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞের—তেমন রমরমা ছিল না। গঙ্গার তীরে তা ছিল। তাছাড়া গঙ্গা অনেক বেশী পলিমাটি ফেলে এসেছে, যার ফলে গঙ্গাবিধৌত অঞ্চলে চাষবাসের কাজ খুব ভাল ভাবেই চলত। উত্তর ভারতের "কৃষিসংস্কৃতি"র বাস্তভূমিই হল গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা, তাতে গঙ্গার দান যমুনার চেয়ে বেশী। গঙ্গার দেবীত্বে পূর্ণ অভিষেক ঘটেছিল আনুমানিক দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে। তখনই গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য সমস্ত তীর্থবারির মহিমা ছাড়িয়ে গিয়ে বিষ্ণুর পাদোদকের মাহাত্ম্য পেয়েছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর থেকে গঙ্গামাহাত্ম্য ভারতবর্ষের মনপ্রাণের ঐক্যের একটি দৃঢ়তম বন্ধন-রজ্জু হয়ে আছে।

প্রসঙ্গক্রমে পশ্চিমবঙ্গে একটি মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠানের কথার উল্লেখ করা যায়। কালীপূজার রাত্রিতে কোন কোন অঞ্চলে মেয়েমহলে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর পূজা হয়। দুইই পিটুলিতে গড়া খেলার পুতুলের মূর্তি। তবে লক্ষ্মীর রঙ সাদা, অলক্ষ্মীর রঙ কালো। এখানে আসলে পাচ্ছি আমরা কৃষ্ণী-অরুষীর, কালিকা-গৌরীরই এক সংস্করণ।

এইবার সাদা-কালো পুরুষ দেবতার কথা বলি।

কৃষ্ণ-বলদেব কালো-সাদা। কৃষ্ণের রঙ যে কালো, তা তার নাম থেকেই বোঝা যায়। কৃষ্ণ শব্দটির অন্যতম মৌলিক অর্থ, যা ইউরোপীয় অন্যভাষায়ও সমর্থিত, তা হচ্ছে কালো। কিন্তু বলদেব সাদা হলেন কেন? কৃষ্ণের বৈপরীত্যে? সেটা সম্ভব আর একদিক থেকেও। পৌরাণিক কাহিনীর কৃষ্ণ-বলদেব যে বৈদিক দেবতা অশ্বিদ্বয়ের পরিণতি সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। উড়িষ্যার পুরোনো কাহিনীতে এঁরা—জগন্নাথ-বলরাম হলেন অশ্বারোহী দুই যোদ্ধা, একজনের ঘোড়ার রঙ কালো, আর একজনের ঘোড়ার রঙ সাদা। ঋগ্‌বেদে অশ্বিদ্বয়ের নাম ছিল দস্র ও নাসত্য। এঁরা মানুষের আর্তিহর দেবতা, এঁরা "হারা দেওয়ান, মরা বাঁচান"। এঁরা আবার দেবী উষার অনুচর-সুহৃৎও বটেন। ইউরোপীয় পুরাণকাহিনীতে এঁরা দুটি যমজ তারা।

মনে হয় একটি হ'ল সন্ধ্যাতারা, কৃষ্ণ—নক্তংকৃষ্ণীর পুরুষ প্রতীক, অপরটি হল বলদেব—উষা-অরুষীর পুরুষ প্রতীক। কৃষ্ণ হলেন বৈদিক দস্র (অর্থাৎ খুব কাজের লোক), আর বলদেব হলেন বৈদিক নাসত্য (অর্থাৎ বিলাসী পুরুষ)। কৃষ্ণের ব্রজলীলার যে কাহিনী আমরা পেয়েছি তা পরবর্তী কালের। সেখানে বলদেবের চিত্র খুব ফিকে হয়ে গেছে এবং তাঁর গুণাবলী কৃষ্ণে সঞ্চারিত হয়েছে। এখন কৃষ্ণ-বলদেবে দুজনের বৈপরীত্য দেখাচ্ছি।

কৃষ্ণ রাত্রিতে রাস করেন, বলদেবের রাসলীলা দিনে। কৃষ্ণ গোপনে বাঁশি বাজিয়ে নিভৃতে রাধাকে নিয়ে আসেন। বলদেব প্রকাশ্যে টেনে আনেন যমুনাকে। বলদেব দিনের ঠাকুর, তাই তিনি সকালে গোরু চরাতে যান। (কৃষ্ণকে তিনিই ডেকে নিয়ে যান। আর কৃষ্ণ রাত্রির দেবতা, তাই তিনি সন্ধ্যায় গোরু ফিরিয়ে আনেন গোষ্ঠে অর্থাৎ কৃষ্ণীর কুলায়ে)।

তাছাড়া বলদেবের সাদা হওয়ার আর একটা কারণ থাকতে পারে। তাঁর উপরে—যে কোন কারণে হোক—শিবের সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য এসে পড়েছে। শিব সাদা (কেন তা পরে বিবেচনা করছি), তাঁর ভূষণ সাপ, তিনি নেশাভাঙ করেন। বলদেব—সর্পাত্মা, শেষ নাগের স্বরূপ, তাঁর রাজধানী জলের তলায়, সাপের দেশে। তিনি মত্তপ। শিবের প্রতীক লিঙ্গ, বলদেবের অস্ত্র লাঙল। শিবের একটিমাত্র কান্তা—পার্বতী। বলদেবেরও একটি মাত্র কান্তা—বারুণী (রেবতী)।

হিন্দুধর্মের প্রধান দুই পুরুষ দেবতা বিষ্ণু-শিব হলেন কৃষ্ণ-বলদেবের

মতোই কালো ও সাদা। বিষ্ণু কালো, মানে শ্যামবর্ণ, আকাশের রঙ বলে। বিষ্ণু সর্বব্যাপী, সবকিছু নিয়ে আছেন, তিনি আকাশ। কিন্তু শিব? তিনি কেন সাদা?

শিবের ব্যাপার বিষ্ণুর মতো সরল সহজ নয়। বিষ্ণু সরাসরি এসেছেন বেদের থেকে। শিব তেমনি আসেনি। তাঁর মধ্যে অনেক দেবভাবনার মিশ্রণ ঘটেছে। ঋগ্‌বেদের দেবতা রুদ্র অংশত শিব, পুরোপুরি নন। অর্বাচীন বেদের - ব্রাহ্মণ গ্রন্থের—দেবতা রুদ্র, যাঁকে দেবতারা সৃষ্টি করেছিলেন নিজের নিজের অংশ দিয়ে (—যেমন করেছিলেন মহিষাসুর বধের জন্য দেবীকে—) তাঁর বিশেষ নাম হল 'ভূতময়' বা 'ভব'। অবৈদিক দেবতা যোগী শিব বৈদিক দেবতা দুটির সঙ্গে মোটেই সংপৃক্ত নয়। একবারেই মিল নেই বলা ভুল হবে, কেননা মিল কিছু ঘটেছে। তবে পরবর্তীকালে।

ঋগ্‌বেদে কিছু কিছু ভাসা ভাসা দেবভাবনা আছে। তার মধ্যে একটি হল 'বাস্তোস্‌-পতি' অর্থাৎ বাস্তুদেবতা, গেরস্থালির ঈশ্বর। ঋগ্‌-বেদের সপ্তম মণ্ডলে (৫৪) বাস্তোস্‌-পতির একটি স্তব (সূক্ত) আছে। পরের সূক্তের প্রথম ঋকেও এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋগ্‌বেদে এঁর সঙ্গে রুদ্রের অথবা অন্য কোন দেবতার যোগাযোগ উল্লিখিত নেই। তবে তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বাস্তুদেবতাকে রুদ্রের নামান্তর বলা হয়েছে।

পরবর্তীকালে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে বাস্তুদেবতার মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে, পূজাও চলিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের চৈত্যপূজা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। এ পূজা প্রকারান্তরে বৌদ্ধ ধর্মেও স্বীকৃত হয়ে এসেছে। কামতা-কামরূপ অঞ্চলে এখনও বাস্তুদেবতার নামটি বিলুপ্ত হয়নি, 'বাথৌ' রূপে রয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এ দেবতা ও পূজা এখন বিলুপ্ত। তবে "বাস্তুবাবা'র স্বীকৃতি আছে ভিটা-বাসী প্রাচীন গোখরো সাপে।

লৌকিক আচারে বাস্তুদেবতার প্রতীক ছিল পূর্বপুরুষের সমাধিস্তূপ বা সমাধি সৌধ বা সমাধি স্তম্ভ। এই তিন বস্তু সাধারণত চুনকাম করা হত। তাই থেকে শিব হয়েছেন শ্বেতকায়। স্তম্ভ একদিকে হয়েছিল ভিত্তি-স্তম্ভ, মূলস্তম্ভ বা পুরোনো বাংলায় 'জাঠ, জাঠা'। আর একদিকে হয়েছিল বহনকারী সর্প, বিষ বা শেষ। এই প্রসঙ্গে বাণভট্টের একটি শ্লোক যা অনেক শৈব রাজার শাসনপট্টে উদ্ধৃত দেখা যায় তা স্মরণীয়। শ্লোকটি চমৎকার রচনা।

নমস্ তুঙ্গশিরশ্চুম্বিচন্দ্রচামরচারবে।
ত্রৈলোক্যনগরারম্ভমূলস্তম্ভায় শম্ভবে।

"নমস্কার (করি) শম্ভুকে, যাঁর উঁচুমাথা চন্দ্রকিরণের চামরে ঝলমল, যিনি ত্রিভুবনরূপ নগরপরিসরের ভিত্তিস্তম্ভ (স্বরূপ)।'

আমাদের এখনকার শিবভাবনার অনেকগুলি খেই এসেছে এই বাস্তোস্পতি ভাবনা থেকে। যেমন, স্থূলকায়, সাদা, রক্ত চিতাভস্মলেপ ও সর্পভূষণ। এইখানে উল্লেখ করি যে মূলস্তম্ভের সঙ্গে সর্পের যোগাযোগের স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে। আসাম অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি পূজা স্তম্ভের গায়ে জড়ানো সাপের প্রতিকৃতি আছে। (মৎসম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

তিন

দেবী কালী একজন নন, অন্তত তিন জন ছিলেন। দুজনের উল্লেখ সাদা-কালো দেবতার আলোচনায় ধরা পড়েছে। এ দুজনের একজন হলেন ঋগ্বেদের নকৃৎ-কৃষ্ণী, যিনি পৌরাণিক মহাদেবীর খোলসের মতো। শুম্ভ নিশুম্ভ বধের কাহিনীতে যিনি উল্লিখিত হয়েছেন 'কালিকা'—অর্থাৎ কালো-মেয়ে রূপে।

দ্বিতীয় কালী বেরিয়ে এসেছিলেন মহাদেবীর (—অম্বিকা, চণ্ডী—) ললাট থেকে। শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতিদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড যখন দেবীর বাহিনীকে হারিয়ে দিচ্ছিল তখন দেবীর ক্রোধ যেন কালীর বীভৎস মূর্তি ধরে বেরিয়ে আসে ও চণ্ডমুণ্ডকে হত্যা করে। এই দ্বিতীয় দেবী কালী—আমাদের এই নামে অধুনা পূজিত দেবতা—"মহাদেবীর ললাট" থেকে বেরিয়ে এসেছিল। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করছি (অধ্যায় ৮৭)

ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদপূরিতদিঙ্মুখা॥

তাঁর ভুরুকোঁচকানো কপাল থেকে অমনি বেরিয়ে এল কালী। তার মুখ ভয়ঙ্কর। তলোয়ার ও ফাঁস নিয়ে। বিচিত্র ঢাল ধরে। মানুষ (অর্থাৎ মানুষের মুণ্ড বা অস্থ) মালা করে পরে, বাঘের ছাল জড়িয়ে। গায়ের

মাংস শুকিয়ে গেছে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখতে। মুখে প্রকাণ্ড হাঁ। জিব ভয়ঙ্করভাবে লক্‌লক্ করছে। বসে গেছে লাল চোখ। তাকে চারদিক মুখরিত।'

এই যে ছবি তা ঠিক আমাদের এখনকার পূজিত কালী ঠাকুরের প্রতিমূর্তি নয়। মনে হয় মার্কণ্ডেয়-পুরাণের এই বর্ণনাটি একটি বিকৃত সংস্করণ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষীদের মধ্যে (এবং তার বাইরেও) লোক-বিশ্বাসে প্রায় সর্বত্র (অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে বৃকমানবতার, ব্যাপক অর্থে পশুমানবতার) উদাহরণ পাওয়া যায়। গ্রীসে ছিল মানববরাহ (তুলনীয় আমাদের বরাহ-অবতার), ইংলণ্ডে মানবশশ, মিশরে মানবশৃগাল, আফ্রিকায় মানবহেঁড়েল, চীনে মানবশৃগাল, জার্মানীতে মানবনেকড়ে, ভারতবর্ষে মানব-শার্দুল ইত্যাদি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণনাটি যেন মানববাঘের বিমিশ্র চিত্র। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, অংশত মানব অংশত বাঘ—মানবব্যাঘ্র। যার লাল চোখ বসে গেছে, যার ক্ষীণ উদর আরও ক্ষীণ হয়েছে, খাদ্যের প্রত্যাশায় জিব লক্ লক্ করছে। বাঘের চার পা, এ দেবীও চতুর্ভুজ। (স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায়—এক হাতে অসি, এক হাতে পাশ, এক হাতে ঢাল, এবং অবশ্যই অপর হাতে অঙ্কুশ (তলোয়ারের সঙ্গে ঢাল যেমন, পাশের সঙ্গে অঙ্কুশও তেমনি।)

বিচিত্র মানবশার্দুল কালী মহাদেবীর দেহ থেকে বেরিয়ে এসে শার্দুলভাবে শত্রুসৈন্যদের সব খেয়ে ফেললেন, আর মানবস্বরূপে চণ্ডমুণ্ডের মাথা কাটলেন। তারপর সে দুই মুণ্ড দুহাতে ধরে নিয়ে কালী মহাদেবীর কাছে উপস্থিত হলেন। দেবী সে উপহার পেয়ে খুসি হলেন। বললেন,

যস্মাচ্ চণ্ডং চ মুণ্ডং চ গৃহীত্বা
ত্বম্ উপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততোলোকে খ্যাতা
দেবি ভবিষ্যসি।

'যেহেতু চণ্ড ও মুণ্ডকে নিয়ে তুমি এসেছ, (সেই হেতু) হে দেবী, জনসমাজে তুমি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হবে।'

চণ্ড-মুণ্ড বধের পরেও শুম্ভ-নিশুম্ভের দলকে কাবু করা গেল না। তখন আবশ্যক হল দেবীরও সেনাদলের। সে দল গড়া হল। দেবতাদের দেহ থেকে তাঁদের শক্তি বেরিয়ে এসে মহাদেবীর নারীবাহিনী সৃষ্টি করলেন। বিষ্ণু থেকে এল বৈষ্ণবী, ব্রহ্মা থেকে ব্রাহ্মী, ইন্দ্র থেকে ইন্দ্রাণী, কুমার থেকে কুমারী

ইত্যাদি। এঁরা সব যুদ্ধ করেও পেরে উঠতে পারছিলেন না শুম্ভ-নিশুম্ভর নূতন সেনাপতি রক্তবীজের কাছে। রক্তবীজকে কেটে ফেললেও সে মরে না। (তখন বোধ হয় অসি আর শূল ও ধনুর্বাণ ছাড়া বধের কোন উপায় জানা ছিল না।) তার রক্ত এক ফোঁটা মাটিতে পড়লেই আর একটা রক্তবীজ জন্মায়। রক্তবীজের কাছে হয়রাণ হয়ে মহাদেবী তখন নিজের শরীর থেকে শক্তি বার করলেন। এ শক্তি শিয়াল (অথবা নেকড়ের আকৃতি), অথবা এ শক্তি শৃগাল-মুখ অথবা কোকা-মুখ, অর্থাৎ যথার্থ মানবক।

তত্তো দেবীশরীরাৎ তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তির্ অত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী॥

—'তারপর দেবীর শরীর থেকে বেরিয়ে এল অতিশয় ভয়ঙ্কর চণ্ডিকাশক্তি, শৃগাল, একশ (শিয়ালের) রব-কারিণী॥'

[শ্লোকটি আলোচনা করবার আগে দেবীর দুটি মানবজান্তব মূর্তির কথা বলতে চাই। পুরাণকাহিনীতে এবং প্রত্নলিপিতে মহাদেবীর 'কোকামুখা' বা 'কোক-মুখা' নাম পাওয়া গেছে। 'কোক' নামে নে'ড়ে বাঘ অথবা শিয়াল। বিষ্ণুর নামও মিলেছে 'কোকমুখ'। এই নামের বিষ্ণুমূর্তি নৃসিংহ-মূর্তির মধ্যে তলিয়ে গেছে। মহাদেবীর বেলায় 'কোকামুখা' মূর্তি লোপ পেয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু লোকব্যবহারে কিছুকাল আগে পর্যন্তও "শিয়ালী কালী" পশ্চিমবঙ্গে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না]

এই প্রসঙ্গে মহাদেবীর আর একটি মানবজান্তব রূপের কথা বলে দিই। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে মহাদেবীর পক্ষীমূর্তির কোন উল্লেখ পাইনি, তবে হরিবংশে এবং পুরানসাহিত্যে অন্যত্র আছে। কংস কর্তৃক শিলাপাটে আছড়ে মারার সময় সদ্যোজাত শিশুমূর্তি দেবীর চিল হয়ে উড়ে যাবার কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। এই বিশ্বাস অনুসারে আমরা এখনও আকাশে শঙ্খচিল উড়লে নমস্কার জানাই। শাস্ত্র অনুসারে দেবীপূজার কোন প্রাচীন বিধানে পক্ষীমূর্তি অথবা পক্ষীমুখ মহাদেবীর উল্লেখ পাইনি। তবে লোকব্যবহারে তা চলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যমধ্যে দেবীস্তোত্রে লিখে গেছেন—

'বলাক পূজিয়া বলদেবের ভগিনী।
'ক্রৌঞ্চ ("বলাক", "বলাকা")-রূপে
পূজিত (তুমি), বলদেবের ভগিনী।'

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এবং এইসময়ে সংকলিত তন্ত্রগ্রন্থে মহাদেবীর নাম পাচ্ছি 'বগলা' (বগুলা তুলনীয় বকলক) অথবা 'বগলা-মুখী।' ভারতচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িকেরা শুধু নামটিই পেয়েছিলেন, এমন কোন পক্ষী-দেবতার অথবা পক্ষী-মানব দেবতার মূর্তি দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। তাহলে নিশ্চয়ই কিছু বর্ণনা পাওয়া যেত।

মার্কেণ্ডেয় পুরাণের তিনটি দেবীমাহাত্ম্য কাহিনীর কোনটিতেই যে দেবীর পক্ষীরূপের উল্লেখ নেই তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কাহিনী তিনটির মধ্যেও যেন কিছু মতের তফাত আছে। দ্বিতীয় কাহিনীতে মানবজান্তব মোটেই নেই, যদি না মহিষাসুরকে মানবজান্তব বলে মনে না করি। তবে প্রথম কাহিনীতে একটু আছে। মধু-কৈটভ হল মধুকীট ("মধুকীট+-ভ")। এখন মূল আলোচনায় ফিরে যাই।

দেহ থেকে শিবাশক্তি বার করবার প্রয়োজন হল রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়বার আগেই তা খেয়ে ফেলা। (কে জানে হয়ত শৃগাল শব্দের লোক ব্যুৎপত্তির খাতিরেই—"অসৃক্ নাত্তি"—বৃক ('কোক') এখানে শৃগাল হয়েছে।)

মহাদেবী চণ্ডিকার দেহ থেকে কালীমূর্তি বেরিয়ে তা চণ্ড-মুণ্ডকে নিহত করেছিল। এখন যে আবার রক্তবীজকে ধ্বংস করতে আর এক শক্তি নিষ্কাশনের প্রয়োজন হল তাতে মনে হয় যে এখানে একটি স্বতন্ত্র কাহিনীর সংযোজন হয়েছে। হয়ত এখানে সব দেবতারই শক্তি শৃগাল (কোক) রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। মহাদেবীর শক্তি তাদের নেতা ছিল। মহাদেবী তাঁর এই শৃগাল স্বরূপকে (অথবা শৃগাল-বাহিনীকে) দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে। তারা যদি প্রাণে বাঁচতে চায় তবে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে যেন পাতালে আশ্রয় নেয়। মহাদেবী ভয় দেখিয়েছিলেন, অন্যথা তাঁর শিবাপাল তাদের মাংস ছিঁড়ে খাবে। সংযুক্ত কাহিনীর মর্ম না জেনে আমাদের শাস্ত্র-কারেরা শিবাদূতীর আসল অর্থ ধরতে পারেন নি। আসল অর্থে শব্দটি কর্ম-ধারয় সমাস, শিবাই দূতী। ওঁরা ধরে নিয়েছেন সমাসটির ঠিক পাঠ শিবদূতী। তাই তাঁরা অকস্মাৎ শিবকে মহাদেবীর দূতরূপে কল্পনা করেছেন। তাঁরা বিবেচনা করে দেখেননি যে শুম্ভ-নিশুম্ভ কাহিনীর মধ্যে—এমন কি মার্কণ্ডেয় পুরাণের আর দুটি কাহিনীর মধ্যেও শিবের কোনই স্থান নেই দেবীর সম্পর্কে। শাস্ত্রকারদের গৃহীত অর্থ হল—শিব যাঁর দূত এমন নারী বহুব্রীহি সমাস)।

মহাদেবীর যে শিবাবাহিনী ছিল তা তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়। শুম্ভ-নিশুম্ভের প্রতি উক্তির মধ্যে এই কথা ছিল,

বলাবলেপাদ্ অথ চেদ্ ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ॥

—'সামর্থ্যের অহঙ্কারে যদি তোমরা যুদ্ধ করতেই চাও তবে এগিয়ে এস। আমার শৃগালেরা তোমাদের দুজনের মাংসে তৃপ্তিলাভ করুক।'

শুম্ভ-নিশুম্ভ মহাদেবীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে। রক্তবীজের তাণ্ডব চলতে লাগল। তার বিরুদ্ধে চামুণ্ডা নিয়োগ করলেন কালীকে। কালীর সঙ্গে শিবার কোন উল্লেখ নেই। থাকা উচিত ছিল। একা কালী রক্তবীজের সব রক্ত আগে গলাধঃকরণ করতে পারে নি। এখন শিয়ালদের সহযোগিতায় সে কাজ করতে পারা গেল।

আগে কোকামুখা দেবী ও শিয়ালী কালীর উল্লেখ করেছি। এখন মনে পড়ছে "শতনিনাদিনী" শিবা-দূতীর কথা। এমনি একটি দেবতার পূজা বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে রাঢ়দেশে—কাটোয়া অঞ্চলে। দেবীর কোন মূর্তি এখন নেই, আগে ছিল কিনা তাও ঠিকমত জানা নেই। দেবীর নাম ফুল্লরা আর দেবস্থানটির এবং গ্রামটির নাম অট্টহাস। এখানকার দেবীপূজার বৈশিষ্ট্য হল 'শিবাভোগ' অর্থাৎ শিয়াল খাওয়ানো।

মহাদেবীর শৃগালরূপের (খাঁটি মানবজান্তব) উল্লেখ হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরানো পুরাণে কৃষ্ণজন্ম প্রসঙ্গে আছে। মহাদেবী শৃগালরূপ ধারণ করে বসুদেবকে যমুনার মধ্যে দিয়ে পথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন গোকুলে যাবার জন্যে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের কালী-চামুণ্ডা অল্প-স্বল্প পরিবর্তন নিয়ে মানবজান্তবতা একেবারে পরিত্যাগ না করে এখানকার কালী ঠাকুরে দাঁড়িয়েছেন। আর মানবজান্তবতা একেবারে ঝেড়ে ফেলে লোকসংস্কৃতিতে—শিল্পে ও পূজাকর্মে—তিনি পরিণত হয়েছেন কঙ্কালসার শীর্ণমূর্তি দাঁত বার করা ডাকিনী মূর্তিতে। নাম তাঁর চর্চিকা (মানে, চাঁচা ছোলা), রঙ্কিণী (মানে, শীর্ণকায় ক্ষুধার্ত নারী) অথবা কঙ্কালী (মানে, কঙ্কালসার নারী)। চামুণ্ডা নামও চলে।

দ্বিতীয় কালীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললুম। তৃতীয় কালীর সম্বন্ধে কিন্তু প্রথম কালীর মতো বলবার বেশি কিছু নেই। এই তৃতীয় কালীর উল্লেখ করেছেন কালিদাস। কুমারসম্ভবে শিব যখন পার্বতীকে বিবাহ করতে হিমালয়-ভবনে যাত্রা করেছিলেন তখন বরযাত্রীর মধ্যে ছিল নরাস্থি-অলঙ্কার পরা কালী।

কালী কপালাভরণা চকাশে॥

এ কালী শিবের গণের একজন, নন্দীভৃঙ্গীর মতো। সুতরাং অপদেবতা।

ধর্মঠাকুরের ইতিহাস

এক

ঋগ্‌বেদে যম ও যমী বাংলার লৌকিক পুরাণে ধর্ম ও মনসা (কেতকা)। যম-যমী মানে যমজ ভাইবোন। ধর্ম-কেতকাও তাই। ধর্মের শরীরাংশ থেকে কেতকার উদ্ভব যেমন হিব্রুপুরাণে আদম থেকে ইবার উৎপত্তি। বাংলার লৌকিক পুরাণে সৃষ্টিপত্তনে ধর্ম-কেতকার যম-জীবনের গোড়ার কথা নেই। আছে এইটুকু যে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু সংসার করা হয় নি। বিয়ের পরেই ধর্মঠাকুরের বৈরাগ্য উদয় হয়, তিনি বিবাগী হয়ে চলে যান তপস্যা করতে। তারপরে আর কেতকার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। এই কাহিনীর মধ্যে যেটুকু অস্ফুট আছে সেটুকু ঋগ্‌বেদের যমযমী-সূক্ত (১০.১০) পূর্ণ করেছে। অর্থাৎ ধর্মের কোন ইচ্ছা ছিল না এই অবৈধ ও অসঙ্গত বিবাহে, কেবল কেতকার নির্বন্ধেই তা হয়েছিল। (কেতকা-মনসা নামের মধ্যে এর ইঙ্গিত আছে। কেতকা শব্দটি কেত শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত, কেত মানে বাসনা কামনা। আর মনসা এসেছে মনস্‌ থেকে, সে শব্দের অর্থও তাই। পরবর্তী কালের ধর্মপূজার অনুষ্ঠানে এঁর নাম রয়ে গেছে কামিনী। এখানেও কাম।) ঋগ্‌বেদের সূক্তে দেখি যে যমী উতলা হয়ে চাইছেন যমকে ভর্তারূপে। কিন্তু যম কিছুতেই রাজি নন। বললেন, 'রাত্রির পর রাত্রি কাটবে আমাদের দিনের পর দিন, সূর্যের চোখ বুজবে খুলবে, দ্যৌ আর পৃথিবী চিরকালের সঙ্গী ও বন্ধু, আর তাদের সামনে যমী করবে যমের সঙ্গে অবৈধ আচরণ, তাও কি কখনো হয়।'

রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎ
সূর্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধূ
যমীর্যমস্য বিভৃয়াদজামি।

এর পরের কথা বেদে অস্ফুট রয়ে গেছে কিন্তু তার অনুবৃত্তি রয়েছে ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে। বড় মর্মাহত হয়ে তিনি ঘর ছেড়েছিলেন।

ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে পাই যে ধর্মের বিষ (প্রাচীনতম অর্থে, রেতস্) পান করে কেতকা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিদেবকে জন্ম দিয়েছিলেন। একথা

বেদে যম-যমীর প্রসঙ্গে নেই। তবে এর একটু আভাস আছে সৃষ্টি-উপক্রম প্রসঙ্গে (১০, ১২৯. ৪ ঋখ)। 'তখন আগে বেরিয়ে এল কাম, যা ছিল মনের প্রথম রেতঃ।'

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

যমের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ এইখানেই শেষ নয়। আরো আছে।

বল্লুকায় যেখানে প্রথমে ধর্ম পরে তাঁর পুত্র ত্রিদেবা তপস্যা করেছিলেন তার কাছে ছিল এক বট গাছ। ধর্মকে বহন করে ভ্রমণক্লান্ত উলূক এই গাছে বিশ্রাম করেছিল। ঋগ্‌বেদের এক সূক্তেও যমের পত্রবহুল বৃক্ষের উল্লেখ আছে (১০. ১৩৫. ১ ঋখ)। সে পত্রবহুল গাছের তলায় দেবতাদের সঙ্গে যম সোম (?) পান করতেন।

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে
দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।

ধর্মঠাকুরের নামটি নিয়ে অনেক কল্পনা-জল্পনা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের পাদপীঠ কূর্ম। কচিৎ কূর্ম তাঁর প্রতীকও। এর থেকে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেছেন যে ধর্ম শব্দটির মূলে ছিল কূর্মবাচক অনার্য (কোল) শব্দ "দড়ম্"। "দড়ম্" বা "দরম্" থেকে 'ধর্ম' হওয়া নানা দিক থেকে দুরূহ। ধর্মঠাকুরের নাম আধুনিক নয়। এবং গোড়া থেকেই যম 'ধর্মরাজ'। ধর্মঠাকুরের নামের শেষাংশ 'রায়' সেই নামাংশ বহন করে চলেছে। দেবতাদের মধ্যে প্রধানত দুজনকে রাজা বলা হয়েছে ঋগ্‌বেদে, যমকে আর বরুণকে। পরলোক-পথিককে উদ্দেশ করে বেদের ঋষি বলেছেন, 'স্বধায় মত্ত রাজা দুজন যম আর বরুণকে তুমি দেখতে পাবে' (১০. ১৪. ৭)।

উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা
যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্॥

ধর্মঠাকুরের মধ্যে যম বরুণ দুজনেই আত্মগোপন করে রয়ে গেছেন।

যমকে ধর্মরাজ বলা হয়েছে মহাভারতে পুরাণে। এ নাম ঋগ্‌বেদে একবার আছে ("যমরাজ্ঞঃ")। পুরানো বৌদ্ধ সাহিত্যেও এ নাম অজ্ঞাত নয়। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত সম্পাদিত গিলগিট পুঁথিতে (ষষ্ঠ শতাব্দী) পাই,—"যমস্ত

ধর্মধরাজস্ত," "যমোঽপি ধর্মরাজঃ"। ধর্মরাজ নামের সূত্র এবং তাঁর গ্রামদেবত্বের ইঙ্গিত রয়েছে ঋগ্বেদের একছত্রে (১. ১৭. ২২ গ)। 'ধর্ম হয়েছেন গ্রাম্যবাসীর রাজা'।

ধর্মাত্মবদ্ বৃকতম্ভ রাজা

ঋগ্বেদে (আবেস্তায়ও) যম প্রথম মর্ত্য। তিনিই প্রথম মৃত্যু বরণ করেছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ দেবতার মধ্যে গণ্য হয়েছিলেন। বেদে যমের মৃত্যুর উল্লেখমাত্র আছে।[১] বাংলায় সৃষ্টি-পত্তনে গল্পটি পুরোপুরি দেওয়া আছে। বাংলা কাহিনীর কিছু রূপান্তর পাওয়া যায় কোন কোন আদিবাসীদের মধ্যে। আসাম অঞ্চলে পাই গোরুর মৃতদেহ রূপে ধর্মের ছলনা। এর থেকে মনে হয় কাহিনীটি খুবই প্রাচীন এবং খুব প্রাচীন কালেই এই কাহিনী বৈদিক আর্যদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি কাহিনীর সূত্রও অনার্যদের (সম্ভবত অস্ট্রিকদের) কাছে পাওয়া।

এখন ধর্মঠাকুরের বরুণত্বের আলোচনা করি। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যঘটিত কাহিনীর মধ্যে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্র উপাখ্যান। এটি ধর্মমঙ্গলে আছে ধর্মপুরাণেও আছে। আর আছে বরুণের মাহাত্ম্যকাহিনীরূপে প্রাচীনতম বৈদিক গদ্য গ্রন্থ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে। ঐতরেয়-বলেছে: ইক্ষ্বাকুবংশীয় বেধসের ছেলে রাজপুত্র হরিশ্চন্দ্র ছিলেন অপুত্রক। বরুণের অনুগ্রহে তাঁর ছেলে হল রোহিতাশ্ব। কথা ছিল অপুত্রক নাম ঘুচলে পরে রাজা পুত্র বলি দিয়ে বরুণের পূজা করবেন। পূজার কাল হলে রাজা কেবলি সময় নেন, আর একটু বড় হোক আর একটু বড় হোক বলে। অবশেষে যখন আর ঠেকানো অসম্ভব হয়ে উঠল তখন দৈববাণীর আদেশে রোহিতাশ্ব ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলেন। যেখানে যান সেখানে শোনেন দৈববাণী, চলো চলো এগিয়ে চলো। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি পুরানো কবিতা ("গাথা") উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলি ভারি চমৎকার, যেন যাযাবর আদি-আর্যদের চলতি পথের গান। সে গানের ধুয়া "চরৈবেতি", চলো চলো।

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলেগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ চরৈবেতি॥

—'যে চলে তার পায়ে ফোটে ফুল, তার আত্মা হয় বিস্ফারিত কৃতার্থ। সব পাপ তার ঝরে পড়ে প্রপথে, পরিশ্রমে হত হয়ে। চলো চলো।'

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্ চরৈবেতি ॥

—'যে চলে সে মধু পায়, পায় স্বাদু ফল। দেখ সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব, যিনি চলতে চলতে তন্দ্রাগত হন না। চলো চলো।'

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্ চরৈবেতি ॥

—'শুয়ে থাকলে তার পরাজয়, যে উঠবার উদ্যম করে তার দু পোয়া লাভ। উঠে দাঁড়ালে তার লাভ তিন পোয়া। ষোল আনা পায় যে চলে। চলো চলো।'

রোহিতাশ্ব তো পালিয়ে গেল, এখন বরুণের রোষ এড়ানো যায় কিসে। বরুণের রোষে রাজা উদরীতে ভুগছেন। হরিশ্চন্দ্রের ঋষি-পুরোহিত পরামর্শ দিলেন, অপরের ছেলে কিনে এনে বদল দাও। রাজা তাই করলেন। দরিদ্র ঋষি অজীগর্তের ছিল তিন ছেলে। তাঁরা একটিকে বেচতে রাজি হলেন। বাপ বললেন বড়টি বাদ, মা বললেন ছোটটি ছাড়া। মেজ শুনঃশেপকে রাখতে কেউই চাইলেন না। সুতরাং সেটিকে কিনে আনা হল। বলিদানের পূর্ব-মুহূর্তে ঋষিপুত্র কাতর হয়ে বরুণের স্তুতি করতে লাগলেন। সে স্তুতি ঋগ্‌বেদের একটি প্রসিদ্ধ সূক্ত (১. ২৪)। শুনঃশেপ শুরু করলেন একে একে দেবতাদের বন্দনা করতে।

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং
মনামহে চারু দেবস্য নাম।
কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ
পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥

—'কোন দেবের, অমরদের মধ্যে কার চারু নাম আমরা নিই এখন। কে আমাদের ছেড়ে দেবে আবার মহান্ মুক্তিতে যাতে দেখতে পাব আমি বাপকে মাকে।' শেষে বরুণের কাছে নির্বন্ধ,

শুনঃশেপো হি অহ্বদ্ গৃভীতঃ
ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্
বিদ্বাঁ অদব্ধো বি মুমোক্তু পাশান্ ॥

—'শুনঃশেপ ডাকছে আদিত্যকে বন্দী হয়ে খোঁটায় তিন ঠাঁই বাঁধা হয়ে।

এখন রাজা বরুণ একে দিন ছেড়ে। তিনি জানেন কোনো অপরাধ করা হয় নি। বন্ধন খুলে দিন তিনি।' শুনঃশেপের পাশ তখন ধীরে ধীরে খুলে পড়ল।

বাংলার কাহিনীতেও হরিশ্চন্দ্র রাজার ছেলে লুইচন্দ্র বা লুইয়া (<লোহিয়া <রোহিতাশ <রোহিতাশ্ব) ধর্মের কাছে মানত করে পাওয়া। ধর্মঠাকুরের শর্ত ছিল, বড় ছেলেকে বলিদান দিতে হবে। ছেলে বড় হল। রাজারানী মানতের দায় এড়িয়ে চলেছে। ধর্মঠাকুরও ভুলে গিয়েছিলেন। বিপদ ডেকে আনলে লুইয়া নিজেই। একদিন সে বাঁটুল ছুঁড়ে পাখী মারছিল। এক বাঁটুল লাগল ধর্মের বাহন উলূকের গায়ে। উলূক ধর্মের কাছে নালিশ করলে। ধর্মের মনে পড়ে গেল "সেই লুইচন্দ্র বটে আমার মানান"। চললেন তিনি হরিশ্চন্দ্রের বাড়িতে মানান নিতে। রানী টের পেয়ে ছেলেকে তার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিবেশী ধর্ম ভোলবার নন। তাঁর নির্বন্ধে ছেলেকে আনতে হল এবং তাকে কেটে তার মাংস রান্না করতেও হল। সে মাংস মুখে তোলবার পূর্বমুহূর্তে সন্ন্যাসী নরম হলেন। নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে লুইয়াকে বাঁচিয়ে দিলেন।

বেদের কাহিনীটি শুধু হরিশ্চন্দ্রের গল্পেই পর্যবসিত নয়। ধর্মের পূজাযজ্ঞেও অনুবৃত্ত হয়ে এসেছে। ধর্মের ঘরভরা গাজনে শাদা ছাগল বলিদান দিতে হয়। সেই ছাগল কিছু দিন ধরে পুষতে হয়। তার এক পায়ে লোহার বেড়ি থাকে। এই পাঁঠাকে বলে লুয়ে। নামটির উৎপত্তি একাধিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন পায়ে লোহার বেড়ি ("লোহ") থেকে। আমি বলি এটি রোহিতাশ্ব নামের পরিণতি হওয়াও সমান সম্ভব। পায়ের বেড়ির তাৎপর্য দুদিক দিয়ে। এক, বরুণের পাশের অনুকল্প, দুই, যমের দাড়ুকার (বৈদিক "পড্‌বীশ"—পায়ের বেড়ির) প্রতীক। (একপুত্রবতীর অথবা মৃতবৎসার পুত্রের পায়ে সরু লোহার বেড়ি কিংবা ডান হাতে নোয়া দেওয়ার রীতির মূলও এখানে।)

ধর্মঠাকুরের পূজাযজ্ঞে ঠাকুরকে পাই রাজার মত, রাজসভাধিষ্ঠিত। আগেই বলেছি বেদে যে কয়জন দেবতাকে রাজা বলা হয়েছে তার মধ্যে যম আর বরুণ প্রধান। এ দুজনের মধ্যে আবার বরুণেরই প্রাধান্য। বেদে শুধু বরুণকেই বলা হয়েছে "সম্রাট" অর্থাৎ অধিরাজ। সুতরাং ধর্মের গাজনে যে বরুণের স্বরূপ বেশি প্রকটিত হবে তা অস্বাভাবিক নয়।

ঘরভরা (গৃহভরণ) পুজোরই অঙ্গ, পুজো হলেই ঘর ভরে। গাজনের অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশ নেন অথবা উল্লিখিত হন তাঁদের নাম থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা মূলে ছিলেন রাজসভার পদিক। যেমন ধামাৎকর্নি ("ধর্মাধিকরণিক," প্রধান বিচারক), শান্তিবিগ্রহী ("সান্ধিবিগ্রহিক," সন্ধি ও বিগ্রহ করবার অধিকার আছে এমন মন্ত্রী), পড়িহার ("প্রতীহার", সভারক্ষী), মহাপাত্র (অমাত্য), পট্টমহাদেবী (প্রধান মহিষী), কোঞরসাঞি ("কুমারস্বামী" অর্থাৎ কুমারামাত্য), পাহড়সাঙ্গই ("প্রাঘুটসংঘপতি", বিদেশী আগন্তুকদের তত্ত্বাবধায়ক), ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাজন অনুষ্ঠানের পুরানো নাম ছিল সাংজাত। কথাটি এসেছে সংযাত্রা (এক সঙ্গে বহু ব্যক্তির নৌকা করে যাওয়া) থেকে। একদা এমনি করে ধর্মের পুরানো মন্দিরে ("পুরানো দেহারা") গিয়ে ঠাকুরের পূজা করা হত। যাওয়া হত নৌকা করে নদী দিয়ে। কোথাও কোথাও সমুদ্রের উল্লেখ আছে। স্থানটির নাম চাঁপাই। কোথাও কোথাও জাজপুরের নাম আছে। যদি সত্যসত্যই কোন পুরানো দেহারায় গিয়ে এমনি করে ধর্মের পূজা হত তবে তা কোনারক হওয়া অসম্ভব নয়। (ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতাও বটেন।) তবে এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা অযৌক্তিক।

বৈদিক কালে এমনি করে বরুণেরও সাংজাত হত। তার উল্লেখ আছে মৈত্রায়ণী-সংহিতায় (২.৫.৬)। এই বর্ণনায় লুয়ে পাঁঠার ইঙ্গিত আছে।

> প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তা এনং সৃষ্টা অত্যমন্যত। তা অতিমন্যমানা বরুণেনাগ্রাহয়ৎ। তা বরুণগৃহীতাঃ কৃষ্ণঃ পেত্বোঽধ্যস্কন্দৎ। তস্যাগৃহায় পাদমগৃহ্ণাৎ। তস্য শফঃ প্রাবৃহত। স একশিতিপাদভবৎ। তমবোচদ্ অয়ং বাবাসাং প্রজানাম্ অবরুণগৃহীতোঽনেনেমাঃ প্রজা বরুণান্ মুঞ্চানীতি। তং বারুণমালভত। ততো ইমাঃ প্রজা বরুণাৎ প্রামুচ্যন্ত। ...দ্বীপে যাজয়েদ্। এতা বৈ প্রত্যক্ষং বারুণীর্যদাপঃ। যে বা এতদ্ যোনৌ প্রত্যক্ষং বরুণমবযজতি। সমন্তমাপঃ পরিবহন্তি রক্ষসামপবাধায়।

—'প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেন। সৃষ্ট প্রজারা তাঁকে অবজ্ঞা করলে। প্রজাপতি অবজ্ঞাকারী তাদের বরুণকে দিয়ে ধরিয়ে দিলেন। বরুণগৃহীত তাদের কালো ভেড়া অধিস্কন্দন করলে। অনুধাবন করে (প্রজাপতি) তার পা ধরলে। তার খুর ফাঁক হল। সে এক-পা-শাদা হল। তাকে বললে, প্রজাদের মধ্যে এইই বরুণগৃহীত নয়, একে দিয়ে বরুণের কাছ থেকে প্রজাদের

ছাড়িয়ে নিই। সেই বরুণ-উদ্দিষ্ট (পশুকে) বলি দিলে। তখন সব প্রজা বরুণের কাছ থেকে মুক্তি পেলে।...দীপে যজ্ঞ করতে হয়। এই যে স্রোতের জল এ প্রত্যক্ষ বারুণী। এতে যেন প্রত্যক্ষ নিজের ঘরে বরুণকে যজন করা হয়। চারদিকে জল বয় রক্ষীদের (বা রাক্ষসদের) ঘিরে (বা তফাতে) রাখবার জন্য।'

গাজনের সাহুড়ঘাটা পর্ব জলোৎসবের মত। এখানেও বরুণের পূজার ইঙ্গিত। ধর্মের পূজায় মদ দেওয়া নিষিদ্ধ নয়। এতেও বরুণের ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক সূচিত।

ধর্মের ঘট ভরে নিয়ে পবিত্রভাবে এনে ধর্মের কাছে প্রতিষ্ঠা করা হয় এই সময়ে। ধর্মঘটের নাম 'কামিনী-কুণ্ড'। ইনিই বারুণী। বিসর্জন হলে পর ভক্তিয়ারা ঘটের জল (বারুণী? সোম?) পান করে।

হরিশ্চন্দ্র-কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাহিনীতে যেমন ধর্মমঙ্গল—ধর্মপুরাণের কাহিনীতেও তেমনি রোহিতাশ্ব-লুইয়ার ঘর ছেড়ে পালাবার সমরকার কোন বৃত্তান্ত নেই। গোড়ায় হয়তো কিছু ছিল না কিন্তু পরে নিশ্চয়ই কিছু কাহিনী গাঁথা হয়েছিল। এমনও অসম্ভব নয় যে ধর্মমঙ্গলের লাউসেন-কাহিনীতে তারই পরিণতি। লাউসেন নামের সঙ্গে লুইয়া বা লুইচন্দ্র নামের সাদৃশ্য আসাভাসাই। নাম দুটির 'সেন' আর 'চন্দ্র' অংশ যথাক্রমে পিতৃনাম থেকে এসেছে। লাউসেনের বাপ কর্ণসেন, লুইচন্দ্রের বাপ হরিশ্চন্দ্র বা হরিচন্দ্র। 'লাউ' এসেছে সম্ভবত রাহু থেকে। লাউসেনের জন্ম ধর্মের বরে। তবে তাঁকে বলিদান দিতে হয়নি প্রচলিত কাহিনীতে। আসলে হয়তো অন্যরকম ছিল। হাকন্দে লাউসেনের স্বহস্তে শিরশ্ছেদ বোধ হয় প্রথমে ছিল ধর্মের মানান-শোধ। তার পরে তাতে কিছু তান্ত্রিক সূর্যোপাসনার ব্যাপার যুক্ত হয়েছে। সেকথা পরে বলছি। রাহুর সূর্যগ্রাস-ব্যাপারের সঙ্গেও সংস্রব থাকতে পারে।

লাউসেন ধর্মের সেবক, তাঁর বরপুত্র। তবে সে ধর্মঠাকুরের কালপেঁচা (কাক, উলূক: নয়। সে হনুমান্—মহামল্ল, যে সূর্যকে বগলদাবা করেছিল। লাউসেনের এডভেঞ্চারগুলি লৌকিক গল্প সন্দেহ নেই, কিন্তু সে গল্পগুচ্ছের ভিতর দিয়ে চলেছে লাউসেনের অবিরাম পর্যটন। ধর্মঠাকুর একদিক দিয়ে যেমন তাকে 'চরৈবেতি' করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অপরদিকে তেমনি তাকে কাবু করবার জন্যে বাধার পর বাধার সৃষ্টি করে চলেছেন। লাউসেনের

ঠাকুর বেদের বরুণের মত সর্বাধ্যক্ষ, তাঁর চর সর্বত্রগামী। মাহুতা (বা মহামদ) যেন বরুণেরই এজেন্ট, যদিও কৃষ্ণলীলার সঙ্গে সাম্য রাখতে গিয়ে তাকে মাতুল বলতে হয়েছে।

'মাহুত্তা' নাম নিয়ে গোলমাল আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যে নামটা 'মামুদ' বা 'মহম্মদ' এই বিদেশী নাম থেকে এসেছে বাংলা '-ইয়া' প্রত্যয়ের যোগে। আসলে তা নয়। গৌড়রাজের মহামন্ত্রী মাহুতা প্রায়ই 'মহাপাত্র' বলে উল্লিখিত। মহাপাত্রের প্রতিশব্দ 'মহামাত্র'। মহামাত্রের দুটি মানে—মহামন্ত্রী ও হস্তিচালক। শেষ অর্থে শব্দটি বাংলায় হয়েছে 'মাহুত'। মাহুতা এর থেকে এসেছে ধরা যেতে পারে। তবে গণ্ডগোল দ-কারে। আপাতত এখানে মামুদিয়া বা মহম্মদিয়া এইরকম বিদেশী নামের প্রভাব স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ধর্মমঙ্গল-কাহিনীতে এমন কিছু নেই যাতে কাহিনীকে তুর্কী অভিযানের পরবর্তী বলা যেতে পারে। অথচ নিরঞ্জনের রুষ্মা থেকে দেখছি যে মুসলমান-শক্তি তখন দেশে বেশ জেঁকে বসেছে। সেকশুভোদয়ায় লক্ষ্মণসেনের সভায় শেখ জালালুদ্দীনের যেমন প্রতিপত্তি বর্ণিত হয়েছে ধর্মমঙ্গলে গৌড়রাজসভায় মাহুতার প্রতিপত্তি প্রায় সেই রকমই। সেকশুভোদয়া ষোড়শ শতাব্দীর রচনা, কিন্তু এর মূলে ছিল প্রাচীনতর পদ্য রচনা। সে রচনা হলায়ুধমিশ্রের লেখা হতেও পারে। মোট কথা লক্ষ্মণসেনের বা তাঁর পুত্রের রাজসভায় কোন এক প্রভাবশালী মুসলমান সদস্যের অস্তিত্ব ঐতিহ্যবাহী ছিল মনে করতে পারি। সেই ঐতিহ্যসূত্রেই মাহুতার নামবিকৃতি। তবে সমগ্র কাহিনীটি মুসলমান অধিকারের পূর্বেই দৃঢ়রূপ নিয়েছিল। গৌড়রাজ নিঃসন্তান। লাউসেন তাঁর শ্যালিকাপুত্র এবং উত্তরাধিকারী। লাউসেন খতম হলে মাহুতার সিংহাসন-অধিকার অবারিত। এই জন্যেই তার জিঘাংসা লাউসেনের প্রতি।

ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে তাঁর বরুণস্বরূপের নিরাবরণ প্রকাশ দেখি একবার—গৌড়ে অঘোরবাদল সংঘটনে। বরুণ জলাধিপতি। জামতি ও গোলাহাট এই দু পালায় লাউসেনের বিপন্ন ও বন্দী হবার গল্প আছে। জামতিতে অসতী নারীর ছলনায় আর গোলাহাটে বেশ্যার সঙ্গে জুয়া খেলায় বিপত্তি ঘটেছিল। এ দুটি গল্প প্রাচীন বলে মনে হয়। আর মনে হয়, এখানে লাউসেন যেন বেদের সেই বিপন্ন বরুণভক্তের প্রতিনিধি, যিনি লাউসেনের মতই বন্দীদশায় পড়ে কাতর হয়ে দেবতার কাছে ঘাট মেনেছিলেন।

ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা
সুরা মন্যু বিভীদকো অচিত্তিঃ।
অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে
স্বপ্নশ্চনেদনৃতস্য প্রয়োতা ॥

—'হে বরুণ, (এ দশা) নিজের বুদ্ধির ফেরে নয়। এ মোহছলনা—সুরা, ক্রোধ, দ্যুত, অবিবেচনা। বড় হয়েছে ছোটর কাছে অপরাধী। ঘুমেও এ অপরাধের এড়ান নেই।'

"অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে।"—লাউসেন ছোটভাই কর্পূরধবলের পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নি বলে কষ্ট পাচ্ছেন। এখানে কি এমনি কিছু ব্যাপারের ইঙ্গিত?

ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স্ হাকন্দ বা পশ্চিমোদয় পালায়। লাউসেনকে পশ্চিমোদয় করাতে হবে। বড় কঠিন কাজ। লাউসেন রীতিমত ধর্ম-পূজায় বসলেন ধর্মের মূলস্থানে। কিন্তু কিছুতেই ঠাকুরের টনক নড়ে না। অবশেষে নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে ধর্মকে নিবেদন করলেন। তখন ধর্ম বিচলিত হলেন। লাউসেনকে জীইয়ে দিয়ে সূর্যের পশ্চিম-উদয় দেখালেন। বেদের বরুণের মত ধর্মমঙ্গলের ধর্ম সূর্যের অধ্যক্ষ, "বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ"। লাউসেনের আত্মহত্যায় চারিদিকে, "আক্রন্দ" পড়েছিল, প্রাকৃত-পৈঙ্গলের একটি কবিতার ভাষায় "হাকন্দ পলে"। তাই এই ঘটনা বা অনুষ্ঠানের নাম হাকন্দ, উচ্চারণ-বিকৃতিতে হাকণ্ড। এই হাকন্দের ঘটনা সূর্যপূজা-ঘটিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান-একরকম ছিন্নমস্তা-সাধন। এ অনুষ্ঠানের অনুরূপ প্রক্রিয়া শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাধনমালায় গ্রথিত (২১২) বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুণাকরগুপ্ত রচিত যমারিসাধনের মধ্যে মিলবে। এই সাধনের বলিমন্ত্রে যমের সঙ্গে বরুণেরও উল্লেখ আছে। যমের সঙ্গে সূর্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বেদে-আবেস্তায় যম বিবস্বানের পুত্র। ধর্মমঙ্গলের হাকন্দ-অনুষ্ঠানের দেবতার সঙ্গে যমের প্রত্যক্ষ সূত্র অন্তত একটা আছে। বেদে ও আবেস্তায় যমের অনুচর ও দূত কুকুর। সাংঘাত্রিক লাউসেন যখন হাকন্দে যাচ্ছিলেন তখন এক কুকুর তাঁর সঙ্গ নেয়। (এই প্রসঙ্গে ধর্মরাজ-পুত্র যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথে কুকুর-সহযাত্রীর কথা স্মরণীয়।) মানিকরাম গাঙ্গুলি সে কুকুরের এই বর্ণনা দিয়েছেন—

লোহিতবরণ বেটা নোটা দুই কান।
পরিমল দন্তপাতী পিঙ্গল নয়ান ॥

এই "বাটুয়া" কুকুর পশ্চিম-উষয়ের সময় পর্যন্ত হাজির ছিল। তুলনা করুন ঋগ্‌বেদের ঋষির প্রার্থনা যমের কুকুরের উদ্দেশে—

উরুণসাবসুতৃপা উদুম্বলৌ
যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যম্ দৃশয়ে সূর্যায়
পুন র্দাতাম্ অসুমদ্যেহ ভদ্রম্॥

—'স্থুলনাস, প্রাণলোভী, উদুম্বল (?) এই দুই যমের দূত জনমধ্যে বিচরণ করে। তারা যেন আজ এখন আমাদের আবার দেয় ভদ্র জীবন যাতে সূর্যকে দেখতে পাই।'

কাহিনীতে ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন। তবে তাঁর পায়ের উল্লেখ আছে। সেই পায়ের পূজা হয়। (অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রচলিত হরির-চরণ পূজা ধর্মের পা-পূজারই এক পরিণতি।) বেদের বরুণ-দেবতার মুখ-হাত-চোখের সঙ্গে পায়েরও উল্লেখ আছে। বরুণের মত ধর্মেরও ঘর। দু দেবতাই ধৃতব্রত এবং তাঁদের ব্রত অলঙ্ঘ্য। বরুণের নামান্তর 'ধবল', ধর্ম নিরঞ্জন। বরুণের শ্বেত নির্ণিক্, ধর্মের ধবল বসন। বরুণ মায়াবী, "ধর্মের বিষম মায়া কহনে না যায়।" বারুণীর সঙ্গে ধর্মঘটের সম্ভাব্য যোগ আগেই দেখিয়েছি।

দুই

ধর্মঠাকুর রাজদেবতা, তাই স্থানীয় ধর্মঠাকুরের নামের শেষ অংশ 'রায়'। সব চেয়ে সাধারণ নাম বাঁকুড়ারায় (নামটির মানে আছে। বাঁকুড়া মানে দুর্ধর্ষ, নাছোড়বান্দা। আধুনিক বাকড়', বাগ্‌ড়া দেওয়া।)। তা ছাড়া পাই—কালুরায়, খুদিরায় (ক্ষুদ্র থেকে, সম্ভবত প্রতীকের আকৃতি অনুসারে), বুড়ারায়, চাঁদরায়, দলুরায়, জগৎরায়, মেঘরায়, মোহনরায়, শ্যামরায়, সুন্দররায়, ইত্যাদি। রায়ের বদলে 'সিংহ'ও পাওয়া যায়। যেমন ফুলুইয়ের ফতেসিংহ, বেল্‌টের শীতলসিংহ। অন্য নাম পাই—স্বরূপনারায়ণ ও রূপনারায়ণ। এ দুটি নাম ধর্মঠাকুরের বিশিষ্ট নাম নয়। কালাচাঁদও তাই। সবচেয়ে অদ্ভুত নাম কাঁকড়াবিছা। মানিকরাম গাঙ্গুলি তাঁর কাব্যে বিভিন্ন স্থানের ধর্মঠাকুরের বন্দনার মধ্যে লিখেছেন—

দেপুরে জগৎরায়ে জোড় করি কর।
গোপালপুরের কাঁকড়াবিছায় বন্দি তার পর॥

একাধিক ধর্মঠাকুরের নাম পাওয়া যায় যাত্রাসিদ্ধি। এ নামটির ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস কূর্মপূজার সঙ্গে বিজড়িত।

অনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের প্রতীক গোল অথবা লম্বা নয় এমন শিলাখণ্ড। কোন কোন ধর্মশিলায় কূর্মের আদল আছে। সেটা আকস্মিকও হতে পারে, সুচিন্তিতও হতে পারে। আবার অনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের প্রতীক পাথরে খোদাই বা ধাতুনির্মিত কূর্মমূর্তি। (এরকম কূর্মমূর্তি প্রায়ই প্রাচীন নয়।) সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বেশী করে এই ধরনের মূর্তি খোদাই করা হত পূজার উদ্দেশ্যে। খোদাই করা কূর্মমূর্তিগুলি প্রায়ই ধর্ম-ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রতীক নয়, কেননা সে সব মূর্তির পিঠে ধর্মের পা আঁকা আছে। সেই "ধর্মের পাদুকা"-ই ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক।[২]

উলূকবাহনং ধর্মং .সবং হেতোময়াত্মকম্।

ইদানীং কূর্মপৃষ্ঠে তু দিব্যরূপং নমোহস্তু তে॥

সেকালে ধর্মপণ্ডিতেরা গলায় ধর্মের পাদুকা ঝুলিয়ে রাখতেন। সময়ে অসময়ে তাঁরা সেকালে সেই পাদুকা পূজা করতেন। মানিকরাম গাঙ্গুলি লিখেছেন,

বৃক্ষমূলে বসিলাম রেখে খুঙ্গিপুঁথি

একজনা পণ্ডিত আসিএ উপনীতি॥

ধর্মের পাদুকা দুটি বাঁধা আছে গলে।

বসিলা বিশ্রাম আশে সেই বৃক্ষতলে॥

মানিকরামকে পণ্ডিত উপদেশ দিলেন—

পদ্ম তুল্যা পাদুকা সম্প্রতি কর পূজা।

মনে হয়, কূর্মপৃষ্ঠে পাদুকা-অঙ্কনের রীতি গলায় ঝোলান পাদুকা পূজার স্থাবর ও আঁকালো সংস্করণ।

কখনো কখনো কূর্ম স্থাপিত হয়েছে খুরো-দেওয়া সিংহাসনে।

ধর্মঠাকুর গোড়ায় কূর্মদেবতা ছিলেন না। তবে তাঁর পূজায় কূর্মদেবতা-পূজা এসে মিশেছে। কূর্মদেবতা সূর্যদেবতা এবং জলদেবতা। ধর্মঠাকুরও অনেকটা তাই। ধর্মঠাকুরের বুটপরা অশ্বারোহী সিপাইমূর্তির বর্ণনা কোন কোন ধর্মপুরাণ পুঁথিতে আছে।

হাঁসা ঘোড়া থাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা।

অবশেষে বোলাইলে গোউড়ের রাজা॥

এমনি সূর্যমূর্তি অনেক পাওয়া গেছে। এ মূর্তি ও তার পূজা এদেশে চালু

করেছিল ইরান থেকে আগত মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা। এই সঙ্গে এবং এই সূত্রে কূর্মপূজারও প্রসার বেড়েছিল বলে মনে করি। তবে তারও আগে এ পূজা অজ্ঞাত ছিল না। বর্ষায় বৃষ্টি না হলে কূর্মপূজার বিধি আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (৪.৩)।

বর্ষাবগ্রহে শচীনাথগঙ্গাপর্বত-মহাকচ্ছ[প]পূজাঃ কারয়েৎ।

শতপথ-ব্রাহ্মণে সূর্যকে কূর্ম বলা হয়েছে। দশ অবতারের মধ্যে কূর্ম দ্বিতীয় অবতার। প্রথম অবতার মীনের কাহিনীও শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। সে কাহিনী যে বাইরে থেকে এসেছে এ কথা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। কূর্ম অবতারের কোন বিশিষ্ট কাহিনী পুরাণে নেই। যা আছে তা পৃথিবী অথবা মন্দর পর্বত ধারণের। পৃথিবী-ধারণের কাহিনী সম্ভবত ধর্মঠাকুরের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কূর্ম যে ধর্মঠাকুরে পাদপীঠ তাও এর সঙ্গে সংযুক্ত।

এদেশে কূর্মপূজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যা কিছু প্রমাণ-ইঙ্গিত পাচ্ছি সে সবই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরেকার। অর্থাৎ এদেশে ঈরানীয় সূর্যপূজা সুপ্রচলিত হবার আগে নয়। কূর্মপূজার না হোক মঙ্গলার্থে কূর্ম পোষার উল্লেখ পাচ্ছি বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়। বরাহমিহিরের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে রাজারা যেমন কুকুর ও কুক্কুট পুষতেন তেমনি কূর্ম-ও পুষতেন। সুলক্ষণ কূর্ম পোষা হত ক্রীড়া-সরোবরে অথবা ইদারায় রাষ্ট্রবিবর্ধনের সুলক্ষণ বলে।

অঞ্জনভৃঙ্গশ্যামতনু র্বা
বিন্দুবিচিত্রোঽব্যঙ্গশরীরঃ।
সর্পশিরা বা স্থূলগলো যঃ
সোঽপি নৃপাণাং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধ্যৈ ॥ ৬৩.২ ॥

—'কাজল বা ভ্রমরের মত শ্যামবর্ণ অথবা বিন্দুর দ্বারা চিত্রিতপৃষ্ঠ অবিকৃত-শরীর কিংবা সাপের মত মাথা ও স্থূল গলা যার এমন (কূর্ম) রাজাদের রাজ্যবর্ধন করে।'

বৈদূর্যত্বিট্ স্থূলকণ্ঠস্ত্রিকোণো
গূঢ়চ্ছিদ্রশ্চোরুবংশশ্চ শস্তঃ।
ক্রীড়াবাপ্যাং তোয়পূর্ণে মণৌ বা
কার্যঃ কূর্মো মঙ্গলার্থং নরেন্দ্রৈঃ ॥ ৬৩.৩ ॥

—'বৈদূর্যবর্ণ মূলকণ্ঠ ত্রিকোণ পৃষ্ঠছিদ্র প্রশস্ত পৃষ্ঠাস্থি—এমন ভালো কূর্মকে রাজা মঙ্গলের জন্ত রাখবেন ক্রীড়া-সরোবরে অথবা জলপূর্ণ কূপে।'

এখানে ধর্মঠাকুরের কূর্ম-প্রতীকত্বের জন্যে যাত্রাসিদ্ধি নামের একটা অর্থ মিলল। সাধারণত কচ্ছপ অযাত্রা বলেই ধরা হয়।

কূর্মকে (প্রতিমা বা প্রতীক নয়) যে একদা পূজা করা হত তার উল্লেখ পেয়েছি কথাসরিৎসাগরে (তরঙ্গ ৮২) সঙ্কলিত বেতাল বর্ণিত ভোজনবিলাসী শয়নবিলাসীর গল্পে। অঙ্গদেশের বৃহদ্বট (বৃহদ্বটু?) গ্রামনিবাসী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বামী পূজা করবেন বলে তাঁর তিন ছেলে সমুদ্র থেকে কূর্ম আনছিলেন,—এই কথা সে গল্পে আছে। অঙ্গ সেকালে বাংলা দেশেরই অংশ ছিল। অতএব বাংলা দেশে কূর্ম পূজার এই এক প্রাচীন নজির পেলুম।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্যপূজার যোগ হওয়ার পর থেকে তিনি হয়েছেন নিরাময়ের—বিশেষ করে ধবল ও কুষ্ঠ রোগের নিরাময়ের-দেবতা। ধর্ম শুভ্র নিরঞ্জন, তাই ধবলত্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে আছে যে গঙ্গা ধর্মকে দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন বলে 'ধবলমুখী' হয়েছিলেন।

ধর্ম রাজরাজেশ্বর, রাজা ঠাকুর। তাই তিনি পূর্ব ভারতে—একদা যেখানে ধর্মদেবতা ও তাঁর পূজা অনুষ্ঠান চলিত হয়েছিল, এখন পশ্চিম বাংলায় (বিশেষ করে বর্ধমান বিভাগে) আজও যেখানে ধর্ম জাগ্রত ঠাকুর—প্রধান গ্রাম দেবতা। একদা তাঁর সহপূজ্যা গ্রামদেবী ছিল, এখনও কোথাও কোথাও আছে। এই গ্রামদেবী মূলে ছিলেন ষষ্ঠী—অর্থাৎ কেতকা-মনসা। পরে তিনি হয়েছেন বিশালাক্ষী চামুণ্ডা ইত্যাদি, দৈবাৎ মনসা রয়ে গেছেন। গ্রামের রাজা ধর্মঠাকুর পূজাবিহীন হয়ে কোথাও কোথাও শিবঠাকুর বলে গৃহীত হয়েছেন, কিন্তু কোথাও বিষ্ণুদেবতায় পরিণত হয়েছেন বলে শুনি নি। ধর্মের গাজন হয়, শিবেরও গাজন হয়—ধর্ম-শিবের এই এক যোগসূত্র। আর এক যোগসূত্র পাই নাথপন্থে। বাংলার নাথপন্থী যোগীদের কোন কোন অনুষ্ঠানে ধর্মপূজার কিছু কিছু প্রক্রিয়া গৃহীত হয়েছিল। [নাথপন্থীরা আসলে নিরীশ্বর, পরে শৈব, এখন অনেকেই বৈষ্ণব। নাথযোগীদের মহাগুরু মীননাথ-গোরক্ষ-নাথের বড় ভাই শিব। শিব ধর্মের ঔরস পুত্র, মীনগোরক্ষ ধর্মের শবজ পুত্র। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে উল্লিখিত পুরুষমেধের সঙ্গে ধর্মদেহের সংস্কারের কিছু মিল আছে। পুরুষের চার অঙ্গ থেকে চতুর্বর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল, ধর্মের

চার খণ্ড থেকে চার সিদ্ধা—মীন, গোরক্ষ, হাড়ি ও চৌরঙ্গি জন্মেছিল। খুলনা জেলায় এবং পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গের স্থানে স্থানে প্রচলিত দেল (অর্থাৎ দেউল) পূজা এখন শিবের চড়ক-অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। ধর্মের গাজনের নামান্তর দেহারা বা দেউল পূজা। অদ্বৈতচরণ দেবনাথ সঙ্কলিত দেলপূজার পাঁচালীতে পাচ্ছি যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অনুরোধে শিব দেল-পূজা করেছিলেন। দেল-পূজার স্থানে পাট-পূজা কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। এ পাট ধর্মের পাট,—(একধারে ধর্ম-সিংহাসন এবং শলা-শয্যা।)

ব্রহ্মা বিষ্ণু হরষিত কহে ত্রিলোচনে।
পূজা কর ধর্মদেবে প্রচার কারণে॥

ধর্মের পূজার জন্যে দেউল তোলা হল।

সুবর্ণের কলস মুকুতার ঝারা।
দেউল নির্মাণ হৈল অক্ষয়-বট তলা॥

দেউল গড়া শেষ হলে

শূন্যে থাকি বলেন ধর্মরায় শুন মহেশ্বর।
মালঞ্চের সৃষ্টি কর থাকুক সয়াল॥

ধর্ম রাজদেবতা, গ্রামরাজ-দেবতা। বর্ধমান বিভাগের যে যে গাঁয়ে ধর্মের পূজা এখনও অনবলুপ্ত সেখানে দেখা যাবে যে ধর্মঠাকুরের নামে ভূম্যধিকারীর (প্রধানত বর্ধমান-রাজের) ভূমি দান করা আছে। গ্রামদেবীর বেলাতেও ঠিক তাই। এ সব স্থানে পূজায় পাঁঠা বলি হলে আগে পাঁঠা পড়ে ভূম্যধিকারীর নামে।

ঐতিহাসিক দলিলে রাজদেবতা ধর্মের উল্লেখ পাচ্ছি প্রথম বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে পাওয়া বিজয়সেনের তাম্রপট্টানুশাসনে (ষষ্ঠ শতাব্দী)। অনুশাসন আরম্ভ হয়েছে ধর্মের বন্দনা করে। (ঐতিহাসিক যাঁরা অনুশাসনটি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা সবাই উদ্দিষ্ট দেবতাকে মহাযান বৌদ্ধ দেবতা লোকনাথ মনে করেছেন।)

···কনাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃতকর্মফলহেতুঃ।
সত্যতপোময়মূর্তি র্লোকদ্বয়সাধনো ধর্মঃ॥

—'যিনি পুরুষের পুণ্যকর্মের ফলহেতু, সত্য এবং তপস্যা যাঁর মূর্তি, ইহলোক পরলোকের যিনি উপায়, সেই (ত্রিলোক-) নাথ ধর্ম (জয়যুক্ত হোন)।'

এই বন্দনা ধর্মঠাকুরের পক্ষে বেশ খাটে। আরও একটা প্রমাণ আছে বলে মনে করি। তাম্রপট্টের শীর্ষে "...রাম বিজয়সেনস্ত" এই নামযুক্ত মোহর আছে। মোহরে এক দেবতার চিত্র। তার তলায় রাজার নাম। বহু অরযুক্ত দীর্ঘায়িত এক চক্র পিছনে করে দ্বিভুজ পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। ডান হাত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত. বাঁ হাত কোমরের কাছে। ধর্মঠাকুর দ্বিভুজ— এইটুকু ছাড়া মূর্তিকে ধর্মঠাকুরের বলবার কোন কারণ নেই। তবে পিছনের চাকাটি লক্ষণীয়! এ চক্র ধর্ম-চক্র, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রের ধর্মচক্র নয়, সে ধর্মচক্র গোল। দীর্ঘায়িত চক্রটির পরিসীমারেখা কূর্মাকৃতি। ধর্মঠাকুরের কূর্ম-প্রতীকের পেটের দিকে অনেক সময় চক্র আঁকা থাকত। এটি বরুণের পাশ হওয়াও সমান সম্ভব। সুতরাং বন্দনা-শ্লোকের দেবতাকে ধর্মরাজ মনে করবার পক্ষে জোরালো যুক্তি আছে।

বাংলাদেশে ধর্মপূজার প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে—

মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥

এ যক্ষ বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা মঞ্জুঘোষ অথবা হিন্দু তান্ত্রিক দেবতা ভৈরব হতে পারে। কিন্তু যেভাবে বিষহরি-চণ্ডী-বাসলী পূজার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে তাতে মনে হয় এ যক্ষ ধর্মঠাকুর ছাড়া আর কেউ নয়। এই প্রসঙ্গে কেন-উপনিষদের যক্ষ স্মরণীয়, যদিও সেখানে মদ্যমাংস দূরের কথা, পূজারও আভাস নেই। কেন-উপনিষদে যক্ষের ছলনা ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে তাঁর ত্রিদেবা পুত্রের ছলনার কথা মনে করায়। মহৎ যক্ষের আবির্ভাব শুনে দেবতারা পাঠালেন অগ্নিকে ব্যাপার জানতে। অগ্নি হাজির হতে যক্ষ বললেন, তুমি কে হে? অগ্নি বললেন, আমি আগুন, সব কিছু পোড়াতে পারি। যক্ষ তাঁর সামনে একগাছি তৃণ দিয়ে বললেন, পোড়াও তো দেখি। অগ্নি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়েও তৃণখণ্ডকে দগ্ধ করতে পারলেন না। লজ্জিত হয়ে দেব-সমাজে ফিরে এলেন। তারপর পাঠানো হল বায়ুকে। তাঁকে দেখে যক্ষ বললেন' কে বট হে? বায়ু বললেন, আমি বায়ু, আমি বেগ দিলে কিছুই অচঞ্চল থাকতে পারে না। যক্ষ তৃণখণ্ড এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাড়াও তো বাপু ঘাসটিকে। বায়ু তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটাকে নড়াতে সমর্থ হলেন না। বায়ু মুখ কালো করে ফিরে এলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং চললেন যক্ষকে দেখতে। ইন্দ্রের আগমনে যক্ষ অন্তর্হিত হলেন। হতাশ হয়ে ইন্দ্র ফিরে আসছেন, পথে

দেখা অপূর্ব শোভাবতী সঙ্গে হৈমবতীর সঙ্গে। তাঁর কাছে ইন্দ্র জেনে নিলেন যক্ষ কে। ধর্মপুরাণের সৃষ্টি কাহিনীতে আছে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ত্রিদেবো জন্মাবার পর বল্লুকায় গেলেন তপস্যারত পিতা ধর্মকে দেখতে। তাঁদের আগমন টের পেয়ে ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

বৃন্দাবনদাসের সমসাময়িক চূড়ামণিদাস তাঁর গৌরাঙ্গবিজয়ে গৌরাঙ্গের গয়াযাত্রা প্রসঙ্গে ভাগলপুরের কাছে ধর্মঠাকুর ও মনসার তৎকালপ্রসিদ্ধ মন্দিরের উল্লেখ করেছেন—

বাহাগলপুর তেজি যাইতে উত্তরে।
দেখিলন্ত ধর্মরাজ মনসার ঘরে॥

তিন

কোন কোন ধর্মপুরাণে সৃষ্টির উপক্রমে নীল ও অনিলের উল্লেখ আছে। "দ্বিজ" লক্ষ্মণের মতে নীল-অনিলের সংযোগে শূন্যবিম্বরূপী আদিদেব ধর্মের উৎপত্তি। লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে ধর্ম-কাহিনীর সঙ্গে নাথ-তত্ত্বের সন্ধি হয়েছে। তাই এখানে—

মন হব অনিল পবন হব নীল।[৩]
শূন্যভরে করতার স্বজিল শরীর॥

ঋগ্বেদের নারদীয় সূক্তের স্বধা-প্রযতির সঙ্গেও নীল-অনিলের মিল হয়েছে। অরণি কাষ্ঠদ্বয়ের মন্থনে যেমন অগ্নির উৎপত্তি এখানেও তেমনি নীল-অনিলের সংযোগে আদিদেবের আবির্ভাব।

দেবতা রূপে নীলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুব ব্যক্ত না হলেও একেবারে লুপ্ত নয়। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের গাজন হয়। তার আগের দিন হয় নীলের পূজা। এখনকার দিনে তা নীলের উপবাস বলে মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। রুদ্রলোহিতের সঙ্গে নীলের সম্পর্ক বাংলার লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে কেমন রূপ নিয়েছিল তার একটু ইঙ্গিত অত্যন্ত অনপেক্ষিত ভাবে পেয়েছি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। রাধা নিজের রূপ-বেশের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন—

খোঁপা পরতেক মোর ত্রিদশ-ঈশ্বর হর
কেশপাশ নীল বিত্তমানে।

এ উপমা থেকে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যায় যে, এখনকার শিবলিঙ্গের গৌরীপট্টই একদা ছিল শিবলিঙ্গের পীঠ নীল, যেমন ধর্মপাদুকার পীঠ কূর্ম।

শিবের আধাররূপে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নীল কোথাও কোথাও নীলাবতী রূপে স্ত্রীদেবতায় পরিণত হয়েছেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে 'নীলা' চণ্ডীরই নামান্তর। কালকেতুর চৌতিশাস্তবে পাই,

নিশুম্ভনাশিনী নীলা নীলপতাকিনী।

নীলতারা, নীলসরস্বতী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীর নামও স্মরণীয়।

নীলের উপবাসের দিন সন্ধ্যায় সন্তানবতী মহিলারা সন্ধ্যায় শিবের কাছে বাতি জালিয়ে দেন। একে বলে "নীলের ঘরে বাতি"। এক সময় মনে হয়েছিল এ রীতি বুঝি 'নীলাবতী' কথাটি ভেঙে উৎপন্ন। এখন মনে হচ্ছে তা নয়। নীল (যদি আসলে নীর না হয়) হয়ত বেদের মাতরিশ্বা, অরণি-মন্থনজাত অগ্নি।

শিবের নীল-নীলাবতীর সঙ্গে ধর্মের নীল-অনিলের এবং অথর্ববেদের ব্রাত্যসূক্তাবলীর নীল-লোহিতের ও মাতরিশ্বা-পবমানের তুলনা করা যায়।

নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্॥[৪]

নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণোতি লোহিতেন দ্বিষন্তং বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি॥[৫]

মাতরিশ্বা চ পবমানশ্চ বিপথবাহৌ...[৬]

—'এঁর পেট নীল, পিঠ লোহিত।

'নীলের দ্বারা অপ্রিয় শত্রুকে বেঁধে ফেলেন; লোহিত দিয়ে দ্বেষকারীকে বিঁধে ফেলেন।

'মাতরিশ্বা (অগ্নি) আর পবমান (বায়ু) এঁর বিপরীত পথের বাহন।'

চার

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে ধর্মঠাকুরের কাহিনী ও তাঁর পূজা-অনুষ্ঠানের সঙ্গে বৈদিক অধ্যাত্মভাবনার ও অনুষ্ঠানের অপরিচ্ছিন্ন যোগাযোগ আছে। এর থেকে কেউ যদি মনে করেন যে ধর্মঠাকুরের ঐতিহ্যে ও অনুষ্ঠানে অবৈদিক ও অর্বাচীন কোন ভাব বা বস্তু নেই তাহলে ভুল করবেন। ধর্মঠাকুরের পূজা চলে এসেছে দেশের তথাকথিত নিম্নস্তরের জনগণের মধ্যে দিয়ে। এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবিদ্যায় এঁদের অধিকার ছিল না। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণেরা ব্যাপক ভাবে আসতে শুরু করেন গুপ্তরাজাদের সময় থেকে। তাঁরা বাংলাদেশের প্রাচীনতর অধিবাসী নন। তাই ধর্মপূজার সঙ্গে তাঁদের সংস্রব ছিল না।

পুরানো ব্রাহ্মণ যাঁরা আগে থেকে ছিলেন তাঁরা নবাগত ব্রাহ্মণদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এঁদের অনেকে পরে বর্ণ-ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। কেউ কেউ বা জাত খুইয়ে ছিলেন এমন অনুমানও অসঙ্গত নয়। চণ্ডালদের উপবীত-সংস্কারের উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধ আচার্য অদ্বয়বজ্র (দ্বাদশ শতাব্দী)। রামাই পণ্ডিতের কাহিনীতে এই প্রাক্তন জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণদেরই অনু-ঘোষণার চেষ্টা। এঁরা সূত্র উপবীতধারী ছিলেন না, ছিলেন তাম্রপবিত্রধারী। এঁদের বেদ ঋক্‌সামযজুর বাইরে। অথর্ববেদের ব্রাত্য-সূক্তগুলি এমনি অ-ব্রাহ্মণ্য-পন্থী প্রাক্-বৈদিক আর্যদের লুপ্ত ভাণ্ডারের টুকরা। ব্রাত্য—ব্রতের উপাস্য, ব্রাতের উপাস্য এবং বৈদিক-ব্রতবাহ্য। এই তিন অর্থেই অথর্ববেদের ব্রাত্য বাংলা সংস্কৃতির ধর্মঠাকুরের প্রাচীন প্রতিরূপ। ধর্মঠাকুরের পূজা ব্রত ছাড়া কিছু নয়। ধর্মঠাকুরের পূজায় বহু লোকজনের আবশ্যক, তিনি বহু লোকের পূজ্য সার্ব-জনিক দেবতা, ব্যক্তির উপাস্য মাত্র নন সুতরাং তিনি ব্রাত্য। আর তাঁর পূজক হাড়ি-ডোম-চণ্ডাল প্রভৃতি অত্যন্ত অ-ব্রাহ্মণ জাতি। সুতরাং ব্রাত্য তো বটেই।

ব্রাত্যের যে বর্ণনা অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে আছে তাতে কোন কোন বিষয়ে ধর্মঠাকুরের পূজার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। ধর্ম রথে চড়ে বিজয় করেন, ব্রাত্যও তাই। ধর্ম রাজা, ব্রাত্যেরও রাজবৎ আচরণ। ধর্ম-ঘরের চার দিকে চার দরজা, তাতে চার প্রহরী। ধর্মের রাজপাট সিংহাসন, ব্রাত্যেরও আসন্দী যা দেবতারা তাঁকে এনে দিয়েছিলেন বসবার জন্যে।

পাঁচ

ধর্মঠাকুরের অর্বাচীন ও অন্-আর্য (এখানে 'আর্য' বলতে বুঝি প্রাক্-বৈদিক ও বৈদিক সংস্কৃতিস্পৃষ্ট) রূপের স্পষ্ট প্রকাশ দেখি ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচয়িতাদের নিজস্ব বিশ্বাসে। ধর্মমঙ্গল যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা সকলেই ধর্মের প্রত্যাদেশের দোহাই দিয়েছেন। সন্ন্যাসী ফকির অথবা ধর্মপণ্ডিত কিংবা সিপাইয়ের বেশে প্রত্যক্ষ-গোচরে, অথবা ব্রাহ্মণের বেশে কিংবা নিরাকার রূপে অপ্রত্যক্ষ জ্বরের ঘোরে তাঁরা ধর্মঠাকুরের আদেশ পেয়েছিলেন। ধর্মের আবির্ভাব তাঁদের মনে ভয়ের সঞ্চার করেছিল এবং এ আবির্ভাব সাধারণত ঘটত শনিবার ঠিক দুপুর বেলা। ঠিক দুপুরবেলায় ভূতের আবির্ভাব লোক-সংস্কারের অনুযায়ী। ছেলে-ভুলানো ছড়ায় বলে,

ঠিক দুপ্‌পুর্ বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি রূপরাম চক্রবর্তী (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) লিখেছেন যে তিনি তেপান্তরের মাঠে ধর্মের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন আধা সন্ন্যাসী আধা-ফকির রূপে। তাঁর কিছু পরবর্তী কালের কবি রামদাস আদক ও সীতারাম দাস দুজনেই সিপাইবেশী ধর্মের সামনে পড়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানিকরাম গাঙ্গুলি ধর্মপণ্ডিতরূপী ঠাকুরের দর্শন পেয়ে প্রত্যয় না করায় পরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরূপী ধর্মের কাছে ভর্ৎসিত হয়েছিলেন। জ্বরের ঘোরে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন রামকান্ত রায়। এঁদের সকলেরই দিশা লেগেছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কোন কোন স্থানে নিম বা অন্য গাছে সন্ন্যাসী ঠাকুরের বা ব্রহ্মচারীর পূজা হয়। ইনিই ধর্মমঙ্গল-কবিদের প্রত্যাদেশ-দাতা ধর্মঠাকুর। এঁর উলটা পিঠ অপদেবতা ব্রহ্মদৈত্য।

ছয়

আর একটা কথা বলবার আছে।

আমাদের লৌকিক দেবতাদের (অর্থাৎ যে সব দেবদেবীর পূজা এখন চলে তাঁদের) একটি করে নির্দিষ্ট গাছ আছে, অথবা একটি করে নির্দিষ্ট গাছের পাতা বা ফুল বা ডাল তাঁদের পূজায় লাগে। যেমন বিষ্ণুর তুলসী, শিবের বেল, চণ্ডীর জবা, বনদুর্গার শেওড়া, ষষ্ঠীর পাকুড় (বা অশ্বত্থ), মনসার সিজ। ধর্মের পূজায় কোন গাছের বা পাতার আবশ্যক নেই। কিন্তু তাঁর নির্দিষ্ট গাছ বট, ঋগ্বেদের "সুপলাশ বৃক্ষ"। এমনি অক্ষয় বটের নীচেই ধর্মের আদি পীঠস্থান জগন্নাথ ক্ষেত্র, যেখানে

দেউল নির্মাণ হৈল অক্ষয় বটতলা।

পাদটীকা

---

১ "সা বশী প্রাতরং মৃতং নামৃষ্যত। তাং কশপৃচ্ছন্ যমি কার্হি তে প্রাতয়ৃভেতি" [কাপিষ্ঠলকঠ-সংহিতা ৪.১]।

২ ধর্মপূজাবিধান, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৮৮।

৩ 'নীর' পাঠ কল্পনা করলে পয়ারে মিল হয়। কে জানে হয়ত গোড়ায় নীরই ছিল; সুতরাং নীল-অনীল = জল-বায়ু। নীল = নীর = কালিময় ঘট, অনিল = নিরঞ্জন।

১৫.১.৭। ৫ ১৫.১.৮ ৬ ১৫.২.৭

শ্রীক্ষেত্রের ঠাকুর

পুরীধাম একদা বাঙালীর ঘরে শ্রীক্ষেত্র নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এখন তা, সঙ্গত কারণেই, পুরানো নামটি খারিজ হয়েছে। পুরী এখন মুখ্যত বেড়াবার স্থান। কিন্তু দুটি নামই পূর্ণনামের ব্যবহৃত খণ্ডিত রূপ। 'পুরী' এসেছে 'পুরুষোত্তম পুরী' এবং 'জগন্নাথ পুরী' থেকে আর শ্রীক্ষেত্র হল "শ্রী"-র অর্থাৎ দেবী লক্ষ্মীর অঙ্গন। নামটি 'পুরুষোত্তমক্ষেত্র' এবং 'জগন্নাথক্ষেত্র' থেকেও আসতে পারে। ঠিক শ্রীক্ষেত্র অর্থে 'শ্রীধাম' দেখা যায় একাদশ শতাব্দীর গোড়াকার একটি তাম্রশাসনে "শ্রীধাম্নঃ পুরুষোত্তমস্য মহতো নারায়ণস্য প্রভোঃ"। তবে সম্পূর্ণ এই সূত্রেই নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পুণ্য স্থান নামের আগে "শ্রী" যোগ করতেন। যেমন শ্রীখণ্ড। নামটির ব্যাখ্যা পরে লভ্য।

দুই

শ্রীক্ষেত্রের দেবতা মন্দির মধ্যে ত্রয়ী মূর্তি তবে একত্র সম্বদ্ধ নয়, স্বতন্ত্র এবং পাশাপাশি অবস্থিত। দুদিকে মূর্তি পুরুষ, মাঝখানে মূর্তি নারী। মূর্তিগুলি ভারি কাঠের গুঁড়িতে অনিপুণভাবে শিশুর পুতুলের ধরনে খোদাই। সাজসজ্জা বাদ দিলে পুরুষমূর্তিদ্বয় থেকে স্ত্রীমূর্তিটি স্বতন্ত্র করা যায় শুধু এটির খর্বতা থেকে। মাঝের মূর্তিটি পাশের মূর্তিদ্বয় থেকে ছোট। বাঁদিকের পুরুষমূর্তিটির রঙ কালো। ইনি যে বিষ্ণু-কৃষ্ণের প্রতীক তা জানাবার জন্য। কখন থেকে মূর্তিতে রঙ লাগানো আরম্ভ হয়েছে তা জানা যায় না।

এই ত্রয়ী মূর্তি বলরাম, সুভদ্রা ও পুরুষোত্তম (মাধব-বিষ্ণু-কৃষ্ণ) বলে পূজিত হয়ে আসছেন অন্তত তৃতীয় অনঙ্গভীমের সময় থেকে (১২৩৫ খ্রীস্টাব্দ)। তার আগে পুরুষোত্তম ছাড়া আর দুটির নাম স্পষ্টভাবে জানা যায় না। সুভদ্রার অর্থাৎ দেবীমূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় নানাভাবে। গোড়ার দিকে, অর্থাৎ দশম একাদশ শতাব্দী থেকে, দেবী অনুল্লিখিত হলেও ইঙ্গিতে 'শ্রীলক্ষ্মী' বলে স্বীকৃত। (রাজরাজের শাসনের উদ্ধৃত অংশ স্মরণ করুন)। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইনি ভদ্রাম্বিকা নামে উল্লিখিত হয়েছেন। 'ভদ্রাম্বিকা' মানে ভালো মেয়ে, 'সুভদ্রা' মানেও তাই—অতি ভালো মেয়ে। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে—

অনন্তভীমের কন্যা চন্দ্রিকার প্রতিষ্ঠিত ত্রয়ী দেবতার উল্লেখ থেকে—সুভদ্রা নাম চলে এসেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর নামান্তর পাই 'ভদ্রা' তা এখানে স্মরণীয়।

প্রধান দেবতার নাম জগন্নাথ। প্রথমে পুরুষোত্তম, তারপর পুরুষোত্তম-জগন্নাথ, তারপরে চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়াতেই পাই জগন্নাথ। অধ্যাপক কে. সী. মিশ্র তাঁর 'কাল্‌ট্ অব জগন্নাথ' (১৯৭১) গ্রন্থে বলেছেন যে, অনেকদিন থেকেই উড়িষ্যায় ও আশেপাশে শিব, দুর্গা ও বিষ্ণু সমবেত মূর্তির উপাসনা প্রচলিত ছিল। শ্রীক্ষেত্রের ত্রয়ী দেবতার সঙ্গে মেলাতে গেলে সহসা মনে হতে পারে যে, ডানদিকে মূর্তি যা বলভদ্র (বলরাম) নামে পূজিত হয় তা আসলে শিবের প্রতীক মূর্তি ছিল। শিব ও বলরামের মধ্যে কিছু মিল আছে সন্দেহ নেই। উভয়েই গৌর বর্ণ, উভয়েই সর্পসমন্বিত এবং জলের সঙ্গে উভয়েরই সংযোগ আছে। শিবের মাথায় গঙ্গা, বলরাম (শেষ) সমুদ্রাশ্রিত। তবুও শ্রীক্ষেত্রের বলভদ্র শিব নন এবং কখনও ছিলেন না। এই মন্তব্য দুর্গা ও সুভদ্রার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, যদিও—পরে দেখাব—দুর্গা ও সুভদ্রা পুরাণ-কাহিনীতে গোড়ায় অভিন্ন ছিলেন।

তিন

যখন থেকে ইতিহাসে শ্রীক্ষেত্র দেবতার উল্লেখ মিলছে তখন থেকে কেন, সম্ভবত তার অনেককাল আগে থেকেই, ত্রয়ীর মূলদেবতা ছিলেন একজন। আগে তিনি উল্লিখিত হতেন 'মাধব' বলে। বিষ্ণুর এক নাম মাধব। তবুও এ নামটির এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল। যিনি মধুর অর্থাৎ সুখাদ্য-পানীয়ের ভাণ্ডারী তিনি মাধব। শ্রীক্ষেত্রের প্রধান বিশেষত্ব এখানকার 'ভোগ'-এর বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য। শ্রীক্ষেত্র নামটিও সমুদ্রোদ্ভূতা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দ্যোতনা করে। বিষ্ণুর মাধব নামটি যে কলিঙ্গ অঞ্চলে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল তা অধ্যাপক মিশ্র দেখিয়েছেন। পুরাণে দেখতে পাই যে মাধব নামটি কৃষ্ণ বলরামের মত দ্বারকাবাসী যদুবংশীয় বীরের অভিধা বা সাধারণ নাম। এই সূত্রে বিষ্ণু-কৃষ্ণের এক বিশিষ্ট নাম হয়েছিল 'নীলমাধব'। শ্রীক্ষেত্রের ত্রয়ী দেবতার প্রধানের নাম তাই পাই নীলমাধব। শ্রীক্ষেত্রের ঠাকুরের পীঠস্থান একদা ছিল সমুদ্রের উপরে উঁচু টিলায় বা পাথরের ভিবিতে (এবং এখন যেখানে আছে তাও সমুদ্রের অদূরে এবং আশপাশের সমতল থেকে কিছু উঁচু বটে)। এই কারণে দেবস্থানটির নাম হয়েছিল 'নীলাচল-ক্ষেত্র' অর্থাৎ নীলমাধবের অধিষ্ঠিত অচলায়তন ভূমি-খণ্ড। শ্রীক্ষেত্রের প্রধান দেবতা পুরুষোত্তমের নীলমাধব নাম অর্বাচীন নয়। মুরারি

মিশ্রের (নবম-দশম শতাব্দীর মধ্যিকাল) অনর্ঘ-রাঘবের প্রস্তাবনা থেকে জানা যায় যে, নাটকটি নীলমাধব পুরুষোত্তমের এক "যাত্রা" (অর্থাৎ উৎসব, দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা অথবা রথযাত্রা) উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছিল ('ভো ভো লবণবেলাবনালিতমালতরুকন্দলস্ত / ত্রিভুবন-মৌলিকমণ্ডন-মহানীলমণে ঃ...... ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্ত যাত্রায়াম্ উপস্থানীয়-সভাসদাঃ")।

নীলাচলক্ষেত্র কলিঙ্গে এবং সমুদ্রকূলপ্রান্তে হলেও দেবতার নাম-যশ সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ছিল না। মধ্য ভারতে মালব পর্যন্তও যে পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রসিদ্ধ ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মধ্যভারত ও রাজপুতানার এবং অন্যান্য অঞ্চলের রাজরাজড়ারা যে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রচুর ধনরত্নাদি দান করতেন তা নাগপুরে প্রাপ্ত একটি প্রস্তুলেখ থেকে (১১০৪ খৃস্টাব্দ) জানা যায়।

আসলে যাদব-মাধব ঠাকুরের উপাসনা কলিঙ্গ অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না। মধ্য ভারতের আরণ্য-মেখলা একদা যার প্রান্ত এসে ঠেকেছিল নীলাচল পর্যন্ত, যে 'বস্তীর্ণ অঞ্চলকে টলেমির মানচিত্রে দশার্ন বলে দেখানো আছে, তার স্থানে স্থানে এই ত্রয়ী দেবতার পূজা দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। (মেঘদূতে কালিদাস দশার্ন দেশের গ্রামে গ্রামে চৈত্যবহুলতার উল্লেখ করেছেন। স্বতই মনে হয় কালিদাস উল্লিখিত চৈত্য বুঝি বৌদ্ধ পূজ্য স্তূপ ছাড়া কিছু নয়। এ অনুমান সম্পূর্ণ ঠিক নয়। চৈত্য ছিল গোড়ায় সমাধি-ভস্মস্তূপ, পরে হয় বাস্তুদেবতার প্রতীক স্তূপও, সম্ভবত এর মধ্যে গৃহস্থবাড়ির মাতৃকর্তার অস্থিভস্মও সংগৃহীত থাকত। বেদের আমলেই বাস্তুদেবতা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধ-স্তূপ প্রাচীনতর এই বাস্তু-স্তূপেরই জের টেনে এসেছিল। হয়ত শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যস্থল নীলাচলে মন্দির গড়ে ওঠার বহু বহুকাল আগে এমনি এক স্তূপ ছিল অথবা স্তূপরূপে কল্পিত পুণ্য বস্তু ছিল। এখানে মনে পড়ে মহাভারতের বনপর্বে পাণ্ডবদের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কলিঙ্গদেশে এক শৈলের উল্লেখ আছে যার উপর চড়লে মানুষ স্বার্থসিদ্ধ হয়। পরে আলোচনা করছি।)

কলিকাতা মিউজিয়মে বেনারসের কাছে সংগৃহীত একটি প্রস্তরফলক আছে। ফলকটির শীর্ষে তিনটি মূর্তি আছে, দু পাশে পুরুষ, মাঝখানে নারী। সকলে উপবিষ্ট। পুরুষ মূর্তিদ্বয়ের হাতে গদা, নারী মূর্তি জোড়হাত। নীচে পাঁচ ছত্রলিপি আছে সে লিপি অংশত ভগ্ন ও অপাঠ্য। লিপির আরম্ভ এই, "ওঁ নমঃ শ্রীভাইল মাধব-ভট্টারকস্ত......"। শ্রীপ্রিয়তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তর ফলকের পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। তাতে

তিনি বলেছেন যে, ছবি তিনটি হল উপাসক-উপাসিকার। কিন্তু গদা হাতে মূর্তি দুইটি উপাসকের হওয়া সম্ভব নয়। "শ্রীচাইর মাধব ভট্টারক"- থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে ফলকটিতে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি সম্ভবত মাধব ভাই (ও বোন) দেবতাদের—অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রের দেবতাত্রয়ের সহিত অভিন্ন। লিপিদৃষ্টে অনুমান হয় প্রস্তরফলকটির নির্মাণকাল নবম-দশম শতাব্দী।

চার

আধুনিক কালের পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে শ্রীক্ষেত্রের দেবতারা আদিতে ছিলেন বৌদ্ধ ত্রিরত্ন। এই চিন্তার কয়েকটি সূত্র আছে। হিন্দুর দেবতা এবং প্রচণ্ডভাবে মাক্ত দেবতা হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে এই মূর্তিতে কোন মিল নেই। পূজা পরিচর্যায়ও কোন মিল নেই। শুদ্ধাচারের বেশ ব্যতিক্রম আছে, প্রসাদ-ভাত সকড়ি বলে গণ্য নয়, প্রসাদ খেয়ে হাত না ধুলেও চলে। তার উপর আধুনিক পণ্ডিতদের বিশ্বাস যে এ অঞ্চলে অশোকের কাল থেকে বৌদ্ধ (এবং জৈন) ধর্ম প্রচলিত ছিল। সর্বশেষ উড়িষ্যার সাহিত্যে ও চিত্রকলায় প্রতিফলিত ঐতিহ্যে দশাবতারের অন্তর্গত বুদ্ধ অবতার জগন্নাথই। (কিন্তু এ ঐতিহ্য উড়িষ্যায় আধুনিককালের ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী। অনুরূপ সময়ের বাংলা চিত্রকলায় বুদ্ধাবতার যোগীমূর্তি)। তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল (বোধ করি এখনও হয়ে থাকে) যে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম বৌদ্ধ ত্রিরত্নের বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের স্থানীয় হিন্দু সংস্করণ। যাঁরা এই মত পোষণ করেন তাঁদের ভাবা উচিত যে ধর্ম (অথবা সংঘ) নারী রূপ পাবে কেন? বৌদ্ধ ত্রিরত্নকে ব্রাহ্মণ্য ত্রিদেবা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব করলেই তো অনেক ভালো হত। পণ্ডিতদের এমন বিশ্বাসও ছিল (বা এখনও আছে) যে নীলাচল প্রথমে বৌদ্ধ স্তূপ ছিল, এর মধ্যে বুদ্ধের দন্ত ছিল এবং সে দন্ত খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সিংহলে অপনীত হয়েছিল। এ মতের সমর্থনে বিন্দুমাত্র প্রমাণ অথবা প্রমাণাভাস নেই। তবে নীলাচলক্ষেত্রে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে যে (বাসুদেবের ?) স্তূপ ছিল তার কিছু প্রমাণ আছে। পরে বলছি।

বৌদ্ধভাবনার পরে যোগানো হয়েছে "অনার্য" কল্পনা। ঐতিহাসিকদের ধারণা আমাদের সংস্কৃতির অনেক কিছুই এদেশের প্রাচীনতর অধিবাসী যারা আর্য, অর্থাৎ সংস্কৃত অথবা তৎসম্পর্কিত কোন ভাষা বলত না, তাদের কাছ থেকে এসেছে—বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ইত্যাদির চিত্র-প্রলেপমণ্ডিত

হয়ে। বিশুদ্ধ অনুমান হিসেবে এতে খুঁত ধরবার কিছু নেই। সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতিসম্পর্কিত কোন ভাষা এদেশে মনুষ্যবাসের আদিকাল থেকে বলা হয়ে এসেছে এমন কথা কোন বিদ্বান পণ্ডিত কখনো ভাবেননি। সুতরাং প্রস্তাবটি নির্দোষ এবং প্রায়-স্বতঃসিদ্ধ। মুশকিল হয় প্রস্তাবটির প্রয়োগে। নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা মনে করেন এখন যে ভারতের আদিবাসী রয়েছেন তারা এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক যারা আছে তাদেরই বহু বহুকালের পূর্বপুরুষই এদেশের প্রাগার্য অধিবাসী ছিল। এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কেননা এমন ব্যাপার অনেক দেশেই ঘটেছে। মুশকিল হচ্ছে, এ দেশের প্রাগার্য অধিবাসীদের সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নই। দু চারটি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, কিছু ভাঙা হাঁড়িকুড়ি এবং এক আধটি হাড়গোড়ের টুকরা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি যা সুনিশ্চিতভাবে প্রাচীন এবং প্রাগার্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে। যাই হোক বৌদ্ধ মতবাদীদের পরে এগিয়ে এলেন এই অনার্য মতবাদীরা। এঁদের অভিমত বৌদ্ধপ্রভাববাদীদের মতো অতটা শূন্যগর্ভ নয়। শ্রীক্ষেত্রের দেবমূর্তির উপাদান নিমকাঠ একদা আরণ্য শবরজাতি যোগান দিত, সুতরাং নীলমাধব আদিতে তাঁদেরই দেবতা ছিলেন। কিন্তু শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করে অমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। সেকালের কেন একালেও নিমগাছের কেউ চাষ করে না। আপনিই হয় এবং সেকালে আরণ্য অঞ্চল বহুবিস্তীর্ণ ছিল। সুতরাং কাঠ আনতে হত জঙ্গল থেকেই এবং সে কাজ সহজে পাওয়া যেত আরণ্যক শবর—যারা আরণ্যভূমির অধীশ্বর—তাদের কাছ থেকেই। শবরদের দ্বারা নিমকাঠের জোগান ছাড়া শ্রীক্ষেত্রের দেবতার অনুষ্ঠানে এমন কোন কিছু দেখা যায় না যা 'অনার্য' বলে ছাপ মারা যায়। (ভাত খেয়ে হাত না ধোয়া অনাচার হতে পারে, তবে অনার্য আচার নয়।) শ্রীক্ষেত্রের ঠাকুর যদি অনার্য বীজ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকেন তাতে আপত্তির কিছু নেই। আপত্তি হল এই যে, সে বীজ মহাকালের গর্ভে নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে।

পাঁচ

পুণ্যতীর্থ শ্রীক্ষেত্রের প্রথম আভাস রয়েছে মহাভারতের বনপর্বে চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে। উপযুক্ত অংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিই। তীর্থযাত্রায় লোমশ মুনি যেন দেখো হয়েছেন। বর্ণনা তাঁরই উক্তি।

অঙ্গদেশে কৌশিকী নদী ধরে যুধিষ্ঠির সব তীর্থ ও মন্দিরাদি দেখলেন। তারপর তিনি এলেন গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে। এখানে পাঁচশ নদী এসে মিলেছে। সেই সঙ্গমে তিনি স্নান করলেন। তারপর তিনি ভাইদের নিয়ে চললেন সমুদ্রতীর ধরে কলিঙ্গদেশে। সেই কলিঙ্গদেশে আছে বৈতরণী নদী, সেখানে স্বয়ং ধর্মও সাহায্য পাবার জন্যে দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করেছিলেন।…… এইখানে দেবতারা রুদ্রের যজ্ঞ-ভাগ পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।… তারপর পাণ্ডবেরা সস্ত্রীক বৈতরণীতে অবগাহন করে পিতৃপুরুষের তর্পণ করলেন।

জাজপুর ছাড়িয়ে এগিয়ে তাঁরা আরণ্যভূমিতে প্রবেশ করলেন। লোমশ বললেন, যুধিষ্ঠির এই যে সব পাহাড় জঙ্গল দেখছ, একদা ব্রহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন এবং সেই যজ্ঞের দানরূপে এই সব কশ্যপ মুনিকে দান করেছিলেন। তারপর এই ভূস্থান ভূতলে নেমে যেতে থাকে। তখন পৃথিবীকে প্রসন্ন করবার জন্যে কশ্যপ সমুদ্রের কূলে একটু ভূমি উন্নত 'বেদী' করে দিয়েছিলেন। লোমশ বলছেন,

সেই দেবী (পৃথিবী) সমুদ্রে পড়ে গিয়ে তারপর এই বেদী আশ্রয় করে রয়েছেন। এতে আরোহণ করলে পরে তুমি একলা সাগর উত্তরণ কর গিয়ে। আমি তোমার স্বস্ত্যয়ন করে দিচ্ছি যাতে তুমি আজই (বেদীতে) অধিরোহণ করতে পার। (স্বস্ত্যয়ন না করে) সাধারণ মানুষ বেদীকে ছুঁলেই বেদী সাগরে অন্তর্ধান করবেন। যুধিষ্ঠির, এই 'সত্যবাক্য' জপ করতে করতে তুমি সাহস করে বেদীতে উঠে যেও :

ওঁ নমো বিশ্বগুপ্তায়
নমো বিশ্বরূপায় তে।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ
সাগরে লবণাম্ভসি॥
অগ্নির্মিত্রো যোনিরাপোথ দেব্যো
বিষ্ণো রেতস্তম্ অমৃতস্য নাভিঃ।

তার পরে এই "সত্যবাক" বলে তুমি সমুদ্রে অবগাহন করো,

অগ্নিশ্চ তে যো'নরিড়া চ দেহো
রেতোধা বিষ্ণোরমৃতস্য নাভিঃ॥

অন্যথা, তুমি কুশাগ্রেও সমুদ্র স্পর্শ করো না।

লোমশের কথামত যুধিষ্ঠির কাজ করেছিলেন।

বেদী-আরোহণ ও সমুদ্রস্নান মন্ত্র দুটি ত্রিষ্টুভ ছন্দে লেখা একটি বৈদিক

ধাঁচের দুটি শ্লোকার্ধ। অর্থ অগ্নি মিত্র এবং অপ দেবীরা তোমার যোনি, তুমি বিষ্ণুর বীর্য, অমৃতের আধার। অগ্নি তোমার যোনি এবং ইড়া (অন্নপানীয়) দেহ. বিষ্ণুর তুমি বীর্যধান, অমৃতের উৎপত্তিস্থল।

মহাভারতের এই বিবরণের মধ্যে কিছু সত্য থাকলে বুঝতে হবে যে, এখন:-প্রায় হাজার দেড়েক বছর আগে অন্তত কলিঙ্গের সমুদ্রকূলে কোথাও একটি পুণ্য স্তূপ অথবা শৈল ছিল এবং লোকের বিশ্বাস ছিল যে, সমুদ্র নির্ভয়ে পার হতে গেলে সেখানে পূজা দেওয়া অথবা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আবশ্যক। আরও, সেখানে বৈদিক ধরনের পূজা রীতি ছিল। এখনকার সঙ্গে মেলাতে গেলে এ স্থান যে নীলাচল তা বলতে হয়।

ছয়

শ্রীক্ষেত্রের ত্রিদেবা হলেন জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা। জগন্নাথ হলেন মাধব বিষ্ণু-কৃষ্ণ, বলভদ্র—সঙ্কর্ষণ-বলরাম। সুভদ্রা নিয়ে একটু গোলমাল আছে। মহাভারতীয় কৃষ্ণ-কাহিনীতে সুভদ্রা বলরাম ও কৃষ্ণের ভগিনী (সহোদরা অথবা সমপিতৃকা নন, সম্পর্কিতা), অর্জুনের পত্নী, অভিমন্যুর জননী, পরীক্ষিতের পিতামহী। কিন্তু বলরাম-কৃষ্ণের প্রথম দিকের কাহিনীতে সুভদ্রার নামই নেই। একই দিনে ভূমিষ্ঠ যশোদার কন্যা ও দেবকীর পুত্র দুজনে বদল হয়েছিল। যশোদার কন্যাকে দেবকীর সন্তান ভেবে কংস আছড়ে মারতে গেলে শিশুটি হাত পিছলে বেরিয়ে পড়ে আকাশে উড়ে যায় শঙ্খচিল হয়ে এবং কংসের মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী সে দৈববাণী করে। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে তিনি সুরলোকে ইন্দ্রের ভগিনী বলে সংবর্ধিত হয়েছেন। হরিবংশে এঁকে 'একানংসা (একানংশা)' বলা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে, ইনি যাদব-মাধবদের মধ্যে পালিতা হয়েছিলেন। এই সূত্রে একানংসাকে মহাভারতের সুভদ্রার সঙ্গে এক ভাবা যায়। সুভদ্রার 'বলাম্বিকা' নাম (বা অভিধা) বলভদ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সূচিত করে। কবি-কঙ্কণের চণ্ডীতে দেবীর নাম একবার পাওয়া গেছে "বলারু"—অর্থাৎ বলরূপা। এই কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। বলরাম ও সুভদ্রার জন্ম ব্রজে, সুতরাং দুজনে সম্পর্কে ভাই-বোন বটে। বলরাম জ্যেষ্ঠ, কৃষ্ণ সুভদ্রার সংবয়সী। 'সুভদ্রা' এবং 'বলাম্বিকা' (বলা অম্বিকা) দুই-ই 'বলভদ্র' নামের জের টানে।

বলভদ্র ও কৃষ্ণ এই মাধব দুজনের দলে সুভদ্রাও, সুতরাং "মাধব" ছিলেন

(যেহেতু তিনি তখন অবিবাহিতা)। (এখানে মনে করিয়ে দিই যে, মহাভারত-কাহিনীর সুভদ্রার সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ-হরিবংশের যশোদা-নন্দিনীর সরাসরি যোগ নেই।) বাসুদেব (কৃষ্ণ), সঙ্কর্ষণ (বলরাম), প্রদ্যুম্ন (বাসুদেব পুত্র), অনিরুদ্ধ (প্রদ্যুম্ন পুত্র) এবং শাম্ব (বাসুদেব পুত্র) একদা যে "পঞ্চবীর" রূপে পূজিত হতেন, এবং পরে শাম্বকে বাদ দিয়ে "চতুর্ব্যূহ" কল্পনা হয়েছিল, তা ঐতিহাসিকরা জানেন। অন্য এক ঐতিহ্যে পুরুষোত্তম (কৃষ্ণ), বলভদ্র ও একানংশা (সুভদ্রা) এই তিন "মাধব ভাই" নামে যে পূজা পেতেন তার ইতিহাসসম্মত প্রমাণ আগে উপস্থাপিত করেছি। এই ঐতিহ্য প্রাচীনতর: কেননা এ সরাসরি এসেছিল বৈদিক ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র পথে এবং সে বৈদিক ঐতিহ্য এসেছিল আরও অনেক পুরানো ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহ্য থেকে। সে কথা এখন বলছি।

সংস্কৃত, ফারসী, আরমানী, গ্রীক, লাতিন, গোথিক ইত্যাদি ভারতে, ইউরোপে ও মধ্যবর্তী কোন কোন দেশে যে প্রাচীন ভাষাগুলির বংশধর এখন শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলি এক সুপ্রাচীন অবলুপ্ত ভাষা থেকে উৎপন্ন। এই সুপ্রাচীন অবলুপ্ত বংশকর্তা ভাষাকে এবং সে ভাষা যারা একদা বলত, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্দো-ইউরোপীয়'। ইন্দো-ইউরোপীয়দের দেশ এবং ভাষার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আবৃত হয়েছে বংশধর প্রাচীন ভাষাগুলি ও সে ভাষার সাহিত্য আলোচনা করে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও ভাষীর বিষয়ে আমাদের সমাহৃত (এবং আহ্রিয়মাণ) জ্ঞানের এক মোটা অংশ মিলেছে ঋগ্‌বেদ থেকে।

ঋগ্‌বেদের সূক্তে বহু উদ্গীত চারটি প্রধান দেবতার মধ্যে একটি হলেন যুগ্মদেব, 'অশ্বিনা' (অর্থাৎ অশ্বিন্—"অশ্ববান" দুজন): প্রাচীনতর নামে 'নাসত্যা' (অর্থাৎ নাসত্য দুজন)। 'অশ্বিন্' নামটির তাৎপর্য সহজেই বোঝা যায়। এঁরা বিচরণ করতেন ক্ষিপ্র অশ্ব বাহিত রথে। 'নাসত্যা' নামটির অর্থ একদা মনে করা হত যে-দুজন 'যারা নাক থেকে জাত' তার পরে ভাবা হত, 'যে-দুজন অসত্য নন,' এখন এ দুটি অর্থ পরিত্যক্ত হয়েছে। পণ্ডিতেরা এখন অনুমান করছেন, নামটি এক প্রাচীন 'নস্' ধাতু থেকে উৎপন্ন, এ ধাতুর অর্থ হল "আনন্দ করা"। ধাতুটির সরাসরি ব্যবহারের কোন উদাহরণ পাওয়া যায়নি, তবে বর্তমান কালের অজ্ঞাত রূপের ব্যবহার আছে, 'নিংস' (সংস্কৃত ব্যাকরণে একটি স্বতন্ত্র ধাতু বলে পরিগণিত), অর্থ "আস্বাদ করা,

চুম্বন করা"। তদনুসারে 'নাসত্য' মানে হবে আসঙ্গ কর্মের অধিকারী। 'নাসত্যা' এই দ্বিবচন দেবনামটি আবেস্তায় পাওয়া গেছে (তবে দেবতার নামে নয়, অসুরের নামে; বেদের কোনো কোনো দেবতা আবেস্তায় অসুর হয়েছেন. এশিয়া মাইনরে মিটান্নিদের এক প্রত্নলেখে, খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাওয়া গেছে বিবাহের ঘটকদেবতা রূপে।

বেদের নাসত্য অশ্বিদ্বয়ের ইন্দো-ইউরোপীয় কোন সাধারণ নাম মেলেনি, তবে ভিন্ন নামে ও অভিধানে তাঁদের সাক্ষাৎ মিলছে গ্রীক ও লাট্‌বিয়-লিথুয়ানিয় ঐতিহ্যে। সর্বত্রই তাঁরা দ্যৌ-পুত্র,—বেদে 'দিবো নপাতা', গ্রীকে 'দিওস্ কোউরোই' (ব্যক্তিগত নামে 'কসতোর' ও 'পোলুদেউকেস'), লাটবিয়ে 'দিএব দেলি', লিথুয়ানিয়ে 'দিএবে সুনেলিয়ন'। এঁদের এক ভগিনীও ছিল, —বেদে ইনি 'দুহিতা সূর্যস্য' (বা 'সূর্য'), গ্রীকে হেলেন, লাটবিয়ে 'সউলেস মুক্তেরিয়া'। ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহ্যের নাসত্য দুজন তাঁদের ভগিনীকে যে পত্নীভাবেও দেখতেন তার যথেষ্ট ইঙ্গিত ঋগ্‌বেদে আছে: "শোষাবনীত জেন্যা যুবাংপতী", "যেন পতী ভবথঃ সূর্যায়া:", "সূর্যায়া অশ্বিনা বরা।" সূর্যা নাসত্যদের সঙ্গে জাঁকজমকে রথে পরিভ্রমণ করেন: "যুবো রথং দুহিতা সূর্যস্য সহ শ্রিয়া নাসত্যাবৃণীত"; "রথং কম্ কাকই ত্রবন্ধম্ আশুং সং সূর্যস্য দুহিতাবৃণীত"। ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহ্যে যেমন বেদেও তেমনি অশ্বিদ্বয় অনেক রকম বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করেন, বিশেষ করে সমুদ্রে বিপত্তি ও বিবিধ দুর্গম পতন থেকে। উভয়ত্র এঁরা আরোগ্যেরও কর্তা। (পৌরাণিক ঐতিহ্যে এঁরা দেবভিষক্ হয়েছেন।)

ঋগবেদের দেবতাদের সঙ্গে পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় দেবতাদের একটা বড় রকম গরমিল আছে। ঋগ্‌বেদের দেবতারা উপাসকের প্রতি অনেকটা নির্লিপ্ত। পূজ্য ও পূজক যেন কাছারিতে আসা জমিদার ও সম্পন্ন প্রজা। খাদ্যপানীয় বিধিমতে অর্থাৎ যজ্ঞবিধিসূত্রে পেলে দেবতারা খুশি, আর উপাসকেরা নিজেদের জোতজমি ঘর-গাড়ি যথারীতি বজায় থাকলেই কৃতার্থ। পরবর্তীকালে শাস্ত্রীয় দেবতাদের সঙ্গে উপাসকের সম্পর্ক নির্লিপ্ত নয়। এখানে দেবতা যেন বাপ-মা আর উপাসক যেন বিপদগ্রস্ত কাতর সন্তান। যখন খুশি যেমন করে হোক শরণ নিলেই তার বিপদ দেবতা দূর করে দেবেন। ঋগ্‌বেদের প্রাচীন দেবমণ্ডলীতে এমন দেবতা একটি আছেন—'নাসত্যা'—'অশ্বিনা'। ঋগ্‌বেদে উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, এঁরা নানা অবস্থায় নানা মানুষকে এমন

কি ইতর প্রাণীকেও দুর্গতি থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাঁদের কৃপায় রেভ উদ্ধার হয়েছিলেন জল থেকে, ভুজ্যু সমুদ্রে নৌকাডুবি থেকে তিনটি রথের সাহায্যে বাড়ি পৌঁছে, পেদু ক্ষিপ্রগামী সাদা ঘোড়া পেয়ে তৃষ্ণাতুর গোতম ঝরণার জল পেয়ে, শয়ুও তৃষ্ণায় জল পেয়ে, জাহুষ শত্রুর কবল থেকে, চ্যবান (=চ্যবন) জরা থেকে, অত্রি অগ্নিজ্বালা থেকে, বর্তিকা (বটের পাখি) বৃকের মুখ থেকে ইত্যাদি। অঙ্গহীন বিশ্‌পলার লোহার পা লাগিয়ে দিয়ে তাঁরা তাকে চলনসমর্থ করেছিলেন। তাঁদের অনুগ্রহে বধ্রিমতী পুত্র-সন্তান লাভ করেছিল। বালক ঋজ্রাশ্ব রোগগ্রস্ত ছিল বলে তার বাপ তাকে পছন্দ করত না এই জন্য ভিষকদ্বয় ("দস্র ভিষজা") তাকে ভালো করে দিয়েছিলেন। তাঁদের কৃপায় বিশ্বক্ হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েছিল। বিমদকে তাঁরা পত্নী জুটিয়ে দিয়েছিলেন। জহ্নাবীকে তাঁরা সুখসমৃদ্ধি ও সুসন্তান দিয়েছিলেন। শয়ুর গাভীকে দুগ্ধবতী করে দিয়েছিলেন তাঁরা। রাজা দিবোদাসকে তাঁরা বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন।

নাসত্য বা অশ্বিন্ দুজন সুখাদ্য-পানীয় বিতরণে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন "মাধ্বী", মধুর দেবতা। তাঁদের সবই মধুর, এমন কি চাবুকও ("যা বাং কশা মধুমতী")। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুর সঙ্গেও মধুর সম্পর্ক আছে, তবে তিনি মধুবিতরণকারী নন, মধুর ভাণ্ডারী ("বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ")। এই সূত্রেই পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য যেখানে নাসত্যা—অশ্বিনা বিষ্ণুর সঙ্গে অংশত মিলে গিয়েছেন—বিষ্ণু হয়েছেন মাধব এবং সব ভালো কাজের কর্তা। ("সর্বকার্যেষু মাধবঃ")।

পুরাণ কাহিনীর ও শাস্ত্র গ্রন্থের দেবতা বলভদ্র এবং কৃষ্ণ (বাসুদেব) বেদে আছেন বটে তবে দেবতা রূপে নন, অসুর রূপে। ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত ইন্দ্র-শত্রুদের মধ্যে দুজন হলেন 'বল' এবং 'কৃষ্ণ'। বল বহুবার উল্লিখিত, তিনি যেন বৃত্রেরই অন্য রূপ। জলস্রোতকে রুদ্ধ করে বল গুহায় আটক করে রেখেছিলেন, ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা সেই গুহার বাঁধ ভেঙে দিয়ে জলস্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। আর ঋগ্‌বেদে কচিৎ উল্লিখিত কৃষ্ণ আকাশে ঘন মেঘের মতো, অংশুমতী নদীর তীরে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে অভিযান করেছিলেন। ইন্দ্র তাঁর সম্মুখীন হয়ে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। পুরাণে-শাস্ত্রে দেখি যে ইন্দ্র আর বল ও কৃষ্ণ ভোল ফিরিয়ে ফেলেছেন। বল ও কৃষ্ণ হয়েছেন কর্তা, ইন্দ্র হয়েছেন অবিনীত ভৃত্য। বল এখন অসুর নন, ভদ্র দেবতা, তাই তিনি বলভদ্র।

আর কৃষ্ণ হলেন বাসুদেব (মানে "ভালো দেবতা")। নাসত্যদ্বয়ের ছাপও কিছু পড়ল এদের উপর। এঁরা দুভাই, বর্ণ পরিবর্তন না করে; হলেন যাদবদের মধ্যে মাধব-গোষ্ঠী। নাসত্যদের অনেক বিশিষ্ট কর্ম কৃষ্ণ-বলরামের আচরণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

নাসত্যদ্বয়ের ভগিনী "দিবো দুহিতা" সূর্য হলেন এঁদের ভগিনীস্থানীয়া নন্দগোপ-সুতা, যিনি হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে, 'একানংশ' এবং পুরাণে সর্বত্র 'যোগমায়া', 'মহামায়া' অথবা 'কাত্যায়নী' নামে অভিহিত। 'একানংশা' নামটি 'নাসত্য' নামের সঙ্গে যোগ রেখেছে। 'একানংশা' এই পাঠান্তরটি ধরে পণ্ডিতেরা নামটির ব্যাখ্যা করেন, "যিনি এক এবং কারো অংশ নন"। অর্থাৎ "অখণ্ড"। এ ব্যাখ্যা ভাষার দিক দিয়ে ভুল। আসলে নামটি হল 'একানংসা'। অর্থ, একা (অর্থাৎ অবিবাহিতা) এবং অবিবাহিতা। (এখানেও সেই প্রাচীন 'নস' ধাতু, এবং ধাতুটি এখানেও সরল রূপে নেই, আছে সম্পন্নকালের অভ্যস্ত রূপে।) মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর কাহিনীতে দেবীর একানংসা রূপ প্রকটিত ("যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি"।)

মাধব দুজনের সঙ্গে একানংসার পূজাও যে কলিঙ্গ অঞ্চলে (এবং অন্যত্র) জানা ছিল সে কথা আগে বলেছি। শ্রীক্ষেত্রের নীলমাধব ও বলভদ্রের ভগিনী —সঙ্গিনী একানংসা চলিত পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে মিল রেখে পরে সুভদ্রা নামে পরিচিত হয়েছেন।

শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার কাহিনীর সঙ্গে বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক 'নাসত্যা-অশ্বিনা' ঐতিহ্যের গভীর মিল আছে। তা সংক্ষেপে নির্দেশ করে এই আলোচনা শেষ করি।

বৈদিক দেবতাদ্বয়ের মতো নীলাচলের ঠাকুরও মানুষের সব রকম দুঃখ-বেদনার প্রতিকার করতে সমর্থ বলে ধারণা দেশের এক বৃহৎখণ্ডে হাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে প্রচলিত আছে। রাজা-রাজড়া থেকে আরম্ভ করে বণিক-গৃহস্থ পর্যন্ত সকলে আপদশান্তির কৃতজ্ঞতায় সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এই দেব-ভাণ্ডারে যথাসাধ্য দান করে এসেছেন। গজকচ্ছপ কাহিনীতে ইতর প্রাণীর উদ্ধারের গল্প রয়েছে। বিবাহের ঘটকতার বিশিষ্ট প্রমাণ কাঞ্চী-কাবেরীর গল্প। এই কাহিনী থেকে আরও উপলব্ধি করতে পারি যে,

জগন্নাথ-বলরাম 'অশ্বিনা'। তাঁরা অশ্বারোহী হয়ে কলিঙ্গের রাজাকে যুদ্ধে সাহায্য করে জয় দিয়েছিলেন।

বৈদিক ঐতিহ্যে যেমন, এখানেও তেমনি তিন জনের তিনটি রথ। সমুদ্রে এঁদের নৌযাত্রার এবং আকাশযানের যুগপৎ ইঙ্গিত রয়েছে নরেন্দ্রসরোবরে চন্দনযাত্রার অনুষ্ঠানে। হাঁসে যেন টানছে এমন এবং তিনটি নৌকায় এই তিন ত্রিদেব বিহার করেন।

মিল এইখানেই শেষ নয়। আরও আছে।

সমুদ্রে পরিত্রাণ ঘটানো নাসত্য-আশ্বিন্ দেবতাদের বিশেষ কর্ম। শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রের ধারে (—গোড়ায় তীরের নিকটে সমুদ্রগর্ভে?—) প্রথমে শিলাস্তূপ বা শৈল এবং পরে অট্টলা অথবা মন্দির, এই দেবতার স্মারক এবং এখনকার আলোঘরের মতো কাজের জন্যেই কি আগে ব্যবহৃত হত? চণ্ডীমঙ্গলে সমুদ্রগামী বণিক ধনপতি ও শ্রীপতি বহু দূর থেকে নীলাচল মন্দিরের চূড়ায় "শতেক হাথ নেতের পতাকা" উড়তে দেখে আশ্বস্ত হয়ে নীলাচলের দেবতাকে বন্দনা করে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরতে পারলে মন্দিরের দেওয়াল সোনায় মুড়িয়ে দেবে।

আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি এ দেশে পৌঁছবার আগেই এ স্থানের মাহাত্ম্য ছিল হয়ত। তবে অশ্বিন্‌দের মাহাত্ম্য বহু বহু কাল আগে থেকেই প্রাক্-আর্য মাহাত্ম্যকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল তা অনুমান করতে পারি।

এই প্রবন্ধে আমার বক্তব্য হল এই যে, আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রীক্ষেত্রের ঠাকুর তৃতীয় খ্রীস্টপূর্ব সহস্রাব্দী থেকে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর এই প্রায় শেষ পর্যন্ত পাঁচ হাজার বছরের যেন অখণ্ড জের টেনে এসেছে।

রথযাত্রা

শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমপুরী ও ত্রিদেব

হাজার বারশ বছর আগে থেকে উড়িষ্যার (তখন নাম কলিঙ্গ) পূর্বপ্রান্তের এক অঞ্চল প্রাচীন দশার্নের প্রান্তভাগ দেবস্থান রূপে সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত হয়েছিল। এই অঞ্চলের এক প্রান্তে সমুদ্র থেকে দূরে বন পাহাড়ি অঞ্চলে শিবস্থান বলে অধুনা প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল অষ্টম নবম শতাব্দী থেকে। তার দু-চার শতাব্দী পরে থেকে বিষ্ণুস্থান বলে অধুনা সর্বপরিচিত পুরী—সমুদ্রের এক রকম উপরে—খ্যাতি লাভ করতে থাকে। উড়িষ্যার রাজাদের স্থাপত্য স্পৃহা এই দুটি দেবস্থানকে ভারতবর্ষের প্রধান তীর্থস্থান বলে ঘোষণা করে এসেছে। পুরীর মাহাত্ম্য অনতিবিলম্বে ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার কারণ বোঝা দুরূহ নয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের অবস্থিতি পুরীমাহাত্ম্য কাহিনীর শেষ অধ্যায় রচনা করে দিয়েছে।

সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে ভুবনেশ্বর ও পুরী দুটি দেবস্থানেরই উল্লেখ আছে। মহাভারতে পাণ্ডবদের তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে পুরীর—তখন নীলশৈল বা নীলাচল নামে প্রসিদ্ধ - মাহাত্ম্য যেভাবে বর্ণিত আছে তাতে এস্থানটি অনেক প্রাচীনতর বলে মনে হয়। হয়ত এখানে প্রাগার্য মানুষের দেবপীঠ ছিল। তার কিছু যে রেশ নেই তা নয়, কিন্তু আমাদের নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা সে বিষয়ে যে পরিমাণে মুখর সে পরিমাণে প্রমাণসহ নয়। একথা পরে বলছি।

শিবক্ষেত্রের প্রাচীন নাম ছিল 'একাম্র কানন' (অর্থাৎ একটি আম বাগানের বাগান)। আমি অনুমান করি নামটি আসলে ছিল 'একাম্ব কানন' অর্থাৎ "এক নারী ব্রহ্মচারী" শিবের যোগোদ্যান। এখানে মনে করতে হবে যে, ভুবনেশ্বরে কোন প্রাচীন দেবীপীঠ নেই। এখানে সবই লিঙ্গরাজ।

পুরী—যা আমি বিষ্ণুক্ষেত্র বলে নির্দেশ করেছি তা হয়ত আগে দেবীক্ষেত্র ছিল। দেবী মানে সৌম্য শান্ত সু-ভদ্রা জগৎধাত্রী দেবী। সেই কারণেই এ স্থানের প্রাচীন নাম 'শ্রীক্ষেত্র'। (নামটি আসলে 'শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র' নামের সংক্ষিপ্তরূপ হতেও পারে।) কোনো এক সময়ে এই নীলশৈলবাসিনী নিত্যা

দেবীর সঙ্গে বৈদিক উষানাসত্যের উপাসনা জড়িয়ে যায়। তখন থেকে এখানে বলদেব-সুভদ্রা-কৃষ্ণ এই ত্রিদেবের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। এই তিন "মাধব" দেবতার পূজার নজীর অন্যত্রও মিলেছে। কয়েক বছর আগে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চলে এই তিন দেবতার প্রতিকৃতি সহ প্রত্নলেখ মিলেছে। সে প্রত্নলেখ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর।

নীলাচল যে আগে দেবীধাম ছিল একথা বলবার পক্ষে বিশেষ যুক্তি আছে। সে যুক্তি এই এদের নিয়েই। আমাদের বৈদিকতার ঐতিহ্যে দেবী-উপাসনার সঙ্গে বিষ্ণু-উপাসনার তেমন কোন বিরোধ অথবা দ্বন্দ্ব ছিল না, যেমন ছিল কিছু কিছু শিব-বিষ্ণুর উপাসনা নিয়ে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মহাদেবী দুর্গা-পার্বতীর উপাসনা প্রথম থেকেই বিষ্ণু-উপাসনার সহযোগী ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী বিষ্ণুর আবেশিনী শক্তি মহামায়া নিদ্রা। হরিবংশে দেবী নিদ্রা বিষ্ণুর ভগিনী রূপে অবতীর্ণা। হরিবংশের সব কাহিনীতেই বৃষ্ণিবীরেরা দেবীর স্তব করে উদ্ধারের পথ পেয়েছেন।

পুরীর ত্রিদেবতার মূর্তি অত্যন্ত বীভৎস Crude ও আদিম ধরনের হলেও কোন আদিম দেবতার নয়। এ মূর্তি তিন "মাধব" দেবতারই। আগে যে প্রত্নলেখের কথা বলেছি, তাতেও ত্রিদেবের ছবি আছে এবং তা বীভৎস নয়। আসল কথা হল যখন প্রথম মূর্তি গড়া হয় তখন যাঁরা খোদাইকর ছিলেন তাঁদের মূর্তিশিল্প বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদিম স্তরের ছিল। এখানে অবশ্য তর্ক উঠতে পারে। এখানে যে আদিম এক বা একাধিক দেবমূর্তি ছিল—ছিল যে তা যদি ধরে নেওয়া যায়—সে দেবমূর্তির রূপচণ্ড অন্যরকম ছিল হয়ত। পরে যখন "মাধব" দেবতাদের আরোপ করা হল তখন একটিকে স্ত্রী মূর্তিতে এবং অপর দুটিকে সাদা ও কালো রঙের পুরুষ মূর্তিতে রূপান্তরিত করা হল। অবশ্য বেশভূষা ছাড়া আর কিছুতে এই ত্রিদেবের মধ্যে লিঙ্গভেদের লক্ষণ নেই। (অন্তত আমার জানা নেই।)

প্রাচীন কালের বিরাট ভূভাগ সম্পর্কের এই পূর্বপ্রান্তের স্থানীয় চিরন্তন অধিবাসীদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির কিছুমাত্র চিহ্নাবশেষ যে পুরীর ত্রিদেবের সম্পর্কে এখন নেই তা বলা চলে না। মূর্তিগুলি নিমকাঠের তৈরি। সে কাঠ আনতে হয় গহন অরণ্য থেকে। সে কাঠুরিয়াও এক বিশিষ্ট গোষ্ঠীর "আদিবাসী" শবর। বারো বছর অন্তর দেবমূর্তির কলেবর পরিবর্তন হয়। তখন সেই শবর সম্প্রদায়ের ডাক পড়ে। এই জাতির নাম শবর সম্বন্ধেও এখানে একটু বলবার

আছে। কলিঙ্গে একদা যোগী ও শৈব লিঙ্গ সম্প্রদায়ে বড় আড্ডা ছিল। শৈব-তান্ত্রিক যোগী-সম্প্রদায়ে শিব ও পার্বতী শবর-শবরী রূপে গীত হয়েছেন। একথাও স্মরণ করতে হবে যে, বিন্ধ্যবাসিনী মহাদেবী মহাভারতে ও অন্যত্র কিরাতিনী রূপে বর্ণিত হয়েছেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যে মহাদেবী নিত্যাকে প্রধানত দুটিরূপে পাই। প্রাক্-পুরাণিক সাহিত্যে "যক্ষিণী" হৈমবতীরূপে, পৌরাণিক সাহিত্যে "কিরাতী" বিন্ধ্যবাসিনীরূপে। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, দুটি দেব ভাবনাই পর্বত ঘটিত-"পর্বতী" এবং দুর্গম স্থানবাসিনী—"দুর্গা" হৈমবতীর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক আছে, বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গে শিবের কোন রকম সম্পর্ক নেই,—তিনি কুমারী, ব্রহ্মচারিণী।

হৈমবতীর প্রথম উল্লেখ পাই কেনোপনিষদে। এঁর বাল্যকথা ও যৌবন কাহিনী পাই কালিদাসের কুমারসম্ভবে, এবং তার অনেককাল পরে লেখা শিবপুরাণে। অন্যথা পুরাণকাহিনীতে হৈমবতীর কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। ইঁনি শিবের ভার্যা ও সহচরী বলে স্বীকৃত হয়েছেন এইমাত্র।

শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম পুরীর "মাধবী" দেবী সুভদ্রায় আমরা পুরোপুরি দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর স্বরূপটি দেখতে পাই। তিনি কুমারী, থাকেন দুই ভায়ের সঙ্গে। তিন ভাই বোন এক বাপের কিন্তু তিন মায়ের সন্তান। বলদেব রোহিণীর, সুভদ্রা যশোদার আর কৃষ্ণ দেবকীর। ঋগ্‌বেদের কবিতা থেকে জানা যায় যে এই ভাবে বাস করতেন সুভদ্রার পূর্বতন প্রতিরূপে নিশাটিযা ও দস্র ও নাসত্যের সঙ্গে। (ঋগ্‌বেদের দস্র পুরাণের কৃষ্ণ, ঋগ্‌বেদের নাসত্য পুরাণের বলরাম।)

হরিবংশ, যাতে মহাদেবীর পুরাণ কথা সবার আগে মিলছে—থেকে জানতে পারি যে, দেবকীর কন্যাকে যখন কংস পাথরে আছড়ে মারতে যায় তখন কন্যার আত্মা দেহকোষ ছেড়ে ফেলে চিল হয়ে আকাশে উড়ে যান এবং স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের পূজা পান জগদ্ধাত্রী মহাদেবীরূপে। এই রূপে তাঁর যে carrier আরম্ভ হল স্বর্গে তা পরে মর্ত্যেও প্রচলিত হল। দেবী কুমারীই রয়ে গেলেন।

কৃষ্ণ-ভগিনীর যে মর্ত খোলস পড়ে রইল তার উল্লেখ পাচ্ছি একেবারে মহাভারতের ঘটনায়। তাঁর নাম সুভদ্রা। (মহাদেবীর দুটিরূপ ছিল, এক চণ্ডী, কালী, ভৈরবী—বৈদিকে নক্ত, রাত্রী আর এক ভদ্রা, অন্য বৈদিকে উষা। সুভদ্রা নামেই দেবীর প্রসন্নরূপ বোঝাচ্ছে।) সুভদ্রা কিন্তু কুমারী রইলেন না। তাঁর বিয়ে হল অর্জুনের সঙ্গে। এখানে একটু ভাববার কথা আছে। বলদেবের

খুব আপত্তি ছিল এই বিয়েতে, তিনি সুভদ্রাকে কাছ ছাড়া করতে চান নি। তিনি যে নাসত্য। আর অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে ব্যাপারটাও খানিকটা যেন কারচুপির মতো। অর্জুন হলেন ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের স্বরূপ। তাঁর সঙ্গে বিয়ে মানে ইন্দ্রের দ্বারা দেবীর পূজারই ভাবান্তর। এইভাবে দেখলে সুভদ্রার বেলায়ও দেবীর কুমারীত্ব ঠিক ঘোচে না। দু'পক্ষেই যে ইন্দ্র।

ঊষা দস্র ও নাসত্য প্রাচীন বৈদিক দেবতা সন্দেহ নেই। তবে এঁদের নিয়ে প্রাচীন বৈদিক সমাজে কিছু দলাদলি ঘটেছিল। ইন্দ্র-উপাসক উচ্চতর পুরোহিত সমাজে এঁরা পূজা হিসাবে তেমন পাত্তা পেতেন না।

ঊষার নামে অনেক স্তব আছে ঋগ্‌বেদে। কিন্তু কোন যজ্ঞ কার্যে ঊষাকে হব্য দেওয়া হত না। ঊষা যেন অন্তঃপুরিকা ছিলেন। আর দস্র ও নাসত্য ঋগ্‌বেদে "অশ্বিণ্য অশ্বিনৌ" অর্থাৎ ঘোড়সওয়ারদ্বয়রূপে বর্ণিত – যজ্ঞকাণ্ডে হব্যলাভের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে, যদিচ এঁরাও খুব প্রাচীন ছিলেন। আসল কথা হল এই যে, এই তিন দেবতা—যা পরবর্তীকালে তিন 'মাধব' দেবতার রূপ নিয়েছেন—তাঁরা ছিলেন ঘরোয়া দেবতা। তাঁদের পূজা করত গৃহস্থ অথবা আর্ত, বিপন্ন ব্যক্তি সাংসারিক মঙ্গলের জন্যে, বিপদ-উদ্ধারের জন্যে। এই কারণে বাইরের ব্যাপার যজ্ঞকাণ্ডগুলিতে এঁদের আহ্বান করে হব্য দেওয়া হত না। ঊষা ও দস্র-নাসত্য ঘরোয়া দেবতা বলেই বিবাহের অনুষ্ঠানে তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল বৈদিক সময়ে এবং তারও অনেক আগে থেকে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে বিবাহ উৎসব ঘটিত যে সূক্তটি আছে (৮৫) তাতে এই ত্রিদেবের ঘরোয়া রূপের বেশ একটু পরিচয় রয়েছে। এই পরিচয়ের কথা পুরীর রথযাত্রার প্রসঙ্গেও বলব।

পুরীর মন্দির দেব-আরাধনার আয়তন নয়, রাজাধিরাজ দেবতার নিলয় প্রাসাদ। এখানে যা হয়ে আসছে তা স্মৃতিশ্রুতি শাস্ত্রোক্ত আরাধনা বা যজ্ঞকাণ্ড নয়। এ হল দেবতার প্রাত্যহিক আবরণ-উৎসব। সারাদিন দেবতার দেহচর্চা ও ভোজন গান নৃত্যগীত বিলাস। বৈদিক ত্রিদেবের ধারাই যেন অনুসৃত হয়েছে পুরীর ত্রিদেবের চর্যাবিধিতে। এখানে দেবতা যেমন স্বতন্ত্র তার পরিচর্যাবিধিও তেমনি পৃথক্। পুরীর দেবপূজা ব্রত বা যজ্ঞকাণ্ড নয়। তা যেন সত্র-উৎসব। এখানে জনবোধে তাই "অন্নং ব্রহ্ম"। পুরীর দেবতার কোন পুরোহিত নেই। আছে সেবক, প্রতীকক (পড়িছা)—বেত্রধারী রাজার কঞ্চুকী, প্রতিহারের মতো।

প্রধানতম উৎসব হল রথযাত্রা। বলতে গেলে এইটিই সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুদের একমাত্র সর্বসাধারণ্য ধর্ম-উৎসব (—অনুষ্ঠান নয়, যাত্রা দেখা।) আষাঢ় মাসের নির্দিষ্ট তিথি দিনে জগন্নাথ (কৃষ্ণ) সুভদ্রা ও বলভদ্র তিনটি রথে চড়ে মূল মন্দির থেকে কিছুদূরে গুণ্ডিচায়—অর্থাৎ বাগানবাড়িতে যান। সেখানে সাতদিন থেকে আটদিনের দিন আবার মূল মন্দিরে ফিরে আসেন। এই যাওয়া আসাই হল রথযাত্রা উৎসব। এ ব্যাপারকে চাতুর্মাস্যের সংক্ষিপ্তরূপ বলতে পারি। বর্ষা চার মাসের বদলে সপ্তাহ খানেক নিশ্চিন্তে কাটিয়ে আসা। কিম্বা বিবাহ যাত্রার পূর্বরূপও ধরতে পারি। প্রথমদিন বিবাহসভায় গমন, আট-দিনের দিন অষ্টমঙ্গলা, প্রত্যাবর্তন।

এইখানে ঋগ্‌বেদের সূক্তটি স্মরণ করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, অশ্বিদ্বয় সূর্যকন্যার "বর" অর্থাৎ প্রধান কন্যাযাত্রী (৮.৯) এবং সূর্যকন্যার তিনচাকার রথে অশ্বিরা সঙ্গী ছিলেন (১৪)। এখানে জগন্নাথ ও বলরাম সুভদ্রার সঙ্গী। তবে যাত্রা একটিমাত্র তিনচাকার শকটে নয়, তিনটি চার চাকার রথে।

এই সব নানাদিক বিবেচনা করে মনে হয় সুভদ্রাই ছিলেন নীলাচলের একদা মুখ্য দেবতা। তিনি বৈদিক উষার প্রতিরূপ। উষা পূর্ব শৈলে উদিত হন।

সিদ্ধিদাতা দেবতা

এখনকার দিনে হিন্দুসমাজের পূজার ব্যাপারে যে বিবিধ দেবদেবীর পূজার কম বেশি জাঁকজমকে অনুষ্ঠান প্রচলিত আগে হয়েছে অথবা হচ্ছে তার মধ্যে গণেশকে ধরা যায় না। অথচ গণেশের উঠতির অনেক সুযোগ ছিল এখনকার দিনে ধনপতিদের সর্বাধিকারিত্বে। কিন্তু হায় প্রাচীন গণদেবতার যে নবীন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটেছে তাতেই সেকেলে অপদেবতা-দেবতার অধিকার প্রসারের সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে (মহারাষ্ট্রের নজীর সত্ত্বেও)।

এখনকার পাঠক প্রবন্ধের মধ্যেও রস পেতে চান, কিন্তু আমার প্রবন্ধ অসার নয়। সারে কিছু কঠিন পদার্থ অবশ্যই থাকে। সেটুকু যথাসম্ভব বাদ দিচ্ছি। পণ্ডিতেরা যেন দোষ না ধরেন।

গণদেবতার সূত্রপাত ঋগ্‌বেদে। এঁরা ঠিক এক নম্বর দেবতা নন, দুয়ের নম্বরও নন। তিনের নম্বর বটে কিন্তু মর্যাদায়—যদি ঋগ্‌বেদে মরুৎ-সূক্তের সংখ্যা তাঁদের মর্যাদার দ্যোতক হয়—তবে অনেক প্রথম শ্রেণীর দেবতারও উপরে।

ঋগ্‌বেদে মরুৎ কোন একটি দেবতাকে নির্দেশ করে না। মরুৎ বলতে বোঝায় এক সমগোত্র দেবতাসমষ্টি (গণ)। সংখ্যায় তাঁরা একশ বিশ অথবা একুশ। এঁরা সবাই ভাই। পিতা রুদ্র, মাতা পৃশ্নি। এঁরা ভীষণ মূর্তি, বীর, শোভন বেশ, নানা অস্ত্রধারী। মরুৎরাই দেবতাদের সৈন্যবাহিনী। এঁদের সেনাপতি ইন্দ্র অথবা বায়ু (বেদে এঁদের বায়ুর সন্তান বলেও উল্লেখ করা হয়েছে)। এই কারণে ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র (এবং বৃহস্পতি) "গণপতি" বলে উল্লিখিত হয়েছেন।

বৈদিক কালের পরে মরুৎ নামটি লুপ্ত হয়ে গেল। তবে পূর্বতন মরুদ্‌গণ যুক্ত হয়ে রইল রুদ্র-শিবের সঙ্গে। কিন্তু পরস্পর ভ্রাতৃত্ব প্রায় ঘুচে গেল। তাঁরা আর শোভনবেশধারী যোদ্ধা রইলেন ন—বোধ করি এক বীরভদ্র ছাড়া—এবং তাঁরা সবাই বিকৃত মৃত ভূত-পিশাচের আকার নিলেন। (এইখানে মনে হয় ঋগ্‌বেদে মরুদ্‌গণের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে দ্বিতীয় ধারণা ছিল, বায়ুর থেকে—সেই ধারণারই স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ আর বায়ুপুত্র মরুদ্‌গণ ঋগ্‌বেদে এক হয়ে গিয়ে বায়ুপুত্রদের চাপা দিয়ে রেখেছিল, বৈদিক পরবর্তী-কালে বায়ুপুত্ররাই রুদ্রপুত্রদের লোপসাধন করলে)।

রুদ্রের গণের আমরা নন্দী ভৃঙ্গীকে জানি। নন্দী হচ্ছে গোমুখ, অর্থাৎ গো-ভূত, আর ভৃঙ্গী ভোমরা ভূত। এক সঙ্গে বিচার করলে গণেশ হাতিমুখো ভূত। নাম থেকেই বোঝা যায় যে হাতিমুখো ভূতই রুদ্র-শিবের অনুচরগণের প্রধান ছিল।

তারপরে—অনেককাল পরে, যখন প্রধান প্রধান পুরাণগুলির রচনার পাট চুকে গেছে তখন দেখা দিলেন নবীন দেবতা, লেখক গণেশ। মহাভারতের শেষ সংস্করণ তৈরি হবার আগেই ইনি দেখা দিয়েছেন মহাভারত রচনার সময়ে কবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের উক্তির শ্রুতিলেখক—অর্থাৎ এখনকার স্টেনোগ্রাফার—ডিক্টেশন লেখক রূপে। গল্প বলে যে গণেশ এত তাড়াতাড়ি লিখে যেতেন যে ব্যাসদেব সব সময় কথা যুগিয়ে দিতে পারতেন না। তিনি গণেশের দ্রুত লেখন শ্লথ করার জন্তে মাঝে মাঝে শক্ত কথা ব্যবহার করতেন। এ সব কথার মানে বুঝে নিতে গণেশের একটু দেরি হত, আর সেই অবসরে বেদব্যাস তাঁর বক্তব্য ভেবে গুছিয়ে নিতেন। বলতে ভুলে গেছি যে লিখতে বসবার আগে গণেশ বেদব্যাসকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে বলতে বলতে থামা চলবে না। বেশিক্ষণ থামলেই তিনি আর লিখবেন না। বেদব্যাস চতুর লোক, তিনি গণেশের বিদ্যার দৌড় জানতেন। তিনিও গণেশকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিয়েছিলেন যে অর্থ না বুঝে গণেশ কিছু লিখতে পারবেন না। এই কারণে মাঝে মাঝে অপরিচিত শব্দ ছেড়ে দিয়ে গণেশকে থামিয়ে রাখতেন নিজের সুবিধার জন্তে।

এই হল গণেশের সিদ্ধিদাতা মাহাত্ম্যের সূত্রপাত। এখন দেখা যাক, গণেশের এই মাহাত্ম্য আমদানি হয়েছিল কোন্ পথে।

হস্তিমুখ দেবতা গণেশ একদা যে হস্তিস্বরূপ দেবকল্প ভাবনা ছিল সে অনুমান করার পথ আছে। খুব প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশের স্থাপত্যে গজলক্ষ্মীর মূর্তি মিলেছে। পদ্মের উপর আসীন দেবী, দুটি হাতি দুদিক থেকে তাঁর মাথায় জল ঢালছে। এই ছবি ছিল তখনকার দিনের শক্তিসমৃদ্ধির দেবতার প্রতীক। এই ছবির দুটি অংশ একদা স্বাধীন ছিল—হাতি ও দেবী—সে কথা তারা চলে। হাতি ছিল এক সমাজের মান্য রূপক, পদ্মাসনা দেবীমূর্তি অন্ত সমাজের। ঋগ্‌বেদে 'ইভ্য' শব্দটি আছে, মানে সমৃদ্ধ, ধনী। শব্দটি অশোকের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে 'ইভ' শব্দ থেকে, মানে হাতি। যারা হাতি পুষত অথবা যারা হাতির দাঁতের

ব্যবসা করত এমন ধনী বণিকরাই 'ইভ্য' নাম পেয়েছিল। বণিকদের সম্পত্তি বলতে দুরকম—এক সোনারুপোর ভাঁড়ার—যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমুদ্রবাসিনী শ্রী, দুই হিসেবের খাতাপত্র—যার রক্ষণকারী হল হাতি। (এখানে আরও একটু বলা যায়। হাতি, নাগ-একদা কুবেরের অনুচর বলে খ্যাত ছিল। সুতরাং এখানে হাতি কুবেরের প্রতিনিধিও হতে পারে।) অনুমান করি, এই সূত্রেই আমাদের দেশে বিশিষ্ট লেখবার রীতি চালু হয়েছিল বিদেশ থেকে এবং বণিকদের দ্বারা। তাই গণেশই লেখক দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

বণিকদের লাভই সিদ্ধি। তাই গণেশ হলেন সিদ্ধিদাতা। তাঁর মূর্তিতে এক হাতে যে নাড়ু অথবা জাম্বির (নেবু) দেখা যায় তা হল সিদ্ধির অর্থাৎ টাকার থলির প্রতীক। কোন কোন প্রাচীন মূর্তিতে থলি দেখা যায়। সে টাকার থলি। ('সিদ্ধি' কথাটির আসল মানে নষ্ট হওয়ায় ভাঙ অর্থ এসে গেছে।)

একটু পিছু ফেরা যাক। রুদ্র-শিবের মুখ্য অনুচর গণেশের যে ভয়ঙ্কর রূপ তাতে তিনি কোন কোন সমাজে ভীষণ ভয়ের প্রচণ্ড বিঘ্নের অপদেবতা বলে গণ্য ছিলেন। এই দৃষ্টিতে তিনি পূজা পেয়েছিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে, জম্ভল নামে। এই নামের যে মূর্তি মিলেছে তাতে গণেশের সঙ্গে যথাসম্ভব মিল আছে। তবে মুখ সবসময় হাতির মতো নয়। তবে সর্বদা ভুড়ো পেট। বিঘ্নরাজকে পূজা করতে হত বিঘ্ন অপহরণের জন্যে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচার থেকে হিন্দু অনুষ্ঠানেও সবার আগে বিঘ্নবিনাশন গণেশের পূজার চলন হয়েছে।

গণেশের বাহন ইঁদুর, কেননা কৃষিজীবী বাঙালীর কাছে ইঁদুর সবচেয়ে অনিষ্টকারী জীব। তার মতো ফসলের ও সঞ্চিত মূল্যবান দ্রব্যের ক্ষতি আর কোন প্রাণী করে না।

এখন গণেশ সম্পর্কে একটু অবাস্তব কথা বলতে হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা হল যে গণেশ দেবী দুর্গার (এবং শিবের) পুত্র। শিবের পুত্র গণেশকে বলা যায়, যেহেতু তিনি গোড়ায় এক স্বরূপে ছিলেন রুদ্রপুত্র মরুৎ। কিন্তু তাঁকে দেবীপুত্র বলবার কোন বৈদিক অথবা পৌরাণিক সূত্র নেই। এ সম্বন্ধে যে পুরানো গল্প আছে তা প্রথম বলে গেছেন কবিকঙ্কন মুকুন্দ। এঁর মতে গণেশ হল গড়া দেবতা। পার্বতীর গায়ের ময়লা জড় করে তাঁর সখী তাঁর জন্যে খেলার পুতুল গড়ে দিয়েছিল। ময়লা ফুরিয়ে যাওয়ায় মাথাটি গড়া হয় নি। শিব এসে তা দেখে হাতির মাথা কাটিয়ে এনে জোড়া তা

জোড়া দিয়ে পুতুলকে সঞ্জীবিত করে দেন এবং দেবীকে বলেন এই নাও তোমার ছেলে। এ কাহিনীর সঙ্গে গণেশের দেবত্বের বা পূজাপালার কোন সম্পর্ক নেই। শুধু আছে দুর্গা প্রতিমার অস্তিত্বের কারণে।

এখন আসা যাক মূল বক্তব্যে। ব্যবসায়ীদের নববর্ষে—পয়লা বৈশাখই হোক আর অক্ষয় তৃতীয়াই হোক— কেন গণেশ পূজা করে হালখাতা করা হয়।

যে আলোচনা করা হল তার মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। প্রাচীনকালে গজলক্ষ্মী বণিকদের উপাস্য দেবতার প্রতীক ছিল। এই প্রতীকের দুটি অংশ গজ (পুরুষ) ও লক্ষ্মী পরে পৃথকদের দেবসত্তায় পরিণত হয়। লক্ষ্মীরূপে দেবী বণিক-অবণিক নির্বিশেষে সকলেরই গৃহসম্পদের আরাধ্য দেবী। আর গজ গণেশে পরিণত হয়ে ক্রমশ ব্যবসায়ীদের হিসাবের খাতা লেখা দেবতায় পরিণত হয়েছেন। সিদ্ধিদাতা দেবতা, যিনি একদা বিঘ্নরাজ ছিলেন, তাঁর এই পরিণতি অপ্রত্যাশিত নয়। মহাভারতের লেখক দেবতা ব্যবসায়ীদের মহাখতিয়ান দেবতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করা আমাদের দেশের জলবায়ুর ধাতে খুবই প্রত্যাশিত।

কেউ কেউ এখানে মারাঠাদের প্রভাব কল্পনা করতে পারেন। মারাঠা দেশে গণেশ পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। এর থেকে কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠারা উড়িষ্যায় থেকে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর, এবং ব্যবসায়ীদের গণেশ পূজা হয়ত সেই সূত্রেই এসে থাকবে। এ কথা ভাববার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের ব্যবসার কেন্দ্র কিছু কিছু উড়িষ্যায় ছিল কিন্তু তাই থেকে গণেশ পূজা প্রচলনের কল্পনা অসার। আসলে মারাঠায় এবং বাংলাদেশে এসেছে একই পৌরাণিক সূত্র থেকে। বরঞ্চ এমন কথা মনে করা যেতে পারে যে, ব্যবসার সূত্রে উড়িষ্যা দেশে বাঙালি বণিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে মারাঠাদের গণেশ পূজার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়েছিল। বাঙালি গণেশ পূজা করত দুর্গা পূজার মধ্য দিয়ে আজ অন্তত হাজার খানেক বছর। এ পূজা মারাঠাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এবং তা যে বাংলাদেশের প্রভাবে নয় তা কে বলবে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদা

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য আর ভারতচন্দ্র রায় দেবীমাহাত্ম্য কাব্যের বড় কবি এই তিনজন। এঁরা একই অঞ্চলের লোক,—জন্ম অথবা কর্ম, কিংবা জন্ম ও কর্ম সূত্রে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ভূমিকা রূপে যে শিব-গৌরীর কাহিনী আছে তা রামেশ্বরের শিবসংকীর্তনে যথাসম্ভব কালোপযোগী রূপ নিয়েছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম উপাখ্যান সে কাহিনীর উজানবাহী রূপান্তর হলেও তাতে স্থানকালোপযুক্ত স্বাভাবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে।

চণ্ডী ও দুর্গা আসলে একই দেবী। চণ্ডী বিন্ধ্যবাসিনী, আরণ্যক-উপাস্য। দুর্গা দুর্গমদেশাধিষ্ঠাত্রী। শিবের ভার্যা গৌরী হলেন হিমবৎকন্যা উমা। উপনিষদে ইনি ব্রহ্মজ্ঞা উমা হৈমবতী। শিব-রুদ্রের সঙ্গে এঁর সম্পর্কের কোনই ইঙ্গিত নেই সেখানে।

দুর্গা মঙ্গলচণ্ডী, অর্থাৎ প্রচণ্ডা স্ত্রীদেবতার মঙ্গলময়ী মূর্তি। ইনিই ঋগ্-বেদের অরণ্যদেবতা—অরণ্যানী—যিনি মৃগমাতা এবং অনায়াস-অন্নদায়িনী। তাঁর প্রতীক গোধা। কালকেতুকে ছলেছিলেন তিনি গোধা রূপে, আর অনুগ্রহ করেছিলেন ষোড়শী মূর্তিতে। এই মূর্তি উপনিষদের উমা হৈমবতীর মত "বহু-শোভমানা"। এইখানে দুর্গা-উমার মিল হয়েছে।

মুকুন্দরামের কাহিনীতে শিব-গৌরীর সংসারের যে চিত্র আছে তাতে সাময়িক অসচ্ছলতার ইঙ্গিত আছে, বারোমেসে দৈন্যের চিহ্ন নেই। শিব যোগী আজীবিক, সুতরাং ভিক্ষা তাঁর উপজীবিকা। ভিক্ষায় বেরলে তিনি ভিক্ষা পান প্রচুর আর সসম্ভ্রমে। সংসারে অনটন ভিক্ষার অপ্রাচুর্যহেতু নয়, তা শিবেরই আলস্যের জন্যে। সুতরাং দেবী প্রতিকার খুঁজতে বাধ্য হলেন স্থায়ী বন্দোবস্তে। তিনি মর্ত্যে পূজা নিলেন বঙ্গভূমি কলিঙ্গে, প্রথমে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছ থেকে, তারপরে প্রজা কালকেতু ও খুল্লনার কাছ থেকে। আর তাঁর অন্নচিন্তা রইল না।

মুকুন্দরামের প্রায় আড়াইশ বছর পরে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর শিবসংকীর্তন কাব্য (যা এখন শিবায়ন নামে পরিচিত) রচনা করেন। এই আড়াইশ বছরের মধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেসবের মধ্যে চাষী গৃহস্থের

আর্থিক দুর্গতি সর্বাধিক শোচনীয়। এখন ধনপতিরা আর সিংহল পাটনে বাণিজ্য যাত্রা করে না, তারা মুনিষ দিয়ে চাষ করায়। মোটা ভাতকাপড়ের হয়ত অভাব সর্বদা ছিল না, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা ঐ "পেট ভরি অন্ন" আর "হাঁটু ভরি বস্ত্র" পর্যন্ত। মানবের এই দুর্গতি দেবতাকেও কাবু করেছে। রামেশ্বরের শিব এক-ছেলে চাষী আর গৌরী তাঁর সেই দরিদ্র একমাত্র সংসারের কর্ণধার গৃহিণী। দরিদ্র, তবে ভদ্র এবং দেবতা।

ভারতচন্দ্র কাব্য লিখলেন রামেশ্বরের প্রায় বছর পঁচাশ পরে। ইতিমধ্যে দেশের আর্থিক অবস্থা কোন কোন অঞ্চলে খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মান সক প্রগতি বিশেষ হয়নি। কিছু পরাগতিই হয়েছে বলতে হয়। রামেশ্বরের তুলনায় ভারতচন্দ্র অনেক বিদ্বান ও বিদগ্ধ কবি। কিন্তু ভক্তি-প্রণোদিত সহৃদয়তায় ভারতচন্দ্র রামেশ্বরের কাছে অবশ্যই খাটো। দেবতা-ভক্তি ভারতচন্দ্রের ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু আস্থা তেমনি ছিল কি। গুণাকর কবি বহুদর্শী। ফাসিপড়া আর চাটু পটু ভাষী। তাই তিনি দেবতাকে মনের মানুষ, ঘরের ঠাকুর করে নিতে পারেন নি। তাঁকে পূজা করেছেন অন্নদাতার ভাগ্যদেবী রূপে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদা (বা অন্নপূর্ণা) মুকুন্দরামের মঙ্গলচণ্ডীরই আবশ্যকানুরূপ সংস্করণ। তবে অবোলা পশুর সঙ্গে, অবোধ আরণ্যকের সঙ্গে, অবলা নারীর সঙ্গে তাঁর আর সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। তিনি এখন ধনীর পালিকা। শিবের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক যেন পাল্‌টে গেল। শিবরুদ্রের সঙ্গে চণ্ডীর একদা বিরোধ ছিল। যে বিরোধের ইতিহাস মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে অস্পষ্টভাবে আছে এবং যে বিরোধের জড় পৌঁছয় আর্য-অনার্যের সংঘর্ষে। আর্যের দেবতা রুদ্র পশুপতি পশুর পালক অর্থে নয়, পশুর রাজা পশুর শাসক অর্থে। রুদ্রের কোপ থেকে পশুদের বাঁচাবার জন্যে বৈদিক ঋষিরা রুদ্রের স্তব করতেন। বৈদিক রুদ্র ছিলেন পশুব্যাধ। (কালকেতুর মধ্যে তারই কিছু আভাস। কালকেতুর মত রুদ্রও বে-পরোয়া পশুঘাতী ছিলেন,—"মৃগং ন ভীমম্ উপহত্নুমুগ্রম্"।) আর অরণ্যানী মঙ্গলচণ্ডী হলেন পশুমাতা পশু-পালিকা। শিব-দুর্গার কাহিনীতে এই দৈব বিরোধ দাম্পত্য কলহে রূপান্তরিত। ভারতচন্দ্র সে দাম্পত্য কলহকে সত্যকার বিরোধের মর্মান্তিক দ্বন্দ্বে ঘুরিয়ে এনেছেন। রুদ্র পতিকে বাধ্য করেছেন চণ্ডী পত্নীর কাছে অন্ন ভিক্ষা করতে। মুকুন্দরামের গৌরী স্বামীকে বার বার ক্লেশ না দিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজেই নিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের

এখন বৈদিক রুদ্র ও অ-বৈদিক শিবের মধ্যে মিল ও গরমিল দেখাচ্ছি। আকৃতিতে রুদ্র স্বর্ণোজ্জ্বলকান্তি যুবা পুরুষ, শিব ধবলকায় প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ। বসনভূষণে রুদ্র বিচিত্র অলঙ্কারধারী। তাঁর মাথায় বিনুনিকরা খোঁপা ("কপর্দ", শিবের বিভূতিমণ্ডন, সর্পভূষণ ও জটাভার, পরিধানে গজচর্ম অথবা বাঘছাল। আয়ুধ রুদ্রের ধনুর্বাণ ও বজ্র, শিবের ত্রিশূল। বাহনে রুদ্রের রথ, শিবের বৃষ। বৃত্তিতে রুদ্র রাজা ("ঈশান", শিব ভিখারী। চারিত্র্যে রুদ্র পাপের প্রতি ক্ষমাহীন, কোপন আর শিব শান্ত, ভালোমানুষ—ভোলানাথ। পানে রুদ্রের সোম, শিবের ভাঙ। কলত্র রুদ্রের গাভী ("পৃশ্নি"), শিবের নারী।

আসলে রুদ্র ও শিব স্বতন্ত্র দেবভাবনা থেকে উদ্ভূত, তাদের দেবসত্তা সম্পূর্ণ পৃথক। রুদ্র হলেন দুর্ধর্ষ কোপন দণ্ডনায়ক, শিব হলেন উদাসীন অধ্যাত্মচিন্তক যোগী। তবে রুদ্রের অনেক বিশেষত্ব শিবের উপর ধীরে ধীরে আরোপিত হয়েছে, অথবা দুই দেবভাবনার সংযোগ ঘটেছে। তা যদি ঘটে থাকে তাহলে বলব যে, শিবসত্তারই প্রাধান্য রয়ে গেছে।

রুদ্র নামটির মৌলিক অর্থ হল অশান্ত প্রকৃতি, বজ্রস্বভাব। শিব নামের অর্থ হল কল্যাণকারী, রুদ্রের যে সৌম্য রূপ ("দক্ষিণ মুখ") তাই-ই শিব। বেদে রুদ্র দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীতে শিব মোটেই যোদ্ধা দেবতা নন, তবে তাঁর প্রাক্তন—অর্থাৎ বৈদিক—যোদ্ধৃত্বের স্মৃতি রয়ে গেছে 'পিনাকপাণি' নামে আর জনকের সভায় গচ্ছিত হরধনুতে। বস্তুত বৈদিক রুদ্র ও অবৈদিক শিব সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ও ভিন্ন ধাতের। একজন হলেন ভীষণ রাজা আর একজন হলেন যোগী ভিখারী। রুদ্রের মতো শিব কোপন স্বভাব নন। তাঁর নিদারুণ ক্রোধের যে দুটি একটি গল্প আছে—যেমন দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গে এবং মদন ভস্মে—তা বৈদিক রুদ্র-কাহিনীরই জের টেনেছে।

নাথ-পন্থী যোগীদের ঐতিহ্য বেশ পুরাতন। এঁদের আখ্যানে শিব হলেন যোগীশ্রেষ্ঠ। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরি—এঁরা সব তাঁর অনুজ এবং শিষ্যকল্প অনুচর ছিলেন। শিব পত্নী গ্রহণ করে সংসারী হয়েছিলেন, মৎস্যেন্দ্রনাথেরা তা না করে ভিন্ন পথে চলেছিলেন।

বেদের পশুঘাতী রুদ্রের প্রতিফলন হয়েছে শিবের কিরাত বা ব্যাধ রূপে। মহাভারতের কিরাতার্জুন কাহিনীতে তার প্রমাণ পাই। বাংলা আখ্যায়িকায় তিনি ব্যাধ নহেন তবে ব্যাধের প্রতি তাঁর অনুকূলতার গল্প আছে।

পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানে চণ্ডী দুর্গা ও উমা (পার্বতী) একই দেবী শিব-ভার্যার তিন নাম আসলে কিন্তু তিনটি পৃথক দেবী-ভাবনা। 'চণ্ডী' মানে চণ্ড-প্রকৃতির অর্থাৎ দুর্দান্ত নারী। শব্দটির পুংলিঙ্গ প্রতিরূপ 'চণ্ড' সংস্কৃত অভিধানে শিবের নামমালায় স্থান পেলেও এটি শিবানুচর একটি ভৈরবের এবং চণ্ডী কর্তৃক বিনষ্ট একটি অসুরের নাম। চণ্ডী আসলে তাহলে ভৈরবী। লৌকিক ভাবনায় ভৈরব হল রুদ্রমূর্তি শিবের এক বিশেষ প্রমাণ। ভৈরবী যে পার্বতী নন এবং ভৈরবীর স্বামী ভৈরব যে শিব নন সে স্বীকৃতি লৌকিক আখ্যানে পাওয়া যায়। চণ্ডীর সঙ্গে বিবাদে গঙ্গা তাঁকে "অসুর-ভাতারী" বলে তিরস্কার করেছিলেন।

কালিদাস প্রমুখ সংস্কৃত কবিরা কোপবতী বা মানিনী অর্থে চণ্ডী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই অর্থ গ্রহণ করলে শিবের প্রথম পত্নীকে চণ্ডী বলতে পারি তবে মানে আরও হালকা করে নিয়ে। শিবের সঙ্গে উমা-পার্বতীর দাম্পত্য কলহ হত কিন্তু সে কলহে দেবী কখনো প্রচণ্ডা হননি।

মনে হয় শিবের শক্তি চণ্ডী কল্পনায় বৈদিক রুদ্র-ভাবনার কিছু ছোপ লেগেছে। রুদ্রের কোপ ভয়াবহ, তা এড়াবার জন্যে স্তবস্তুতি করা হত এবং রোগ-অনাময়ের জন্যেও আরোধিত হতেন তিনি, ধনজনলাভের জন্যে নয়। বৈদিক কবির কল্পনায় রুদ্রের রুদ্রত্ব অর্থাৎ কোপনস্বভাব স্বতন্ত্র, তবে অপরিণত দেবসত্তা রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। এঁকে বৈদিক কবি বলেছেন 'মনা'। তাঁদের কাতর প্রার্থনা ছিল,—আমাদের যেন মনার কবলে ফেলে দিয়োনা ("মা নো অন্যৈ······বীরধন্ মনায়ৈ")। মনে হচ্ছে চণ্ডী-ভাবনায় এই মনা-ভাবনার মানবীকরণ (বা মূর্তি-নির্মাণ) ঘটেছে। এখানে মনে করব মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর কাহিনী। সেখানে চণ্ডী সর্বদেবতার সম্মিলিত 'মনা'।

বেদে রুদ্রের মতো লৌকিক কাহিনীতে চণ্ডীর দুটি রূপ। এক রূপে তিনি ভয়ঙ্করী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী, অন্যরূপে তিনি সর্বদেবতার সম্মিলিত 'মনা'

দুর্গা নামের মানে হল দুর্গমস্থানের অধিষ্ঠাত্রী ও দুর্গম পথক্লিষ্ট ব্যক্তির রক্ষয়িত্রী, সঙ্কটে পরিত্রয়িত্রী। বৈদিক দেব-ভাবনায় যিনি অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অরণ্যানী, অনেক কাল পরে তিনিই পূজিত হয়েছেন 'কান্তার দুর্গা' বলে। অরণ্যানী অরণ্যের পশুদের পালন করেন, অরণ্যে বিপন্ন মানুষের জীবন তিনি রক্ষা করেন ফলমূল দিয়ে। প্রায় হাজার বছর আগে লেখা একটি সংস্কৃত শ্লোকে কান্তার দুর্গার (অর্থাৎ বনদুর্গার) পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় এইভাবে—

"গিরিগুহায় শিলাখণ্ডরূপিণী কান্তার-দুর্গাকে বর্বর লোকেরা জীববলি দিয়ে পূজা করে দিনাবসানে বেতের খোলায় পুরানো মদ খেয়ে সহচরীদের নিয়ে নৃত্যগীত করে থাকে।" চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যানের দেবী হলেন এই অরণ্য-চণ্ডী। পশুদের মাতা তিনি, কালকেতুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই তিনি ব্যাধের সন্তানকে রাজা করে দিয়েছিলেন। ধনপতি উপাখ্যানে এই দেবীই তাঁর অনুচরীদের পাঠিয়ে খুল্লনাকে হারা-পশু পাইয়ে দিয়ে সৌভাগ্যশালিনী করেছিলেন।

শিবের পত্নী উমা-হৈমবতীর দেখা পাওয়া গেল প্রথম তলবকার উপনিষদে। সেখানে ইনি "বহুশোভমানা", ব্রহ্মজ্ঞা। শিবের উল্লেখ নেই, তবে তিনিই যে যক্ষরূপী ব্রহ্ম তাতে সন্দেহ নেই। লৌকিক কাহিনীর উমা-পার্বতীর সঙ্গে উপনিষদের উমা-হৈমবতীর মিল শুধু নামেই নয়। দু'জনেই স্বরূপ ও সুবেশ। লৌকিক-কাহিনীর শিব যক্ষ নন, তবে যক্ষদের নেতা। তাঁর নিবাস কৈলাস যক্ষদেরই দেশে।

মনসা সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা (অর্ধপৌরাণিকও বলা যায়, মহাভারতে তাঁর কিছু কাহিনী আছে), তবে তাঁর নামটি পৌঁছয় সেই বৈদিক রুদ্রের 'মনা'-য়। 'মনসা' নাম অবৈদিক হলেও অ-সংস্কৃত নয়, নামটি ব্যাকরণসিদ্ধ করবার জন্যে পাণিনির একটি বিশেষ সূত্র আছে। মনসার কাহিনী শিক্ষিত বাঙালীর অপরিচিত নয়। এ কাহিনীর নিষ্কর্ষ হল—মনসা শিবের কন্যা তবে অযোনিজা এবং জলমধ্যে পদ্মাগর্ভে জাতা। তাঁকে আকৃতি দিয়েছিলেন দেবকার বাসুকি। মনসাকে জলক্রীড়ারত দেখে শিব না জেনে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন। মনসা আত্মপরিচয় দিয়ে পিতৃগৃহে গমনের দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করলে শিব তাঁকে গোপনে ঘরে নিয়ে যান। জানতে পেরে চণ্ডী (দুর্গা পার্বতী) রুষ্ট হন। মনসার সঙ্গে চণ্ডীর প্রথমে গালাগালি, শেষে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। তাতে মনসার একটি চোখ যায়। পরিত্যক্ত মনসা পরে আপনার ভক্তরাজ্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করেন মর্তালোকে। তারই কাহিনী মনসামঙ্গলে বর্ণিত।

মনসার উৎপত্তি জলমধ্যে পদ্মনালে, তাই তাঁর এক নাম পদ্মা। আবার লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে অধিষ্ঠান পদ্মের উপরে, তাই তাঁরও নামান্তর পদ্মা। চণ্ডীমঙ্গলে দেবীর দক্ষিণ হস্ত সহচরী 'পদ্মা'। এ পদ্মা দুয়েরই সমাহার হতে পারে, তবে কর্মতৎপরতার দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে মনসার সম্পর্কই বেশি।

মনসা জলদেবী এবং বিষনাশিনী। সংস্কৃত এবং লৌকিক পুরাণে তাই তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'বিষহরি'। সাপের বিষের মতো তীব্র নাশক শক্তির প্রতিকার বহমান জলধারার সাহায্যে হত। এ বিশ্বাস বৈদিক ঋষিদের ছিল কিনা বলা যায় না, তবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন জলধারায় সব অনিষ্ট ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সুদূর মরুভূমির ওপারে। মনে হয় সর্পদষ্ট মৃতদেহকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া রীতির মূল কথাই তাই।

রুদ্র-শিবের সঙ্গে মনসার একটি বাহ্যিক যোগসূত্র হল সাপের ব্যাপার। লৌকিক কাহিনীতে শিব হলেন সর্প-বিভূষণ, মনসাও তাই। উপরন্তু মনসা সর্পবেষ্টিত ও সর্পবাহন। কিন্তু মনসার এমন মূর্তিও পাওয়া গেছে যাতে সাপের কোন চিহ্ন নেই, দেবী হস্তী-আরূঢ়া। সেখানে হস্তী=নাগ=সাপ। আগেই বলেছি জন্মসূত্রে জলদেবদ্বয় লক্ষ্মী ও মনসা (অর্থাৎ অ-লক্ষ্মী) প্রায় এক। দু' জনেই নাগ-সেবিতা। লক্ষ্মীকে হস্তী অভিষেক করছে, তাই তিনি গজলক্ষ্মী। মনসাকে সাপ মাথায় ছাতা ধরছে, তাই তিনি সর্পদেবী। মনসা যে অলক্ষ্মী তা বোঝা যায় মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের কাহিনীতে আর চণ্ডী-মঙ্গলে ধনপতির কাহিনীতে। উভয়ত্রই দেবী ধনী বণিকের—যাঁরা লক্ষ্মীমন্ত গজলক্ষ্মীর সেবক—অকল্যাণকারিণী। কমলে-কামিনী দৃশ্যে দেবী স্পষ্টতই অ-গজলক্ষ্মী, তিনি গজের দ্বারা অভিনন্দিত নয়, গজের বিনাশকারিণী।

সাপের সূত্র ধরে বিচার করলে রুদ্র, শিব ও মনসার মধ্যে আরও একটু মিল পাওয়া যায়। বেদের রুদ্র চিকিৎসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ("ভিষজাং ভিষক্তমঃ")। লৌকিক শিবও যেন ধন্বন্তরির গুরু, তাঁর অসাধ্য রোগ নেই। এ বিষয়ে বিশেষ কোন কাহিনী নেই বটে তবে প্রসিদ্ধ শিবপীঠে দৈব ঔষধের জন্য ধরনা দেওয়া এখনকার দিনেও অজানা নয়। মনসার নামান্তর 'বিষহরি' থেকেই জানা যায় যে, তিনি বিষহারিণী বিদ্যা মূর্তিমতী। তবে সেই সঙ্গে বিষধারিণীও বটে। তাঁর বাম চক্ষে বিষদৃষ্টি, তাই তাঁর এক প্রসিদ্ধ নাম 'বিষালাক্ষী।' এই নামটি পরে "বিশালাক্ষী" হয়েছে, এবং সেই অনুসারে দেবীও স্বরূপ পরিবর্তন করেছেন। সে কথা পরে বলছি। মনসার বিষ লোচনে, আর শিবের বিষ কণ্ঠে।

মনসামঙ্গল আখ্যায়িকায় মনসার সবচেয়ে বিশিষ্ট নামান্তর পাওয়া যায় কেতকা (বা কেতুকা)। এই নামের অর্থ এবং হেতু মনসার কাহিনী থেকে জানা যায় না। তবে একটু হদিস পাওয়া যায় ধর্মঠাকুরের পুরাণকাহিনী থেকে।

এ কাহিনীতে বলে, সৃষ্টির সূচনা কালে কারণ সমুদ্রে একটি ডিম ভেসে উঠেছিল। সেই ব্রহ্ম-অণ্ড ভেদ করে আদিদেব ধর্মের উৎপত্তি হয়। ডিমের জলে ভাসতে ভাসতে তিনি ক্লান্ত হয়ে হাই তুললেন, তাতে জন্ম হল পক্ষীর অথবা পবনের। (কাহিনীতে আছে "উলূক", এ শব্দটির দুটি অর্থ—(১) পেঁচা, (২) বানর, পবননন্দন। ধর্মের কাহিনীতে শব্দটি উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। গল্পের প্রথম দিকে পেচক অর্থ সঙ্গত, শেষের দিকে বানর।) উলূকের উপর চড়ে ধর্ম জল থেকে উদ্ধার পেলেন বটে তবে আকাশে অস্থির ভাবে ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে তিনি মাটিতে ঠাঁই খুঁজলেন। এক তিল গায়ের ময়লা তিনি জলে ফেলে দিলেন। তাতে পৃথিবী সৃষ্টি হল। তখন আদিদেব মাটিতে নামলেন। তার কিছুকাল পরে তাঁর সঙ্গিনী লাভের ইচ্ছা হল। (এখানে তুলনা কর। যায় উপনিষদের উক্তি,—একলা আমি দোকলা চাই।) এই কামনার ফলে তাঁর অঙ্গ থেকে জন্মাল তাঁর অর্ধাঙ্গিনী সঙ্গিনী। আদি-দেবী 'কেতকা' বা 'কেতুকা')। (মনে হয় এইরকম আইডিয়াই পরে শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি-ভাবনার মূলে ছিল।) নামটির অর্থ হল 'কামনা' বা 'বাসনা', সুতরাং 'মনসা' নামের প্রতিশব্দ। (এখানে মনে পড়ছে হাজার বছর আগে এক স্থানীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপাসিত দেবীর নাম, 'ইচ্ছা মহওরামী', অর্থাৎ ইচ্ছাঠাকুরাণী। ইছাই-ঘোষ নামটিতেও ইছাই হল দেবী ইচ্ছায়ী বা ইচ্ছায়িকা)।

কিছুদিন পরে কেতকার সঙ্গ ছেড়ে ধর্মঠাকুর তপস্যায় চলে গেলেন। ইতিমধ্যে কেতকা গর্ভবতী হয়েছেন। যথাকালে ভূমিষ্ঠ হল তাঁর তিন পুত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। তিন ভাই বড় হয়ে বাপের খোঁজ করতে বার হলেন মায়ের অনুমতি নিয়ে। ধর্মের তপস্যাস্থানে, বল্লুকা নদীর তটে গিয়ে তাঁরা পিতাকে না পেয়ে নদীতীরে তপস্যায় বসে গেলেন। তখন ধর্ম দেহত্যাগ করেছেন। কিছুকাল পরে ধর্ম পুত্রদের বিচক্ষণতার পরীক্ষা নিতে মৃতদেহরূপে নদীর জলে ভেসে এলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তা সাধারণ মৃতদেহ মনে করে উপেক্ষা করলেন, শিব কিন্তু জানতে পারলেন যে এ তাঁদেরই পিতার দেহ। শিবের এই সূক্ষ্মদর্শিতায় খুশি হয়ে ধর্মঠাকুর দৈববাণী করলেন শিব যেন কেতকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। শিব কিন্তু কেতকাকে সরাসরি গ্রহণ করলেন না। কেতকাকে পর পর কয়েক জন্ম নিতে হয়েছিল, তারপর তিনি কেতকাকে বিবাহ করেন, তখন দেবীর নাম হয়েছে

চণ্ডী। কেতকার জন্মান্তর গ্রহণের কোন বিবরণই নেই, শুধু এইটুকু ইঙ্গিত আছে যে কেতকার প্রত্যেক জন্মের এক একটি হাড় নিয়ে মালা গেঁথে শিব কণ্ঠে ধারণ করতেন। শিবের হাড়মালার অন্য ব্যাখ্যা আছে, সতীর অস্থি।)

ধর্মঠাকুরের ও নাথ-যোগপন্থর ভাবনায় উৎপত্তি-সূত্র এই, পরে দুটি মতে পার্থক্য এসে পড়েছিল। নাথপন্থীরা ঈশ্বর মানেন না, ধর্মঠাকুরের ঐতিহ্যে এক সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে নিয়েও তাঁকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। নাথ-পন্থীদের ঐতিহ্যেও ধর্ম আছেন 'নিরঞ্জন' নামে, আর কেতকাও আছেন তবে তার নাম কেতকা নয় 'মনসা'। মনসার পূর্ণ নাম 'মনসাদেবী' অথবা 'মনসাকুমারী'।

লক্ষ্মী আর মনসার মধ্যে আরও একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্মী হলেন স্থিরজলদেবী, মনসা অস্থির (বা ধারাবাহিত) জলদেবী। বৈদিক সাহিত্যে ধারা জলদেবীই লক্ষ্মীর স্থানীয় ছিলেন। সরস্বতী নদী ছিল এঁর প্রতীক এবং বিশিষ্ট নাম ছিল 'ইলা' (পুষ্টি)। ইলার বিপরীতে ছিল 'নির্ঋতি', বৈদিক অলক্ষ্মী। ইনিই অ-বৈদিক ভাবনা আবর্ত দিয়ে এসে বিষালাক্ষী মনসা হয়েছেন।

তারপর গঙ্গার কথা। সংস্কৃত পুরাণকথায় গঙ্গা হলেন বিষ্ণুর দ্রবীভূত রূপ। শিবের গান শুনে বিষ্ণু গলে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা তাঁকে কমণ্ডলুতে ভরে রাখতে পারেন নি, শিব তাঁকে মাথায় ধরে রাখলেন। গঙ্গার মাহাত্ম্য তাই বিষ্ণুর মাহাত্ম্যের তুল্য। বাংলা দেশে প্রচলিত লৌকিক আখ্যানে মনসা কাহিনীর মুখবন্ধে গঙ্গা ও শিব সম্পর্কে অভিনব গল্প আছে। দেবতাদের একবার বড় সমাশ (অর্থাৎ খাওন-দাওন) হয়েছিল। তাতে রাঁধবার জন্যে গঙ্গার ডাক পড়ে। গঙ্গা শান্তনু মুনির পত্নী। শিব শান্তনুর ঘরে যান মুনির অনুমতি নিয়ে গঙ্গাকে আহ্বান করে আনতে। শান্তনু মুনি গঙ্গাকে যেতে দিতে রাজি হলেন এই শর্তে যে গঙ্গা যেন সূর্যাস্ত হবার আগেই ঘরে ফেরেন। শিব এই শর্তে রাজি হয়ে গঙ্গাকে নিয়ে গেলেন। রাঁধাবাড়া শেষ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তার পর শিব গঙ্গাকে বাড়ি নিয়ে গেলে শান্তনু মুনি পত্নীকে ঘরে ঠাঁই দিতে রাজি হলেন না। গঙ্গা তখন যান কোথায়। অগত্যা শিব তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। এই সূত্রে গঙ্গা হল চণ্ডীর সপত্নী।

অপরদিকে বৈদিক রুদ্রের সঙ্গেও গঙ্গার কিছু যোগ টানা যায়। বৈদিক রুদ্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণ ছিল এই যে, তিনি "জলাষ" এবং "জলাষভেষজ"

অর্থাৎ তিনি জলের মতো শীতল এবং জলের মতো শীতল তাঁর ঔষধ। অর্বাচীন বৈদিক ভাবনায় সরস্বতী-প্রবাহে এমনি গুণ আরোপিত হয়েছিল। আরও পরবর্তী কালে সে গুণ অনেক বর্ধিত হয়ে বর্তেছে গঙ্গাধারায়।

বেদ-পুরাণ ও লৌকিক কাহিনী ইত্যাদি বাদ দিয়ে যদি পশ্চিমবঙ্গে পুরানো গ্রামগুলিতে সুপ্রাচীন গ্রাম-দেবতার বিচার করি তাহলে দেখি যে, লোক-ভাবনায় গ্রামের রাজা (অর্থাৎ পালনকারী) হলেন এক পুরুষ দেবতা এবং এক নারী দেবতা। এ পুরুষ দেবতা ছিলেন ধর্ম। সে ধর্মঠাকুর এখন অনেক গ্রামেই শিবঠাকুর বলে পূজিত হচ্ছেন। এমনি ধর্ম-শিব ঠাকুরের প্রাচীন মূর্তি অর্থাৎ প্রতীকগুলি হল অল্পবিস্তর দীর্ঘাকার শিলাখণ্ড, যেমন বিষ্ণুর প্রতীক হয়েছে গোল শিলাখণ্ড অর্থাৎ শালগ্রাম। তেমনি নারী দেবতার প্রতীক হল চেপটা শিলাখণ্ড অথবা জলপূর্ণ ঘট। এমন প্রাচীন গ্রাম-নারী দেবতা এখন অল্প কয়েকটি গ্রামে মনসা বলে পূজিত হন, তবে অধিকাংশ গ্রামে তিনি বিশালাক্ষী চণ্ডী হিসাবে পূজা পান। আসলে বিশালাক্ষী চণ্ডীর বিশেষণ বা নামান্তর বলে মনে হয় না, কেননা চণ্ডীর বর্ণনায় (বা আচরণে) আয়তলোচনা বিশেষণের কোনই সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আগেই বলেছি যে, মনসার এক বিশেষ অঙ্গ-লক্ষণ ছিল এই যে, তাঁর বাম অক্ষি বিষপূর্ণ। বিষপূর্ণ বলেই মনসা বাঁ চোখ বুজে থাকতেন, ক্রুদ্ধ হলে খুলে বিষদৃষ্টি দিয়ে শত্রু নিপাত করতেন। (এই জন্যেই তাঁকে 'কানী' বলা হয়েছে।) সুতরাং প্রাচীন গ্রাম-দেবী আসলে ছিলেন বিষালাক্ষী, মনসা।

পুরানো গ্রাম-দেবীর শিলাময় ও জলময় এই দ্বিবিধ রূপের একটু তাৎপর্য আছে। আসলে এখানে দুটি দেবী, একজন স্থলদেবী চণ্ডী-দুর্গা, অন্যজন জলদেবী মনসা-গঙ্গা। হয়ত এই দ্বিধা-ভাবনার মূলে একদা একটি দেবী-ভাবনা ছিল, যে দেবী জলস্থলের অধিকারিণী। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডে বর্ণিত দেবী চরিত্রের সঙ্গতি হয়। এই আখ্যানে দেবী অরণ্যানী দুর্গা-চণ্ডীরূপে খুল্লনার হারানো ছাগল এনে দিয়ে তাকে সৌভাগ্যবতী করেছিলেন। অপরদিকে জলদেবী গঙ্গা-মনসা হয়ে পিতা পুত্রকে বিভ্রান্ত করে অনর্থে ফেলে-ছিলেন। ধনপতি শ্রীপতি কাহিনীর দেবীর কুটিল চরিত্র অন্যথা দুর্বোধ্য।

জৈন বৌদ্ধ ও সিদ্ধ সাধনার প্রাগিতিহাস

উপনিষদে ব্রাহ্মণ-শ্রমণের উল্লেখ থেকে বোঝায় যে অর্বাচীন বৈদিককালে ধর্মচর্যার ব্যাপারে দুটি শ্রেণী সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। একটি ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানপরায়ণ এবং সংসারী। আর একটি শ্রমণ, অর্থাৎ সংসারজীবন শ্রান্ত এবং বৈরাগী। এখনকার ভাষায় ব্রাহ্মণ হল সংসারী সাধু, শ্রমণ বৈরাগী বাবাজি।

পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গে শ্রমণ শব্দটি মেলে না। মেলে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে উচ্চতর অধ্যাত্ম সাধক অর্থে। ব্রাহ্মণের অধ্যাত্ম সাধনায় (অর্থাৎ দেবারাধনায়) কামনা ছিল ঐহিক হিতসুখের ও পারলৌকিক সংগতির। শ্রমণের তপস্যায় এবং ধ্যানধারণার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুঞ্জয়তা। শ্রমণরা সংসারবিমুখ, বাস সমাজের বাইরে। স্ত্রীসঙ্গ বর্জিত এবং আত্মভরণ চেষ্টা-বিমুখ। বলাবাহুল্য এঁরা দেবারাধনা করতেন না। শ্রমণেরা ছিলেন নিরীশ্বর।

জৈন ও বৌদ্ধ সাধনায় শ্রমণ হ'ল উচ্চতর সাধকের পরিচয়। সুতরাং অনুমান করতে দোষ নেই যে এ দুটি সাধনার ধারা একই উৎসমূল থেকে উৎসারিত। দুটি সাধনার পদ্ধতিতে যথেষ্ট মিল আছে। অমিলও আছে।

দুটি ধর্মই সমাজজীবনের বিরোধী। দারপরিগ্রহ চলবে না, অর্থাৎ বংশসূত্র ছিন্ন করতে হবে। ঘর-দুয়ার সম্পত্তি থাকবে না। চাষবাস বাণিজ্য শিল্পকর্ম ও চাকরি—এসব চলবে না। রন্ধন করে খাওয়াও চলবে না। প্রাণ ধারণ করতে হবে অযাচক ভিক্ষাবৃত্তিতে। ভিক্ষাবৃত্তি অবশ্য সমাজজীবন বিরুদ্ধতার সঙ্গে খাপ খায় না। মনে হয় একদা এঁদের বৃত্তি ছিল বনের ফলমূল আহার। জৈন বৌদ্ধ দু সম্প্রদায়ের সাধুরাই মাথা মুড়োতেন। তাঁদের কোন পূজা উপাসনা ছিল না—অন্ততঃ প্রথম দিকে, মৌন ধ্যান-ধারণাই তাঁদের সাধনার পথ ছিল। তাঁরা অহিংসায় দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের ব্রত ছিল কঠোর ব্রহ্মচর্য। পরে নারী সাধিকার স্থান-ও এই দু-মতে হয়েছিল, তবে পুরুষ এবং নারী সাধক পরস্পর থেকে বিরত থাকতেন। জৈন মতে নারী সাধিকার স্থান দেরিতে হয়েছিল। দু সম্প্রদায়েই সাধুদের জোট বেঁধে থাকার ব্যবস্থা ছিল। জৈন মতে সাধু-জোটকে বলত "গণ", বৌদ্ধমতে 'সংঘ'। জোট বেঁধে থাকার স্থানকে বলত 'বিহার'।

জৈন মত প্রাচীনতর। এ মতের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বর্ধমানস্বামী হলেও এঁদের পূর্বাচার্যপরম্পরা স্বীকৃত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতমপুত্র শাক্য সিদ্ধার্থের সম্প্রদায়ে তেমন কোন স্বীকৃত পূর্বাচার্যপরম্পরা ছিল না। তবুও এই মতের এক বড় সম্প্রদায়ে দেবপূজা বা গুরুপূজার মতো বুদ্ধের পূর্বরূপ অবলোকিতেশ্বরের পূজা প্রচলিত হয়। জৈন সম্প্রদায়ে মহাবীর সমেত সব পূর্বাচার্যেরই হয়েছিল। এই পূজাবিধির প্রবর্তন হয়েছিল প্রস্তর প্রতিমা নির্মাণরীতি চালু হবার পরে। পূজাবিধির মধ্যে স্তবের ও গানের ব্যবস্থা ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ সাধুরা অনেকেই শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, এবং সাধু হয়েও অনেকে বিদ্যাচর্চা পরিত্যাগ করেননি। ভারতীয় সাহিত্যের অনেক ভালো জিনিস এরাই দিয়ে গেছেন। সমসাময়িক কথ্যভাষার অনুশীলনে এঁরাই সমধিক যত্নবান্ ছিলেন।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা—বাসনা ত্যাগ, আত্মভরণচেষ্টা ত্যাগ, সংসার-বন্ধন সম্পূর্ণ ছেদ, দুঃখ প্রতিরোধের চেষ্টা পরিহার, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য ব্রত এবং ধ্যান-সাধনা—এক হলেও আচরণ দু মতের মধ্যে গোড়া থেকেই কিছু পার্থক্য ছিল এবং এই পার্থক্য ক্রমশ বেড়েছিল। প্রথম থেকেই ছিল ত্যাগের ও ক্লেশ স্বীকারের কঠিনতায়। দু সম্প্রদায়েরই প্রাণধারণ হত ভিক্ষাবৃত্তিতে। তাঁরা কারো কাছে চাইতেন না, তবে আহার গ্রহণের কালে তাঁরা বাইরে বেড়াতেন, কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করতেন। বৌদ্ধরা ভিক্ষাগমনের সময়ে হাতে পাত্র নিতেন, জৈনেরা তা করতেন না, তাঁরা অঞ্জলিতে গ্রহণ করতেন। গৃহস্থেরা ভিক্ষা দিত নিজেদের জন্য 'রাঁধা অন্ন থেকে'। যারা আমিষহারী তারা আমিষ অন্নও দিত। বৌদ্ধেরা তা গ্রহণ করতেন, কিন্তু জৈনেরা তা প্রত্যাখ্যান করতেন। বৌদ্ধদের তুলনায় জৈনেরা বেশী অহিংসাবাদী ছিলেন।

জৈন সাধুরা গোড়ার দিকে বস্ত্র-পরিধান করতেন না, সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকতেন। পরে কাপড় পরা চালু হয়, কিন্তু এক সম্প্রদায়ের সাধুরা আজকের দিনেও সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকেন। এঁদের সম্প্রদায়ের নাম 'দিগম্বর'। বৌদ্ধেরা গায়ে কাপড় জড়াতেন গেরুয়া রঙের। এককথায় জৈন সাধুদের আচরণ প্রকৃতি-ঘেঁষা, বৌদ্ধ সাধুদের আচরণ সমাজ-ঘেঁষা। জৈন সাধুর আচরণের এক বৈশিষ্ট্য কঠিন আত্মসংযম কঠোর ভোগত্যাগ, এক কথায় সংযমের তপস্যা। তাই তাঁদের পরিচয় ছিল 'যতী' বলে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভোগ খুঁজতেন না,

তবে নিষ্কারণ উপোসও করতেন না। আত্মজীবকে যতীরা যতটা কষ্ট দিতেন ভিক্ষুরা ততটা দিতেন না।

সিদ্ধ মতকে যোগী মত বলা যায় এবং আমি অন্যত্র তাই বলেছি। কিন্তু এখন নামটিকে খুব সঙ্গত ব'লে মনে করি না; যেহেতু 'যোগ' ও 'যোগী' শব্দ দুটির মানে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন 'যোগ' মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা ধ্যানধারণা। সে তো জৈন ও বৌদ্ধ মতেও আছে। 'হঠযোগ' অর্থ ধরলেও এখানে পূর্ণ সঙ্গতি হয় না, কেননা কঠিন তপস্যা জৈন মতেও আছে। আমার মনে হয় গোড়ায় এবং এ মতের সাধনার প্রতিষ্ঠাকালে 'যোগ' মানে ছিল এক চিত্তে প্রভুর আনুগত্য এবং 'যোগী' মানে ছিল এক চিত্তে অনুগত ভৃত্য। এ সাধনা এক হিসাবে নিরাকার ছিল, কেননা কোন জগৎ পরিচালক ঈশ্বর অথবা জগন্ময় ব্রহ্ম এমতে স্বীকৃত নয়। আর হিসাবে বলা যায় এমত ছিল সর্বেশ্বর। অর্থাৎ সিদ্ধ মতে আচার্য অর্থাৎ শিক্ষাগুরু স্বীকৃত কিন্তু আসল গুরু অর্থাৎ মন্ত্রদাতা ছিল সবাই ঈশ্বর, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে। জৈন ও বৌদ্ধ মতের সঙ্গে সিদ্ধ মতের একটা বড় বিভেদ লক্ষণ হ'ল গুরুবাদ নিয়ে। জৈন ও বৌদ্ধ মতে দীক্ষা গুরু নেই। সিদ্ধ মতে তা আছে। সিদ্ধ গুরুকে নবীন শিষ্য পার্শ্বচর ভৃত্যের মতোই লেগে থেকে সেবা করত। সেই সেবাই 'যোগ' এবং সেই সেবাকারী শিষ্যই 'যোগী'।

সেকালে প্রভুরা মাথায় চুল রাখতেন, পার্শ্বচর অন্তরঙ্গ ভৃত্যের মাথা নেড়া থাকত। (যাতে কোন অবস্থায় প্রভু-ভৃত্যের পদের ও মর্যাদার ব্যতিক্রম সম্ভাবনা না ঘটে।) তাই নবীন যোগী-শিষ্য মাথা মুড়োতেন এবং প্রবীণ যোগী-গুরু সিদ্ধ আচার্য মাথায় চুল অথবা জটাভার রাখতেন। এইখানে জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে যোগী গুরুর একটা বড় বাহ্য প্রভেদ। সিদ্ধ মতের প্রসঙ্গে এগোবার আগে এই মতের পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আলোচনা করি।

সিদ্ধ মতের ও সাধনার জড় গিয়ে পৌঁছয় অর্বাচীন বৈদিক কালে। ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত একটি সূক্তে (১০.১৩৬; এটি অথর্ব বেদেও আছে) এই সাধনার মূল গুরুদের ও সে সাধনায় বাহ্য রূপের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আছে। সূক্তটির দেবতা উল্লিখিত হয়েছেন "কেশী" বলে। মানে কেশধারী। ইনি মূল গুরু, সুতরাং ইনিই সব—অগ্নি, বিষ, সূর্য—আকাশকে ধারণ করে আছেন। এঁর অনুচরেরা হলেন "মুনি" (অর্থাৎ পরম জ্ঞানী)। এঁদের মেখলা হাওয়ার,

পরতেন এঁরা গেরুয়া ধুলা। এঁদের গতি ছিল হাওয়ার পিছনে পিছনে দেবতাদের আগমনে (?)। এঁরা চলতেন আকাশ মার্গে। এঁরা দেবতাদের ভালো কাজের সহায়ক হিতকারী বন্ধু। অপ্‌সরা গন্ধর্ব ও মৃগ চরে যেখানে সেখানে কেশীর বিচরণ। কেশী মনের কথা জানে, তিনি প্রিয়, প্রিয়তম সখা। বায়ু এঁর জন্ত মথন করে, "কুনন্নম" বাটে; যে বিষ কেশী একই পাত্রে রুদ্রের সঙ্গে পান করেছিলেন।

এই নিকর্ষ থেকে অনুমান করা কঠিন হয় না যে কেশী এবং রুদ্র সহচর—হয়ত উপাসক-উপাস্য বা শিষ্য-গুরু ছিলেন এবং তাঁরা ভাঙ খেতেন। এর থেকে আরও বোঝা যায় যে বৈদিক দেবতা রুদ্র কেমন ক'রে পর-বৈদিককালে জটাধারী, দিগম্বর, বিভূতিভূষণ, ভঙ্গাপ্রিয় শিবঠাকুরের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছিলেন।

এই বৈদিক সূক্তে বর্ণিত কেশী-মুনিরা সংস্কৃত সাহিত্যে (এবং পুরাণে) 'সিদ্ধ' নামে উল্লিখিত হয়েছেন। বেদে 'সিদ্ধ' কথাটি নেই। অত্যন্ত অর্বাচীন একটি সূক্তে (পুরুষ সূক্ত : ১০.৯০) 'সাধ্য' নামে একশ্রেণীর দেবতার উল্লেখ আছে যারা মনে হয় সিদ্ধ মতের গুরু স্থানীয়। এঁরা যজ্ঞ সাধনা ক'রে নিজস্ব স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত আছেন, যে স্বর্গলোকে পুরুষমেধী সাধক পেয়ে থাকেন (১৬)।

যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাস্ তানি ধর্মাণি প্রথমানি আসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥

'যজ্ঞের দ্বারা দেবতারা যজ্ঞকে যজন করেছিলেন। সেই হ'ল প্রথম ধর্মানুষ্ঠান-বিধি। সেই শক্তিসমূহ (অর্থাৎ এমন সার্থক অনুষ্ঠানের ফল) স্বর্গে পৌঁছেছিল (অর্থাৎ সাধককে সেই স্থানে উত্তীর্ণ করেছিল) যেখানে আগেকার সাধ্য দেবতারা বিরাজ করেন ॥'

এই সাধ্য দেবতাদের নন। এঁদের অনুচর বা সহচর হলেন ঋষি (৭)।

তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্ চ যে ॥

'সেই (অনুষ্ঠানের) দ্বারা দেবতারা—সাধ্যেরা—, এবং ঋষিরা যজন করেছিলেন ॥"

সাধ্যদের স্থান ছিল অধস্তন স্বর্গলোক ("ভুবস্"), সেখানে থাকত অপ্‌সরারা এবং গন্ধর্ব (সোম রসের ভাণ্ডারী)। সুতরাং সেখানে ভোগের আয়োজনে অপূর্ণতা ছিল না।

পরবর্তীকালে এই সাধ্যদের সাধনায় উত্তীর্ণ শিষ্যেরাই হয়েছেন 'সিদ্ধ'। সিদ্ধেরা যে নারীসঙ্গ বর্জিত ছিলেন না, তাঁদের যে সঙ্গীতচর্চা নিষিদ্ধ ছিল না এবং তাঁরা যে শিবের ভক্ত ছিলেন তার প্রমাণ মেঘদূতে কালিদাসের উক্তি :

সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্‌ জলকণভয়াদ্‌ বীণিভির্‌ মুক্তমার্গঃ

বীণাহস্তে 'সিদ্ধযুগলেরা পাছে (খণ্ডে) জলো হাওয়া লাগে সেই ভয়ে পথ ছেড়ে দেবে।'

শশ্বৎ সিদ্ধৈর্‌ উপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।

'ভক্তিভরে নত হ'য়ে (তুমি শিবের চরণচিহ্ন) প্রদক্ষিণ ক'রো, যেখানে সিদ্ধেরা সর্বদা নৈবেদ্য যোগাচ্ছেন।'

(কালিদাসের এই শেষের কথাটিতেই 'যোগ' ও 'যোগিন্‌' শব্দের প্রাসঙ্গিক মূল অর্থটি ধরা পড়েছে। এই সিদ্ধ সাধকেরা ছিলেন গুরুর বা উপাস্যের অনবরত যোগানদার। অনবরত নৈবেদ্য ইত্যাদি যোগান দেওয়াই ছিল 'যোগ'।)

সিদ্ধ মতের সাধনার কথা পুরানো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকগীতিতে এবং এ সাধনার ছবি এবং যোগীপন্থের কড়চানিবন্ধে এ সাধকদের উপদেশ কথা ছড়ার আকারে মিলেছে। আর্য-ভাষী ভারতের সর্বত্রই যোগীদের গান ও ছড়া একদা প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে আরও ক্ষীণভাবে। এইসব রচনার মূল ভাষা যে বাংলা ছিল তা বোঝা দুরূহ নয়।' সুতরাং বাংলা ও নিকটবর্তী প্রাচ্য ভারতীয় অঞ্চল যে এই সাধনার একদা মুখ্য পীঠস্থান ছিল সে কল্পনা কষ্টসাধ্য নয়। যোগী সাধনার উদ্দেশ্য ছিল 'সিদ্ধ' হওয়া, অর্থাৎ অনিমা লঘিমা ব্যাপ্তি ইত্যাদি অষ্ট ঐশ্বরিক শক্তি লাভ ক'রে অমর হওয়া। এই উদ্দেশ্যে এবং দেহ ভোগ অপরিমিত করবার উদ্দেশ্যে জড়িবড়ি ঔষধের ব্যবহার করতেন। তাঁরা সঙ্গীত চর্চা করতেন এবং ছবি আঁকা ও কাপড় বোনার মতো শিল্পচর্চাও করতেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের মতো যোগী পরিব্রাজকেরাও ভারতবর্ষের বাইরে যেতেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে এইরকম পরিব্রাজক ভারতীয় যোগীর চীনদেশে উপস্থিতি একটি পুরানো চীনীয় উপন্যাসে (রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীতে) বর্ণিত আছে। যোগীর অমানুষিক শক্তি এবং বৃষ্য ঔষধ বিতরণের উল্লেখ এতে আছে।

গোড়ার দিকে শিব শুধু প্রধান যোগী ছিলেন। অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যের

সংজ্ঞায় মধ্যে তিনি ছিলেন একজন 'সাধ্য দেব' অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা। ব্রাহ্মণ্য মতে উপস্থিত শিবের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না রুদ্রের সঙ্গে। আগে যে বৈদিক সূক্তের উল্লেখ করেছি তাতে কেশীকে দেখি রুদ্রের সঙ্গে এক পাত্রে "বিষ" পান করছেন। সুতরাং কেশী (পরবর্তীকালের শিব) রুদ্রের গণের অন্তর্গত গণ্য হ'তেন। যোগী-পন্থের বাংলা কাহিনীতে মীননাথ গোরক্ষনাথের এবং ময়নামতী-গোপীচন্দ্র-জালন্ধরির গল্পে—শিব ছিলেন সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় গুরু এবং মীননাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথ), গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপা ও কাহ্নুপা এঁরা ছিলেন তাঁর সহযোগী সাধক। শিবের সঙ্গে বাকি চার জনের মনান্তর ও বিচ্ছেদ ঘটল শিবের বিবাহের ফলে। জগৎমাতা ("জগতের আই", ক্রিজিয় "গ্‌দান্‌ মা", রোমান মতের্‌ মাগ্‌না') গৌরী চেয়েছিল শিবের মতো অপর যোগীরাও বিবাহ করে ঘরবাসী হোক। ওঁরা তা চাননি। তাঁর যোগস্থান কৈলাশ ছেড়ে চলে যান। এই প্রয়াণের পরে তাঁদের ইতিহাসই লোকগীতিগুলিতে বর্ণিত।

শৈব মতের এই স্বতন্ত্রতা ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কলিঙ্গের রাজা খারবেল (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) তাঁর অনুশাসনে বন্দনা করেছেন অর্হৎদের এবং সিদ্ধদের এবং নিজেকে বলেছেন "ঐর"। এই কথাটির মানে নিয়ে পণ্ডিত সমাজে বিভ্রান্তি আছে। শব্দটির মূলে আছে 'ইরা'—মানে স্বাদু ও বলবর্ধক পেয়, পুষ্টিকর খাদ্য, পুষ্টি। কোন ধর্মমতের সঙ্গে মেলাতে গেলে শৈব ধর্মেরই সঙ্গে মিল হয়। শিবের উপাসনাতেই সর্ববিধ ভোগৈশ্বর্যের বাহুল্য প্রথম দেখা গিয়েছিল। এই জাঁকজমকে পূজা-উৎসবকাণ্ড অথর্ববেদে ব্রাত্য সূক্তগুলিতে তির্যকভাবে কিন্তু উজ্জ্বলরূপে আছে। সেখানে পূজা পেয়েছেন ব্রাত্য, তিনি কোন দেবতার মতো নন, যেন রাজা, এবং বৈদিক সূক্তের কেশীর সঙ্গে যেন মিল আছে মনে হয়। এই ব্রাত্য যে শিব—যাঁর পক্ষে 'ঈশ্বর' নাম সবচেয়ে বেশী প্রযুক্ত এবং খাটেও সে অনুমান করা খুব দুরূহ নয়।

জৈন ও বৌদ্ধ মত যখন উদ্ভূত হয় তখন ঐর (অর্থাৎ ঈশ্বর মত অজ্ঞাত ছিল না। পানিনি স্কন্দ, বিশাখ প্রভৃতি শৈব দেবতার পূজার উল্লেখ করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে শৈব সাধুরাই অশোকের সময়ে, এবং পরেও আজীবিক বলে অভিহিত ছিলেন। কিন্তু আজীবিক নামটিকে শৈব সন্ন্যাসীদেরই একচেটে অভিধা বলে নেওয়া যায় না। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

হ'ল 'যাদের কোন প্রাণধারণের জন্য বৃত্তি বা প্রচেষ্টা নেই (অজীবিকা+ইক, আদিশ্বরের বৃদ্ধি)। তাহলে শব্দটি জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি যে কোন সাধু সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হতে পারে যাঁরা অযাচক বৃত্তি ভিক্ষাজীবী ছিলেন। 'ভিক্ষু' কথাটিরও এই অর্থ মৌলিক, কিন্তু তাতে অন্য অর্থ এসে যাওয়ায় 'আজীবিক' শব্দটি গড়তে হয়েছিল। অশোকের নাতি দশরথ আজীবিকদের বর্ষাবাসের জন্য বরাবর পাহাড়ে গুহা নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

সিদ্ধ মত দুভাগে বিভক্ত হবার পর বিভক্ত দু সম্প্রদায়ে জীবন ধারণের উপায় সম্বন্ধে ভিন্ন পথ অবলম্বিত হয়েছিল। শৈব মত-'ঐর'—ঐশ্বর্যের পথ নিয়েছিলেন। ধনীর গুরুগিরি করে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়ে পূজা আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে ভোগের আয়োজন চালিয়েছিলেন, সন্ন্যাসী হ'লেও। আর যোগীরা ভিক্ষাবৃত্তি আঁকড়ে রইলেন। এই দু সম্প্রদায়ের আচরণ সম্বন্ধে মূল্যবান্ ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই সহস্রাব্দীর গোড়ার দিকে তথাকথিত "বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া সম্প্রদায়ে অকাট্ট ছড়া এবং বাংলা গান ("চর্যাগীতি") থেকে। 'অইরিয়দের সম্বন্ধে অকাট্ট ছড়ায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা গায়ে ছাই মাখেন, মাথায় জটাভার বহন করেন, কোণে ব'সে ঘণ্টা নাড়েন, লোককে 'ধাঁধা' দিয়ে কানে ফুসফুস মন্ত্র দেন। বাংলা গানে যোগীদের সম্বন্ধে বর্ণনা কিছু বিস্তৃততর। তাঁরা কেউ কেউ গায়ে ছাই মেখে উলঙ্গ থাকতেন, কেউ কেউ হাতে, পায়ে, গলায় কানে গয়না পরে নট সজ্জা করতেন। (নটসাজ একদা তাদের শিব-পূজার সঙ্গ ছিল বলে কি? রুদ্রের গণেরা নট সাজ করত।) হাড়ের মালাও নিতেন। নারী-সঙ্গ বর্জিত ছিল না। পারা-ঘটিত রসায়ন ঔষধেরও চর্চা করতেন। তাঁরা অযাচক ভিক্ষায় বেরতেন। পাত্র শক্ত লাউখোলা ("লাউয়া", অথর্ব বেদের ব্রাত্য সূক্তে "অলাবু পাত্র")।

বাংলাদেশের ইতিহাস যতটুকু জানা যায় তাতে স্বচ্ছন্দে কল্পনা করতে পারি যে এদেশে শৈব মত ব্রাহ্মণ্য জৈন ও বৌদ্ধ মতের অনেক পরে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছিল। প্রত্নলিপিতে শৈব বিহার বা মঠের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায় দশম শতাব্দী থেকে। বাংলাদেশের প্রত্যন্তে বিহারে ও আসামে শৈব মতের প্রসার বিস্তৃততর ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম জৈন ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে যেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল অমনি শৈব ধর্মের মহিমা জাগতে লাগল। মনে এর জন্যে বাইরের প্রভাবও কিছু দায়ী। এককালে ধনী বণিকেরা অনেকেই শৈব ছিলেন। (স্মরণীয় কবিকঙ্কণের উক্তি "যে জন শঙ্কর

পুত্রে নহে ধনহীন"।) মনে রাখতে হবে শিবের ধনৈশ্বর্যের ভাণ্ডারী ছিলেন কুবের।

এই আলোচনায় সিদ্ধ সাধনার কথায় গোড়া ছাড়িয়ে অনেক দূর এসেছি। তার কারণ এ সম্বন্ধে বেশী কথা কেউই বলেন নি। জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ইতিহাস বহু প্রামাণিক গ্রন্থে সহজলভ্য॥

নাথ-পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া একাধিক যোগসাধনার ধারা একদা পূর্বভারতে যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল তাহা এখন নাথপন্থ নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই নামকরণের হেতু হইতেছে এই সাধনমার্গে সিদ্ধ ও সাধকদিগের নামের শেষে "নাথ" শব্দের অস্তিত্ব। উত্তর বঙ্গ হইতে রাজপুতানা-গুজরাট-পাঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে স্থানে স্থানে এখনো যে নিরঞ্জন-পন্থী যোগী সন্ন্যাসী-ভিক্ষুক সম্প্রদায় "কনকট্", "মচ্ছেন্দ্রী", "সাকাহার", "কানিপা" ইত্যাদি নামে পরিচিত আছেন তাঁহারা নাথ-পন্থেরই পথিক। বাংলাদেশে নাথ-পন্থী সাধুরা এখন শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, গৃহস্থেরা একটি পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিগণিত আছে।

নাথ-পন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাংলা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ইহার প্রাচীন সাহিত্য বাংলাতেই পাওয়া যায় এবং তাহারই মধ্যে ইহার প্রাচীনতর রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বাংলাদেশের বাহিরের যোগী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের ধারা যে বাংলাদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ অবিরল নয়। তবু একথা বলা চলে না নাথ-ধর্ম বাংলা দেশেরই নিজস্ব জিনিস। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির ভাব ও সাধনার ধারা মিলিত হইয়া বাংলাদেশে যে বিশিষ্ট ধর্মমতের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই এক অংশের প্রকাশ নাথ-পন্থে। বিভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে আগত এইরূপ যোগ-সাধনার ধারার ইঙ্গিত পাইতেছি গোর্খ-বিজয়ে:

ছাড়িকা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে-কানকাই
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই।

হাড়িপার কর্মক্ষেত্র পট্টিকের আধুনিক উত্তর ত্রিপুরার অন্তর্গত। দক্ষিণে কানুপার প্রচেষ্টার কোন কিংবদন্তী বা কাহিনী রক্ষিত হয় নাই। তবে তিব্বত জনশ্রুতিতে বলে যে একজন সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের কিংবা উড়িষ্যার লোক। গোর্খ-বিজয়ে কানফার সম্পর্কে যে ডাহুকা নগর ও তথাকার বহুড়ীর উল্লেখ আছে তাহার প্রতিধ্বনি শুনি মনসার পুরানো ছড়ায়—"ডাহুকার বৌড়ী তারা ঘটে পানি ভরে।" দক্ষিণ রাঢ়ে বর্ধমান-বাঁকুড়া সীমান্তে "ডাউকো" গ্রাম হয়ত এই কিংবদন্তীর সঙ্গে অসংস্পৃক্ত নয়। গোর্খনাথের প্রভাব প্রধানতঃ পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ। তাহার প্রমাণ পশ্চিম ভারতে গোরখ-পন্থীদের বাহুল্য। গোরখপুর শহর ও গোর্খা জাতি ইহারই স্মৃতি বহন করিতেছে। মীননাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের বিলাসক্ষেত্র কদলীরাজ্যের কল্পনা বোধ করি হিমালয়-পাদভূমি-আশ্রিত কোন প্রাচীন ভোট-মোঙ্গল গল্পকাহিনী অবলম্বনে উদ্ভূত হইয়াছিল।[১] এখনও এই দেবাশ্রিত আদি যোগী-সিদ্ধের পূজা উত্তরে নেপাল রাজ্যেই প্রচলিত। নেপালের অন্যতর প্রধান পূজা-উৎসব হইতেছে মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা।

নাথ-পন্থ শৈব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। নাথযোগীদের মতে শিবও একজন সিদ্ধ যোগী। তিনিও মীননাথ-গোর্খনাথ-হাড়িপা-কানুপার মতই ধর্ম-নিরঞ্জনের পুত্র। তবে তিনি যোগী সিদ্ধদের অগ্রজ গুরু, এবং মীননাথ ও হাড়িপা তাহার অনুজ অনুচর।

আগে গুরু মহাদেব পিছে আর সব
সাধন্ত সকল সিধা তরিবারে ভব।

এবং

শিবের ডাহিনে বামে হাড়িফা মীনাই
পৃষ্ঠভাগে গৌরী আছে জগতের মাই।

নাথ-পন্থ নিরীশ্বর। সৃষ্টিকর্তা ধর্ম-নিরঞ্জন জগৎসৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আদিনাথ ধর্ম-নিরঞ্জন ঠাকুরের সঙ্গে নাথপন্থী যোগ-সাধনার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই।

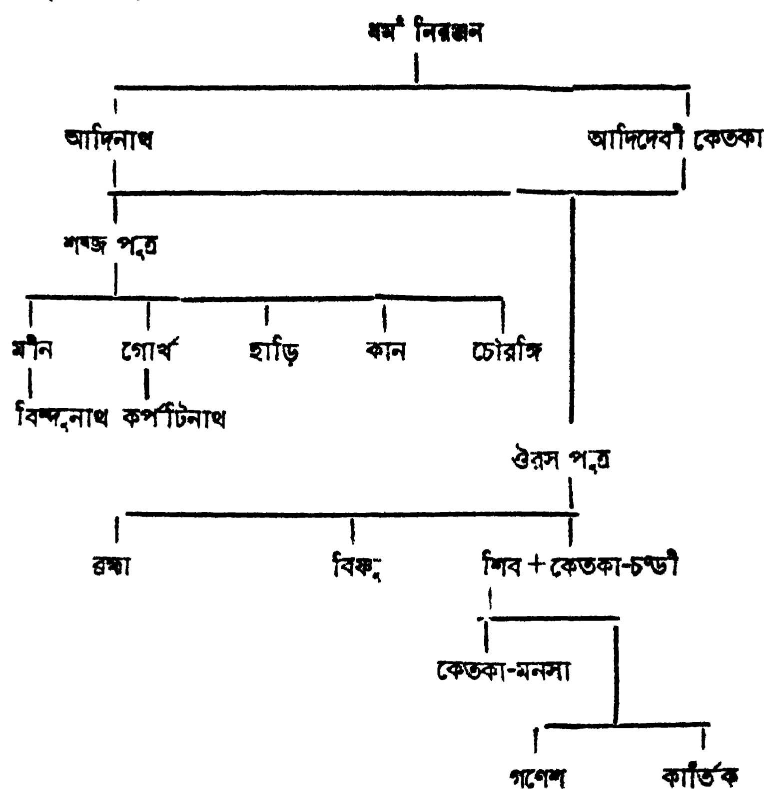
১ কদলী রাজ্য হইতেছে স্ত্রীরাজ্য, আধুনিক মণিপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। কহ্লনের মতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য প্রাগ্জ্যোতিষপুরের স্ত্রীরাজ্য জয় করিয়া সেখানে দুই চুম্বক পাথরের মাঝখানে আলম্বনহীন নৃসিংহমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ধর্মমঙ্গল-শূন্যপুরাণের ধর্মঠাকুর আর নাথ-ঐতিহ্যের নিরঞ্জন-আদিনাথ অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের পুরাণ-কথা আর নিরঞ্জনের সৃষ্টি-বর্ণনা একই। এই কাহিনীর জড় গিয়া পৌঁছায় একদিকে ঋগ্‌বেদের নাসদীয় সূক্তে অপরদিকে পলিনেশীয় জনশ্রুতিতে। ইহার মূলে ভারতবর্ষের বাহির হইতে আগত কোন অনার্য জাতির ঐতিহ্য কল্পনা করিলে এই দুই ধারার ঐক্য হয়। ধর্ম-নিরঞ্জনের "আত্মকথা" সংক্ষেপে বলি।

জগৎসৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের অবস্থা ছিল অব্যক্ত, কিছু ছিল এবং ছিল না— এই ভাব, "নাসদাসীৎ ন সদাসীৎ তদানীম্" এবং "অন্ধকার মধ্যে সকলি ধুন্ধুকার", "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"। সেই ধুন্ধুকার মধ্যে সৃষ্টির সাড়া জাগিল, অব্যক্তে উঠিল বিপরীতমুখী দুই ঢেউ—"আদি ধনাদিরূপে কৈল নিরীক্ষণ", "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ"। শূন্যে উঠিল বুদবুদ-ব্রহ্মাণ্ড। সেই অণ্ডে তাপ দিলেন নিরঞ্জন আদিনাথ - "ভাবের অনলে ধর্ম ঘমিত তখন", "তপসস্তন্ মহিনাজায়তৈকম্", এবং অণ্ডভেদ করিয়া বাহির হইলেন নিরঞ্জন-অনাদিনাথ আদিনাথ রূপে। নিরঞ্জনের তপের তাপের ঘর্ম হইতে জন্ম হইল আদিদেবী কেতকার (যাঁহার নামান্তর মনসা)। তপোনিরত আদিদেব কেতকাকে স্মরণ করিয়া কামপ্রেরণা অনুভব করিলেন—"মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"। তাঁহার বীর্য পান করিয়া কেতকা হইলেন অন্তর্বত্নী এবং প্রসব করিলেন তিন পুত্র। ব্রহ্মা নির্গত হইলেন মুখ হইতে, বিষ্ণু বাহির হইলেন ললাট ভেদ করিয়া, আর শিব ভূমিষ্ঠ হইলেন যোনিপথে। জন্মিয়াই তিন ভাই পিতার সন্ধানে বাহির হইয়া তাঁহার দেখা না পাইয়া তপস্যায় বসিয়া গেলেন বল্লুকা নদীর ঘাটে। কিছুকাল পরে আদিনাথ চাহিলেন পুত্রদের যোগ্যতার পরীক্ষা করিতে। গলিত শবের রূপ লইয়া তিনি নদীস্রোত বাহিয়া আসিলেন সেই ঘাটে যেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তিন ভাই তপোমগ্ন। জলে শবের পূতিগন্ধ দূর হইতে পাইয়াই ব্রহ্মা আসন ছাড়িয়া পলাইলেন। বিষ্ণুর কাছে আসিলে তিনি জল ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। শিবের নিকটে আসিতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন পিতার মৃতদেহ বলিয়া। আদিনাথ বুঝিলেন যে পুত্রদের মধ্যে শিবই পরমজ্ঞানী। তাই দুইজনকে ডাকিয়া শিব বলিলেন পিতার শব সৎকার করিতে। শিবের জানুর উপর অনাদিনাথের শব দাহ করা হইল। ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি, বিষ্ণু হইলেন কাষ্ঠ। দহ্যমান শবের নাভি হইতে উদ্ভূত হইলেন মীননাথ, ললাট (মতান্তরে জটা) হইতে

বাহির হইলেন গোর্খনাথ, হাড় হইতে জন্মিলেন হাড়িপা, কান হইতে নির্গত হইলেন কানপা, এবং চরণ হইতে উঠিলেন চৌরঙ্গিনাথ। এইভাবে অনাদির শব হইতে পাঁচ আদি সিদ্ধার জন্ম হইল। তাহার পর বিদেহী নিরঞ্জনের ইঙ্গিতে শিব কেতকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। জন্মান্তরিত কেতকার নাম হইল গৌরী (চণ্ডী)।

ধর্ম-নিরঞ্জনের এই আত্মকথার যে পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের উপজীব্য কয়েকটি বিশিষ্ট কাহিনীর প্রধান দেবদেবী-ভূমিকার জড় পৌঁছাইতেছে তাহা নিচে ছকে দেখানো গেল :



উপরে কথিত সৃষ্টিকাহিনীর পর হইতে ধর্মঠাকুরের কাহিনী এবং নাথ-পন্থের উপাখ্যান পৃথক পথ ধরিয়াছে। ধর্ম-কাহিনীর বিষয় হইয়াছে ধর্ম-পূজার পূজা-অনুষ্ঠান বর্ণনা ও ধর্মঠাকুরের বরপুত্র লাউসেনের কাহিনী, নাথ-কাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে নাথ-সিদ্ধদের বৃত্তান্ত। এই বৃত্তান্তের অনুসরণ করি।

গৌরীকে লইয়া শিব গৃহস্থালি পাতিলেন, মীননাথ ও হাড়িপা তাঁহার

প্রধান পার্শ্বচর হইলেন। শিষ্য দুইজনের সেবক হইলেন যথাক্রমে গোর্খনাথ ও কাহ্নপা। একদা গৌরীর বাসনা হইল শিবের কাছে "মহাজ্ঞান" লাভ করিতে। গৌরীকে লইয়া শিব গেলেন সমুদ্রের উপরে জলটুঙ্গিতে, যেখানে কোন তৃতীয় ব্যক্তি মহাজ্ঞান-কথা শুনিতে পাইবে না। মীননাথের কাছে ইহা অগোচর রহিল না। তিনি বোয়াল মাছ হইয়া জলটুঙ্গীর তলায় রহিলেন এবং মহাজ্ঞান-সঙ্কেত জানিয়া লইলেন। গৌরী স্ত্রীলোক, তাঁহাকে মহাজ্ঞান দেওয়া বিবেচনার কাজ হইবে না বলিয়া নিরঞ্জন তাঁহার উপর নিদ্রাবেগ দিয়াছিলেন, মীননাথ গৌরীর হইয়া "হুঁ হুঁ" করিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতে শিব বুঝিতে পারেন নাই যে গৌরী নিদ্রিত। দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে এই কাহিনীর বিস্তার-বর্ণনা আছে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

কর জোড় করিয়া উলূক করি নিবেদন
সৃষ্টিনাশ করিল শিব এ তিন ভুবন।
যতেক জ্ঞান-কথা শিব দুর্গাকে কহিব
সকল সংসার দুর্গা অমর করিব।
উলূকের সংহতি ধর্ম যুকতি করিয়া
মায়ানিদ্রা দুর্গার গায়ে দিল পেলাইয়া।
নিদ্রায় বিহ্বল দুর্গা হৈল অচেতন
জ্ঞান-হুকার জোগায় মীননন্দন।
যুবক শিখিলে যোগ পালটিয়া বৈসে
বৃদ্ধ শিখিলে যোগ আসে কি না আসে।
দেবীকে বলেন শিব যোগ-ব্রত জানি
বাহিরের পবন ভিতরে ধরো আনি।
টানিতে টানিতে কায় নম্বর ফোটে
সহজে গত প্রাণ জিন (?) কত টোটে।
একগোটা আইল হাড়ি দশগোটা মুণ্ড
তত্ত্বকথা শুনিতে গৌরী পালটিয়া উঠ।
সকল কথা মিছা গৌরী জ্ঞান-কথা সাঁচা
শুনিঞা পরম সত্য পাকা চুল হৈল কাঁচা।
না বুঝিল নটকি রবি আর শশী
আহার কারণে পিও গলে নাই বসি।

আন্তে অনান্তের ধন নারী ভরয়
তবে কেন গুরু গোসাঞি মরণ কেন হয়।[২]
যার বৃদ্ধ-কালে না হইল জীবন উপায়
তাহুর জানে ভাব না স্বজিল (?) কায়।
অকুল যে হইল কি বলিব তায়
তথির কারণে হংস উড়্যা উড়্যা যায়।
উড়্যা যায় পরমহংস নাই যায় দূর
উড়িয়া ঘুরিয়া যায় নিরঞ্জনপুর।
এড়িলে সে রহে গৌরী পেলিলে সে বহে
মন পবন তারা পরিচয় নহে।
সন্তে গেল গৌরী বিসন্তের পাশ
সন্ত বিসন্ত লইয়া একই ঘরে বাস।
শিবের উদরে গৌরী সুখে নিদ্রা যায়
মৎস্যের পেটে মীননাথ হুকার যোগায়।...
ষোল শত কোন নাথ পথালয়ে ধুবি
ধুবিতে কাপড় কাচেন আর যত যুগী।
শকতি কুড়ারি লয়্যা বাণী গেল ঝাড়ে
মায়ালতা কাটিয়া করিল ছারে খারে।
ছারে আর খারে তুলিয়া দিল জাল
অহর্নিশি ফোটে জাল বৈসে যত কাল।
অন্য ধুবি কাপড় কাচে চোন আর বানা
গোর্ক্ষ ধুবি কাপড় কাচে যেন কাচা সোনা।[৩]
চান্দই খোটা হৈল যার সুজাই হৈল পাট
ধুবিতে কাপড় কাচে মনা নদীর ঘাট।
খুটি বুড়িয়া গেল পাট পাট রহিয়া ভাসে
মনা নদী পার হৈয়া ধুবি ভাল হাসে।

---

২ এই ধরনের ছত্র স্পষ্টতই গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর হইতে লওয়া হইয়াছে। গৌরী জাগিয়া নাই, সুতরাং ইহা গৌরীর প্রশ্ন হইতে পারে না

৩ এইখানে গোর্খনাথের প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়াছে।

মরুদ্যা সঙ্কীর্ণ নালে ধরিছে উজান
অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ।
নিত্য নিত্য আসে চোরা ধন হরিবারে
জ্ঞান থাকিতে তারে নারে লক্ষিবারে।
পাটি নাই শিলা নাই ঘাটে ঘাটে পিই
মুখানি পূর্ণিমার চন্দ্র যুগে যুগে জীই।
শনি মঙ্গলবার বড় পুণ্য স্নান
পিনি তৈলে জলে বাতি দেখ বিদ্যমান।
ধর্মের চরণে পণ্ডিত রামে[৪] গায়
অনিলপুরাণ কথা শুন ধর্মরায়॥

গুরু কার বোলে কে না পাতিয়ায়
পুতকি দুগুধে সমুদ্র উথলিল
পর্বত ভাসিয়া যায়।
আগের পাছের নৌকা বুড়্যা গেল
মধ্য নৌকায় উড়িল ধূলা
সরিষা বুড়িতে জল [বিন্দু] নাঞি
বুড়্যা গেল দেউলের চূড়া।
হস্তীর গায়ে দু বীর সংগ্রাম
মেদিনী করে তোলপাড়
গাত্রের উদরে স্ত্রী-পুরুষ বেশ
বোঝ এ আগমবিচার।
মধ্য সমুদ্রে নৌকা রাখিনু
কাঁকড়া ধরিল কাছি
মশার লাথিতে দেউল ভাঙ্গিল
পিপীড়ার মনে হাসি।

৪ কবি লক্ষণ প্রায়ই রামাঞি পণ্ডিতের নামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৭০ দ্রষ্টব্য)।

আমের গাছে জাম ফলিল
তার জেনতে (?) ভরিল ডাল
অল্প বয়সে নেবু গাছি রূপি
সে যেন ফলে কাঁঠাল।
দূর্বার ডালে ঘুঘুর বাসা
তায় কেন কাকের ছা
পক্ষ পক্ষ তারে আহার যোগায়
সে ডাকে সরেস রা।
গাই বুড়াইল বলদ বিয়াইল
চিঙ্গিড়া ঘন দেয় স্তন
আকাট বাঁঝার পুত্র হইয়াছে
সে খাত্যে চায় পায়রার দুধ।
ব্যাঘ্রের দুগধে আউটিতে চাহিল
বি-াই বসিল তার আসে
সকুনি দুগধে লাকড়ি যুষিল
বিলাই পালায় তরাসে।
মধ্য-সমুদ্রে দুয়াড়ি আড়িনু
শালিকি পড়য়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মৎস্য বলিয়া দোয়াড়ি গুণিতে যাই
হরিণী পালায় লাফে লাফে।
বাঘে বলদে হালখানি জুড়িলাঙ
মন পবন তাহার কৃষাণ
পাণির কুম্ভীরে ছড়া ঝাড়িয়া খান
মূষায়ে বুনিঞা খান ধান।
মশার হাড়ে কুড়াখানি দিল
কুমেরলম্বের ঘর ছায়
বন্ধিকার পুত্র খড় তুলিয়া দেন
আন্ধলা গড়ি চিয়ায়।
তালের গাছে গোলের পোনা
সয়চানে ধরি ধরি খায়

পর্বত শিখরে পাণি উজাইল
চৌরস্থি পলুই লয়্যা ধায়।
বিম্বের ভিতরে লোহার কায়
নয় নয় পুওলা পাণি
অকূল সমুদ্রে নৌকায় শুকাইল
বোঝ পণ্ডিত আগমের বাণী॥

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা
মৎস্য নাঞি চেনে বক জল কৈল ঘোলা।
চারি চৌদ্দ ভুবন চোরা করে চুরি
এমন শকতি নাঞি চোরারে ভাড়্যা ধরি।
মকৰ্ষা সঙ্কীর্ণ নালে ধরিছে উজান
অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ।
ঘটের জীবন নিরঞ্জন মহাশয়
ঘটে ধরি নিরঞ্জন আছেন সর্বথায়।
জাগিয়া যুবতি দেখ যথা যুগী জাগে
জাগিলে যমের দূত ঝট নাঞি লাগে।
ঞিঙা ভুঞা নিকট নহে [কভু] দূর,
ঞিহারে সেবিলে পুত্তা রহে ভরিপূর।…

শিবের ব্যাখ্যান শেষ হইতেই গৌরীর তন্দ্রাবেগ ছুটিয়া গেল। তিনি শিবকে বলিলেন, মহাজ্ঞান বল শুনি। শিব মীননাথের চাতুরি বুঝিতে পারিয়া তখনি শাপ দিলেন, "এককালে হউক বিস্মরণ"।

গৌরী গঙ্গা দুই পত্নী লইয়া শিব ঘর করিতেছেন আর তাঁহার অনুগতভক্ত সিদ্ধগণ গৃহবাসহীন হইয়া রহিয়াছেন ইহা গৌরীর ভাল লাগিল না। শিবকে একথা বলায় তিনি বলিলেন, উহারা সিদ্ধ, কাম ক্রোধ লোভ মোহের অতীত। গৌরী বলিলেন, তোমার আজ্ঞা হইলে আমি তাহাদের মন কটাক্ষে হরণ করিতে পারি। শিব বলিলেন, চেষ্টা করিয়া দেখ। গৌরী মোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন। তাহাতে সব সিদ্ধই ভুলিলেন, গোর্খনাথ

ছাড়া। যোগভ্রষ্ট প্রধান দুই সিদ্ধ দেবীর শাপে (বা বরে) ধান্দাভোগ করিতে চলিলেন দুই দেশে। মীননাথ গেলেন কদলী—কামরূপে নারী-রাজ্যের রাম হইয়া। হাড়িপা গেলেন পাটিকা (প্রাচীন পট্টিকের) ভুবনে সিদ্ধভাকিনী রানী ময়নামতীর ঘোড়াশালায় হাড়ি-ঝাড়ুদারের কাজ করিতে। গৌরী ও শিব কৈলাসে রহিয়া গেলেন। গোর্খনাথ ও কানুপা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শিব গোর্খনাথকে তপস্বিনী পত্নীলাভের বর দিয়াছিলেন। শিবের বাণী ব্যর্থ হইবার নয়। এক তাপসী রাজকন্যা গোর্খকে পতিত্বে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। গোর্খনাথ পত্নীকে পুত্র বর দিয়া পলায়ন করিলেন। গোর্খনাথের কৌপীন-ধোয়া জল পান করিয়া রাজকন্যা গর্ভবতী হইয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম হইল কর্পটিনাথ। একদিন হঠাৎ গোর্খনাথ-কানুপার সাক্ষাৎ হইল এবং দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিল। অবশেষে পরস্পরের গুরু লইয়া টানাটানি পড়িলে গোর্খনাথ বলিলেন—

তোমার গুরু হাড়িপা বাউল জালন্ধরি
তলহরে করিল বঙ্গের অধিকারী।
একে সে বঙ্গের রাজা বড়ই দুর্বার
তলহরে রাখিল তারে নাহিক নিস্তার।
সেই সে পরম যোগী জগতে বাখানি
অচ্ছেদ অভেদ কায়া না দেখি যোগিনী।
দেখিতে না দেখি তারে সিদ্ধ কলেবর
পরমজ্ঞানে আছে সেই তলহর ভিতর।
গুরুর বচন কদলীতে সীসের রক্ষা নাই
সিদ্ধা কানুপা [তুমি] নহিবে চিরাই।[৫]

কানুপা উত্তর দিলেন—

তোর গুরু মীননাথ তার কথা শুন
দাড়ি গোঁপ পাকিল তার কিছু নাঞি গুণ।...

ঝগড়া মিটাইয়া দুইজনে নিজ নিজ গুরুর উদ্ধারে চলিলেন। গোর্খনাথ গেলেন কদলীতে, সে কাহিনী গোর্খ-বিজয়ের বিষয়। কানুপা চলিলেন পাটিকায়, সে ব্যাপার ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে।

৫ দ্বিজ জনার্দনের অনিল পুরাণ।

এই দুই শাখা-কাহিনীর এবং কাণ্ড-স্থানীয় শিবগৌরী সিদ্ধ কাহিনীর মধ্যে যেটুকু সাধারণ বস্তু আছে তাহাতেই নাথসিদ্ধ সাহিত্যের পত্তন। ইহা হইতেছে শিব কর্তৃক শক্তিকে (মূল কাহিনী) মহাজ্ঞান উপদেশ, এবং শিষ্য কর্তৃক গুরুকে (গোর্খ বিজয়) ও মাতা কর্তৃক পুত্রকে (ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্র কাহিনী) জ্ঞান উপদেশ দিয়া চৈতন্ত উৎপাদন ও বৈরাগ্য প্রবর্তন। এই যে বিপরীত বৃত্তি—সিদ্ধ গুরুকে শিষ্য শিখাইতেছে এবং রাজা-রানী-পুত্রকে মাতা সন্ন্যাস লওয়াইতেছেন—ইহাই নাথ-সিদ্ধ কাহিনীকে মহিমান্বিত করিয়াছে। বস্তুত সমগ্র পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন মহনীয় কাহিনী আর নাই। এবং বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করি। গল্প-রসের গাঢ়তার জন্ম ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক আর্য ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। গোরখপন্থী যোগী গায়কেরা—যাঁহারা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, পাঞ্জাবে ও রাজপুতনায় "সারঙ্গীহার" নাম পাইয়াছেন—বাঙ্গালা প্রান্তের এই কাহিনীটি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার বাহিরে প্রচলিত কাহিনীতে কিছু কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন হইয়াছে। গোপীচন্দ্রের ভগিনী চম্পার ও মাতুল ভর্তৃহরির ভূমিকা বাঙ্গালীর বাহিরে পরিকল্পিত।

ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রের প্রশ্নোত্তরের নমুনা দিতেছি দুর্লভ মল্লিকের গাথা হইতে। জালন্ধরির কাছে যোগী-দীক্ষা লইয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। মাতা ময়নামতীর কাছে ভিক্ষা মাগিতে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

কে তোমার আগু-গুরু কার তুমি চেলা
এ নব-যৌবনে কেন বিভূতি মাখিলা।
গন্ধগৌরক্ত যোগী কোথা গেলে পায়
নিদ্রা হইলে প্রাণ পুরুষ কোন [দ্রব্য] খায়।
বৃক্ষের কয় পত্র বরিষে কয় ধারা
নদীতে কতেক বালি আকাশে কত তারা।
জল স্থল পবন বরুণ দিবা রাত্তি
চন্দ্র সূর্য দেবতা সবাই থাকে কথি।
কোথায় উৎপত্তি হৈল। পৃথিবী সংসার
কোথায় রহিল পুন কহ সমাচার।

মরণের কিবা হেতু জীবন কিরূপ
ইহার উত্তর যোগী কহিবে স্বরূপ ॥
একুই উদরে জন্ম সমতুল নয়
জগৎ-সংসার কেনে একবর্ণ হয় ।
কাটিলে জীবন হয় না কাটিলে মরে
কি আহার করে শিশু জননী-উদরে ।
নদ নদী কন্দর কেন ভাটি-উজানি
হাট ঘাট কেন কোথা সাগর ত্রিবেণী ।

গোবিন্দচন্দ্র উত্তর দিলেন—

আত্ম-গুরু জন্মদাতা শিক্ষা-গুরু মা
জ্ঞান গুরু জালন্ধরি শিক্ষা হাড়িপা ।
এ নব-যৌবন মোর জুয়ারের পানি
জীবন সকল মিথ্যা ভস্ম কায়াখানি ।
গন্ধসৌরভ যত নাসিকাতে পায়
নিদ্রা হৈলে প্রাণ পুরুষ শূন্যঘরে যায় ।
বৃক্ষের এক পত্র বরিষে এক ধারা
এক বালি নদীতে আকাশে এক তারা ।
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ
আপনি চন্দ্র সূর্য জগৎ প্রকাশ ।
দিবা নিশি অরুণ-বরুণ-কোথা আর
প্রলয় সংসার দেখ তত্ত্ব আপনার ।
মরণ সদাই সত্য জীবনে কি আশা
পরাণ-পুত্তলির হয় হাড়ে চর্মে বাসা ।
একই উদরে জন্ম নানা বর্ণে হয়
মূল নাড়ি কমল পদ্ম সব ঘটে রয় ।
কাটিলে জীবন পায় না কাটিলে মরে
আপনি বুঝহ ভেদ আপন শরীরে ।
জননী জঠরে বন্দী স্থিতি দশ মাস
পবন আহার শিশু-শরীর প্রকাশ ।

গঙ্গাঘাটা নদ-নদী ঘাট আর উজানি
হনুমন হাট ঘাট সাগর ত্রিবেণী।

যোগী-সিদ্ধদের ইতিহাস অনেক দিনের। চৌরাশী সিদ্ধের উল্লেখ রহিয়াছে জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মত চৌরাশী সিদ্ধের চৌরাশীও সাঙ্কেতিক সংখ্যামাত্র। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পঞ্চাশ যোগী-সিদ্ধের ও পঁয়ত্রিশ জ্ঞান-ডাকিনীর (অর্থাৎ সিদ্ধ-যোগিনীর) কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। রাউত নৃসিংহ বসু 'পঞ্চাশৎসিদ্ধাবদান' ও 'পঞ্চত্রিংশজ্ঞানডাকিন্যবদান' রচনা করিয়াছিলেন এবং যোগীদের সাধনগীতি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই নিবন্ধগুলির এখন শুধু তিব্বতী অনুবাদ বর্তমান আছে।

গোর্খনাথ ছাড়া আদি সিদ্ধ-যোগীদের নামগুলির ঐতিহাসিকতায় সন্দেহের কারণ নাই, যোগী-সিদ্ধ কবি মীননাথের স্মৃতি চতুর্দশ শতাব্দী অবধি নিশ্চয়ই চলিয়া আসিয়াছিল।[৬] চর্যাগীতিকোষে টীকাকার মুনিদত্ত মীননাথের লেখা 'পরদর্শন' নিবন্ধ (?) হইতে এই চারি ছত্র ছড়া উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম-কুরঙ্গ-সমাধি-কপাট।
কমল বিকসিল কহিহ ন ভমরা
কমল-মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা।[৭]

শেষ দুই ছত্রের অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি শুনিতেছি লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে মীননাথ-প্রক্ত হরগৌরীর তত্ত্বসংবাদে—

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধু ভোগ।
মৎস্য নাহি চেনে বক জল কৈল ঘোলা।

মীননাথের সাধু নামান্তর মৎস্যেন্দ্র, তাহাতে আবার নাথ যোগ করিয়া হইল মৎস্যেন্দ্রনাথ। বাঙ্গালার বাহিরে এই নামই বেশি প্রচলিত। মোছন্দরে

---

৬ মীননাথের নামে একটি ছোট কামশাস্ত্রের বই (নাম স্মরদীপিকা) পাওয়া গিয়াছে। মীননাথের কদলীরাজ্য ভোগ-কাহিনী হইতেই বোধ হয় এই আদি-সিদ্ধকে স্মরতন্ত্রচতুর কল্পনা করা হইয়াছিল। নিবন্ধটি মীননাথের রচনা না হওয়াই সম্ভব।

৭ অর্থাৎ—গুরু কহিতেছেন পরমার্থের বর্ত্ম—যাহা কর্মরূপ কুরঙ্গের সমাধির কপাট। বিকশিত কমলের খবর সাধকের কাছে পাওয়া যায় না, কিন্তু কমল-মধু পান করিতে ভ্রমর ধাঁধায় পড়ে না।

(বা মোচন্দর) মৎস্যেন্দ্রের বিকৃত রূপ, কি মৎস্যেন্দ্র মোছন্দরের সংস্কৃত রূপ তাহা বলা শক্ত। মোছন্দর মূলত অনার্য ভাষার শব্দ বা নাম হইতে পারে, তাহা হইলে "মৎস্যেন্দ্র" ইহারই সংস্কৃতায়িত রূপ হইবে। পরিচিত "মছন্দলি" ও "মোচরা" পীর মোছন্দরেরই আধুনিক রূপান্তর। নেপালে এবং অন্যত্র মীননাথ "মচ্ছন্ন" নামেও প্রসিদ্ধ আছেন। তিব্বতী কিংবদন্তীতে বলে যে মীননাথ কৈবর্ত ছিলেন। হিন্দী-রাজস্থানী ছড়াতেও পাই "গোরখ কেওটিয়া"। এদিকে হাড়িপার নামান্তর জালন্ধরি। অতএব নাথ-সিদ্ধদের নাম হইতে জাতি নির্ণয় যুক্তিসাধ্য নয়। মীননাথে নাম এবং মাছের পেটে থাকিয়া (বা মাছের রূপ ধরিয়া) তাঁহার মহাজ্ঞান শ্রবণ সম্ভবত কোন প্রাচীনতর মৎস্যউপাস্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। এই ইঙ্গিত পৌরাণিক মৎস্যাবতার কাহিনীর সঙ্গেও অসম্পৃক্ত নয়। বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধরিয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। মীননাথের মহাজ্ঞান লাভও একপ্রকার বেদ-উদ্ধার বলিতে হইবে।

হাড়িপার নামান্তর জালন্ধরি। জালন্ধরিপাদের লেখা একাধিক তান্ত্রিক যোগসাধনা নিবন্ধের তিব্বতী অনুবাদ মিলিয়াছে। যেমন, 'তত্ত্বিবজ্র প্রদীপিকা' '(হেবজ্রতন্ত্রেরটিপ্পনী)' 'বজ্রযোগিনীসাধন,' 'শ্রীচক্রসম্বরগর্ভ-তত্ত্ববিধি' এবং 'হুঙ্কারচিত্তবিন্দুভাবনাক্রম'। সবগুলি একই ব্যক্তির রচনা না হইতে পারে। জালন্ধরি নামে একাধিক সিদ্ধাচার্য থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

জালন্ধরি-পাদের শিষ্য কাহ্নপাদ বা কানপার লেখা কয়েকটি চর্যাগীতি (হিন্দী মরমিয়া সাধক-কবিদের ভাষায় "কবরী শবদ") পাওয়া গিয়াছে। কাহ্নপাদের নামে যে অপভ্রংশ দোহাকোষ এবং তান্ত্রিক-যোগসাধনাঘটিত নিবন্ধগুলি মিলিয়াছে তাহা ইঁহারই লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার হেতু নাই; কেননা এই নামে একাধিক সিদ্ধাচার্য বিদ্যমান ছিলেন। কাহ্নপাদের ভণিতায় বারোটি চর্যাগীতি মিলিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্তত ছয়টিকে তান্ত্রিক যোগী-সিদ্ধ কানপার রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই। একটিতে[৮] গুরু জালন্ধরির দোহাই রহিয়াছে—

সাখি করিব জালন্ধরি পাএ
পাখি ণ-রাহঅ মোরি পাণ্ডি আচাএ॥

---

৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত বৌদ্ধগান ও দোহা চর্যাগীতি সংখ্যা ১৬।

নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে চৌরঙ্গিনাথ নামরূপে পর্যবসিত। এক যোগী (বা তান্ত্রিক) আচার্য চৌরঙ্গির লেখা 'বায়ুতত্ত্ব ভাবনোপদেশ' নিবন্ধ মিলিয়েছে তিব্বতী অনুবাদে। নাথ-সিদ্ধ চৌরঙ্গি বোধ হয় খঞ্জ ছিলেন। তাই ধর্মের চরণ হইতে তাঁহার জন্ম কল্পিত হইয়াছে "চৌরঙ্গী পদুই লয়্যা ধায়" সেই সাক্ষ্যই দিতেছে।[৯] গোর্খবিজয়ের কর্পটিনাথ ও হিন্দী মরমিয়া সাধক-কবিদের উক্তিতে চর্পটিনাথ বোধ করি একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করিতেছে। চর্পটি-পাদের লেখা 'লোকেশ্বরস্তোত্র' ও চতুর্ভূতভবাভিবাসনক্রম' নিবন্ধ দুইটির তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালায় নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে কাণেরি-নাথের উল্লেখ নাই, বাঙ্গালার বাহিরে আছে। অপভ্রংশে অথবা প্রাচীন লেখা কাণেরি-গীতিকার সন্ধান মিলিয়েছে। তিব্বতী অনুবাদে আর্যদেবের নামেও 'কাণেরি-গীতিকা' আছে। চর্যাগীতিকোষে আর্যদেবের যে চর্যাগীতিটি রহিয়াছে তাহাতে নাথ-পন্থের দিশা দুর্লক্ষ্য নয়। কাণেরি-পাদ কি তবে আর্যদেবেরই নামান্তর?

গোর্খবিজয়ে সিদ্ধ-পরীক্ষা প্রসঙ্গে গাভুর[১০] সিদ্ধার উল্লেখ আছে, যাঁহাকে দেবী শপিয়াছিলেন, "সংসারে ভজিব তুমি দেখিয়া জোয়ান"। ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনীতে গাভুর (বা শিশু-পা) হাড়িপার শিষ্যপুত্র। ইনিই কি বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য গর্ভপাদ বা গর্বরি-পাদ যিনি (বা যাঁহারা) 'বজ্রযানমূলাপত্তিটীকা' ও 'হেবজ্রৈকস্মৃতি' লিখিয়াছিলেন?

নাথ-পন্থের মূল-গুরু গোর্খনাথের ঐতিহাসিকতার কোনই আভাস মিলিতেছে না। নামটি সম্ভবত কোন অনার্য ভাষার শব্দের সংস্কৃতায়িত রূপ। আধুনিক কালে নামটির লোকব্যুৎপন্ন অর্থ প্রবল হইয়া যোগী গুরুকে গো-রক্ষক (বিশেষ করিয়া দুগ্ধবতী-গাভী-রক্ষক) দেবতায় পরিণত করিয়াছে বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে।

সাহিত্যিক ঐতিহ্যে নাথ-পন্থের যে দিশা মিলিতেছে তাহাতে একাধিক যোগ ও তন্ত্র-সাধনার সূত্র প্রায় অবিশ্লেষ্যভাবে জট পাকাইয়া গিয়াছে। চারিজন আদি-সিদ্ধের কথা প্রথমে ধরা যাক। মীননাথ-গোর্খনাথ এক দলে পড়েন, হাড়িপা-কানপা অন্য দলে। এই দুই দল যে মূলত দুই পৃথক

৯ পূর্বে দ্রষ্টব্য। এইখানে চৌরঙ্গিনাথকেও কৈবর্তবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখি।

১০ সংস্কৃত "গর্ভরূপ" হইতে, অর্থ বালক শিশু।

সম্প্রদায় ছিল তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। এক সম্প্রদায়ে নামের শেষে পাই "নাথ", অপর সম্প্রদায়ে "পা" (পাদ)। মীননাথ-গোর্খনাথের সম্প্রদায় ছিল একান্তভাবে নারীসঙ্গবিবর্জিত জ্ঞানাশ্রিত যোগ-মার্গাবলম্বী। হাড়িপা-কানপার সম্প্রদায়ও যোগ-মার্গী ছিল কিন্তু তাহা পুরাপুরি জ্ঞানাশ্রিত ছিল না, তাহাতে তান্ত্রিক-সাধনা চলিত এবং নারী সাধিকার স্থানও ছিল প্রথমকে বলিতে পারি অবধূত-যোগী সম্প্রদায়, দ্বিতীয়কে কাপালিক-যোগী সম্প্রদায়। অবধূত-যোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাপালিক-যোগী সম্প্রদায়ের বৈপরীত্য এবং বিরোধ প্রকটিত হইয়াছে বাঙ্গালা নাথ-পন্থ কাহিনীতে। মীন-চৈতন্য কাহিনীতে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ দেখাইয়া শেষে অবধূত-যোগীরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে।

অবধূত যোগ-মার্গেও জটিলতা ছিল। আসলে মীননাথের ও গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ভেদ ছিল। গোর্খনাথ ছিলেন সেই যোগী-গোষ্ঠীর আদিগুরু যাঁহাদের সাধনার মূল কথা বিন্দুধারণ ও আত্মজ্ঞানলাভ। এই গোষ্ঠীর সাধনপথ ছিল কঠোর ব্রহ্মচর্যের এবং জ্ঞানযোগের। মীননাথের গোষ্ঠী মূলত ছিল শৈব-সম্প্রদায়ের সহিত সম্পৃক্ত। মীননাথ শিবেরই প্রতিরূপ। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে শিবের যে কোঁচনী-প্রীতি দেখি তাহা মীননাথের কদলীমোহনকেই স্মরণ করায়। গোর্খ-গোষ্ঠী যখন মিলিয়া গেল মীন-গোষ্ঠীর সঙ্গে তখন মীন হইলেন গোর্খের গুরু। কিন্তু মূলগত বিরোধের চিহ্নটুকু একেবারে লুপ্ত হইল না, গুরুকে শিষ্যের কাছে চৈতন্য-উপদেশ লইতে হইল। জয়ী হইলেন শিষ্যই, গুরুর মর্যাদা বজায় রহিল শুধু শিষ্যের স্বীকৃতিতে।

তাহার পর অবধূত-যোগী ও কাপালিক যোগী-সম্প্রদায় মিলিয়া গেল। এই মিলিত সম্প্রদায়ই নাথ-পন্থ। ইহার মূলতত্ত্ব হইতেছে বিন্দুধারণ, দেহশুদ্ধি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডদর্শন এবং আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা কালজয়। যোগী-গুরুরা অবধূত-মার্গী সাধু হইলেন, কাপালিক-যোগী সাধকেরা ভিক্ষুক ও গৃহস্থে পরিণত হইল।

নাথ-পন্থে যোগ-সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে 'সহজ' অবস্থা প্রাপ্তি। সহজাবস্থায় ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের পৃথকভাব থাকে না, দেহ ও জগৎ একাকার হইয়া যায় এবং যোগী ত্রিকালের অতীত হইয়া অজরত্ব অমরত্ব লাভ করেন। বীর্য ঊর্ধ্বগ, বায়ু নিরুদ্ধ এবং চিত্ত নিষ্ক্রিয় হইলেই হয় সমতাযোগ এবং তাহারই পরিণতি সহজাবস্থা—

মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির।
বিন্দু থির তো কন্দ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।[১১]

ব্রহ্মচর্যের উপর জোর ছিল সবচেয়ে বেশি। নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে ইহার পরিচয় রহিয়াছে পদে পদে, নারীর ও নারী-দেবতার নিন্দায়। গোর্খবিজয়ের উপক্রমণিকায় গোর্খনাথের হাতে গৌরীর লাঞ্ছনায় ইহার তীব্র অভিব্যক্তি। সহদেবের অনিলপুরাণে দেবীদের কুৎসায় মুখর হইয়াছে শাস্তনু মুনি—

জানিল এখন তোর দুর্গা বড় সতী
যাহার সতীপনাএ পালায়্যা গেল খিতি।
মন দিয়া শুনহ দুর্গার বেভার
যাহার উঠিল কলঙ্ক আইবড় ভাতার।
চণ্ডী বড় সতী তোর চণ্ডী বড় সতী
যার সতীপনাএ পালাইয়া গেল খিতি।
মন দিয়া শুন সভা চণ্ডীর বেভার
তাহার উঠিল কলঙ্ক বাদিয়া ভাতার।
বাসুলী বড় সতী তোর বাসুলী বড় সতী
যার সতীপনাএ পালাইয়াছে খিতি।
মন দিয়া শোন সেই বাসুলী-ব্যবহার
তাহার উঠিল কলঙ্ক অসুর ভাতার।
মনসা বড় সতী তোর মনসা বড় সতী
যার সতীপনাএ পালাইয়া গেল খিতি।
মন দিয়া শোন তাহার ব্যবহার
তাহার উঠিল কলঙ্ক পিতার ভাতার।
সীতা বড় সতী তোর সীতা বড় সতী
তার সতীপনাএ পালায়্যা আছে খিতি।
মন দিয়া শোন সেই সীতার বেভার
তাহার উঠিল কলঙ্ক রাবণ-ভাতার।

---

১১ হঠপ্রদীপিকা-ধৃত গোর্খ-বাক্য (অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১১৮।

কপিলা বড় সতী ছোর কপিলা বড় সতী
তার সতীপনাথ পালায়্যা গেল খিতি।
মন দিয়া শুন সেই কপিলার বেতার
এক কপিলার হৈল এক শত ভাতার।

নাথ-যোগীদের সাধারণ বেশচিহ্ন হইতেছে কানে কুণ্ডল এবং গলায় নাদবিন্দু ধারণ। কুণ্ডল হইতে শাঁখের অথবা গণ্ডারশৃঙ্গের, নাদ হইতেছে নিরঞ্জনের পদচিহ্ন অথবা অনুরূপ কোন লাঞ্ছনা। বিন্দু হইতেছে কৃষ্ণবর্ণ ঊর্ণাসূত্র যাহাতে নাদ গাঁথা থাকিত। জটাভার বহন অথবা মস্তক মুণ্ডন এবং অঙ্গে ভস্মলেপন ছিল গোষ্ঠীগত রীতি। কাপালিক সম্প্রদায়ের যোগীরা নটবেশ ধারণ করতেন। তাঁহাদের পায়ে থাকিত নূপুর, হাতে ডমরু, গলায় পুঁতির মালা। কাহ্নের একটি চর্যাগীতিতে এই যোগীবেশের উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। ইহার অনুবাদ দিতেছি—

কাপালিক যোগী কাহ্ন বাহির হইয়াছে বিচরণে,
সে দেহ-নগরীতে বিহার করিতেছে এই আকারে।
অ-বর্ণাদি (স্বর) ও ক-বর্ণাদি (ব্যঞ্জন) তাহার চরণে ঘুণ্টি-নূপুর,
রবি-শশীকে করা হইয়াছে কুণ্ডল-আভরণ,
রাগ দ্বেষ মোহ ছাই করিয়া মাখা হইয়াছে,
পরম মোক্ষকে নেওয়া হইয়াছে মোতির মালা করিয়া।
শাশুড়ী ননদ শ্যালীকে ঘরে মারিয়া রাখিয়া
মায়াকে (বা মাকে) হত্যা করিয়া কাহ্ন হইল কাপালিক॥

নাথ-পন্থীদের কাছে সব চেয়ে পবিত্র গাছ ছিল বকুল, যেমন এখন শৈবদের কাছে বেল।[১২] গোর্থবিজয়ে দেখি যে গোর্খনাথের সিদ্ধ-পীঠ হইতেছে বিজয়ানগরে বকুলতলা। দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিলপুরাণের মতে কদলীরাজ্যেও বোধ হয় বকুল-পীঠ ছিল। গুরু-উদ্ধার উদ্দেশ্যে গোর্খনাথ নর্তকীর রূপ ধারণ করিতেছেন—

১২ পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন প্রাচীন শিবপীঠ বেল গাছের বদলে বকুলগাছ দেখা যায়। প্রাচীন নাথ-পন্থেরই সম্পর্ক সূচনা করিতেছে। "সিদ্ধ-বকুল" নামটিতে যোগী-সিদ্ধের সঙ্গে বকুল গাছের সম্পর্কের স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে।

দেহ-রূপগুণ গোর্ক ঘুরে জোয়াগিয়া
স্ত্রীর রূপ ধরে গোর্ক মায়া ত পাতিয়া।
কাল ধল ধূপে কেশ আমোদিত করি
বিচিত্র কানড় ছান্দে বান্ধিল কবরী।
তাহে বেঢ়ি গন্ধ শুক্লকুসুমের মালা
মেঘরাজ মধ্যে যেন পড়িছে বিজলা।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পরে কনক-অম্বিকা
পিঠে পাটথোপ দোলে নামে মধুরিকা।
বিচিত্র পাটের তুনি মেঘগজাজল
নানা চিত্র ধৌত তাহে দেখিতে উজ্জ্বল।
কপালেত সাজাইল দিয়া পত্রাবলি
এমন সিন্দুরের ফোটা পরিলা সুন্দরী।"
সাজন করিয়া হৈল গোর্কের গমন
কদলী বকুলে[১৩] গিয়া দিল দরশন।
কদলী বকুলে[১৩] গুরুর পদচিহ্ন পাইয়া
পার হৈল গোর্খনাথ চামড়া বিছাইয়া।

নাথ-যোগমতের সূত্র অর্বাচীন বৈদিক যুগে গিয়া পৌঁছায়। নাথ-পন্থের সৃষ্টি-বর্ণনার সঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সঙ্কলিত নাসদীয় সূক্তের মিল দেখাইয়াছি। উপনিষদে নাথ-যোগমতের বিশিষ্ট রূপক হংসের (বা পরমহংসের) উল্লেখ পাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উদ্ধৃত যে তিনটি শ্লোকে "হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ" উল্লিখিত হইয়াছেন[১৪] তাহাতে অর্বাচীন নাথ-পন্থেরও ধর্ম-পূজার কোন কোন ছড়ার সঙ্গে গভীর ঐক্য উপলব্ধি হয়। উদ্ধৃতিগুলি তুলনা করিলে বোঝা যাইবে। উপনিষদ্-গাথা-শ্লোক—

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যা
অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।
শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং
হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ।

---

১৩ "বকুল" এখানে "বাকুল" হইতেও পারে। দক্ষিণ রাঢ়ে বাকুল শব্দটি চলিত আছে, অর্থ বাসভবন।

১৪ ৪. ৩. ১১-১৩।

প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং
বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা।
স ঈয়তে অমৃতো যত্রকামং
হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ।

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো
রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো
জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্ ॥

ধর্ম-ঠাকুরের ছড়া—

ব্রাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন রায়
দেখিতে দেখিতে হংস শূন্যেতে লুকায়।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশের জুতি
হংস চরিয়া যায় দোহ প্রহর রাতি।
স্বর্গেতে থাকিয়া হংস নাম্বিল মরতে
কৌতুকে মৃণাল তুলি কে পায় দেখিতে।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চলিয়া যায় তেজ প্রহর রাতি।
এমনি অপূর্ব হংস নাই সমতুল
হংস ছিণ্ডিয়া খায় কমলের ফুল।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিয়া যায় নিশাভোর রাতি ॥

নাথ-পন্থের ছড়া—

উড়্যা যায় পরমহংস নাই যায় দূর
উড়িয়া ঘুরিয়া যান নিরঞ্জন-পুর।

তান্ত্রিক মহাযান-পন্থী বৌদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেক সিদ্ধাচার্যই ছিলেন নাথ-যোগপন্থী, এবং চর্যাগীতিকোষের সকল গানই যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাধনার ইঙ্গিত বহন করিতেছে না সেকথা স্বীকার করিবার সময় হইয়াছে। কাহ্নের কথা কিছু আগে বলিয়াছি। কাহ্নের একটি গানের প্রথম দুই ছত্র ধর্ম-ঠাকুরের ছড়ায় রক্ষিত হইয়াছে।

"ঢেণ্ঢণ-পা" ভণিতাযুক্ত চর্যাগীতিটির বহুল অংশ নাথ-পন্থের ধারা বাহিয়া আসিয়া কবীরের নামিত একটি গানে দেখা দিয়াছে। সম্ভবত ঢেণ্ঢণের কোন শিষ্য গানটি লিখিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়—

টিলাতে মোর ঘর, পড়শী নাই,
হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপপতির উপদ্রব।
বেগে সংসার বহিয়া যায়
দোহা দুধ কি বাঁটে ঢোকে।
বলদ প্রসব করিল, গাভী বাঁঝা,
পাত্র ভরিয়া দোহা হয় তিন সাঁঝে।
নিতি নিতি শৃগাল যুঝে সিংহের সনে
ঢেণ্ঢণ-পায়ের গীত কম লোকে বোঝে॥

কবীরের গানটি এই—

অব কেয়া করে গান গাওঁ-কোতোয়ালা
খ-মাংস পসারি গীধ রাখোয়ালা।
মূষা কি নাও বিলাই কৌড়ারি
সোয়ে মেডুক নাগ পহারি।[১৫]
বলদ বিয়াওয়ে গাবী ভই বাঁঝা
বাছুরি দুহাওয়ে দিন তিন সাঝা।
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে যুঝে
কহে কবীরে বিরল জনে বুঝে॥

সিদ্ধাচার্য সরহের রচনায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অপেক্ষা নাথ-যোগ-সাধনার ইঙ্গিতই বেশি পাওয়া যায়। এই চর্যাগীতিটি যেন মুগ্ধ গুরু মীননাথের প্রতি মুক্ত শিষ্য গোর্খনাথের উক্তি—

নাদ নয়, বিন্দু নয়, রবি-শশিমণ্ডল নয়,
চিত্তরাজ স্বভাবতই মুক্ত।
ঋজু রে ঋজু ছাড়িয়া বাঁক লইও না,
বোধি নিকটেই, লঙ্কায় যাইও না।

---

১৫ অর্থাৎ এখন কি গান করে গাঁয়ের কোতোয়াল। কুকুর দিয়াছে মাংসের পসার, শকুনি তাহার রক্ষক (অথবা খ-মাংসের পসরার রক্ষক শকুনি)। মূষিক হইল নৌকা, বিড়াল তাহার কাণ্ডারী। ব্যাঙ আছে শুইয়া, তাহার প্রহরী সাপ।

হাতে রহিয়াছে কাঁকণ, দর্পণ লইও না,
আপনা আপনি বোঝ নিজ মন।…
বামে ডাহিনে যে খাল-খোড়
সরহ ভনে, বাবা সোজা রাস্তা সামনে দেখা যাইতেছে॥

আর একটি চর্যাগীতির একটি ছত্রও যেন কদলীমোহমুগ্ধ মীননাথকে নির্দেশ করে—"বধে ছায়া লইলে, পারে ভাঙ্গিল তোমার বিজ্ঞান।" সরহের একটি অপভ্রংশ দোহাতেও পাই ইহার ইঙ্গিত—

যে নারী খায় নিজ পতিকে……
স্বামীর পাশে বসিয়া থাকে, কিন্তু সে চিত্তে ভ্রষ্টা,
যোগিনীর এই স্বরূপ আমি দেখিতেছি।

সরহের এই দোহায় তো শ্রীনাথ-গুরুর উল্লেখ রহিয়াছে—

বিন্ন বি বজ্জিঅ জোউ রজ্জুই
অচ্ছহ সিরি-গুরু-নাহ কেছিজ্জুই।

আর একটি দোহায় সরহ বলিয়াছেন—

অনিমিষ-লোঅণ চিত্তনিরোধেঁ
পবণ নিরুহই সিরিগুরু-বোহেঁ।
পবণ বহই সো নিচ্চলু জবেঁ
জোই কোলু করই কিরে তবেঁ।

এমন ত্রিকালজয়ী সিদ্ধযোগীর কাছে কর্ম নিরর্থক এবং নির্বাণ অর্থহীন। তাই সরহ বলিয়াছেন চর্যাগীতিতে—

আমরা জানি না, অচিন্ত যোগী,
জন্ম মরণ ভব হয় কিরূপে।
যেমন জন্ম মরণও তেমনি,
জীবন্তে মৃতে বিশেষ নাই।
যাহার এখানে আছে জন্ম-মরণের শঙ্কা
সে করুক রস-রসায়নের কাঙ্ক্ষা।

সহজাবস্থাপ্রাপ্ত সিদ্ধযোগীর কাছে জন্মমৃত্যু সমান। তাই কাহ্ন তাঁহার জীবনসায়াহ্নে আসন্নবিয়োগব্যথাতুর কোনো শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

সহজাবস্থায় চিত্ত থাকে শূণ্যে সম্পূর্ণ,
বস্তুবিয়োগে বিষন্ন হইও না।
বল, কিসে কাহ নাই,
যখন যে অনুদিন ত্রিভুবন ব্যাপিয়া বিলাস করিতেছে।
মূঢ়লোকে দৃষ্ট-নষ্ট দেখিলে হয় কাতর,
তরঙ্গভঙ্গ কি সাগর শোষে
মূঢ় থাকে যতদিন ততদিন লোকে দেখে না,
দুধের মাঝে মাখন থাকিলেও দেখিতে পায় না,
এই সংসারে কেহ আসে না যায়ও না।
এইভাব লইয়া বিলাস করিতেছে যোগী কাহ্ন।

নাস্তিক এবং বেদাচারবহির্ভূত বলিয়া নাথ-পন্থীরা ব্রাহ্মণ্যসমাজ নিন্দিত ছিল। বর্ণাশ্রমীদের কাছে নাথ-যোগীদের আচরণ ছিল জুগুপসিত। তবুও যোগী গুরুর মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ্যসমাজেও অস্বীকৃত ছিল না। যোগীদের আচরণ ও প্রভাব সম্পর্কে সেকশুভোদয়ায় একটি গল্প আছে। তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্মণসেনদেবের পাটহাতী একটা পথে একটি মাটি স্তূপ পাইয়া তাহা না ডিঙ্গাইয়া নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। এই কথা রাজার কানে গেলে তিনি স্তূপ খুঁড়তে হুকুম দিলেন। স্তূপমধ্য হইতে বাহির হইল এক সমাধিস্থ যোগী। ধ্যানভঙ্গ হইলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন রাজা কে? লোকে উত্তর দিল, এখন লক্ষ্মণসেন রাজা। যোগী বলিলেন, বিক্রমকেশরী গেলেন কোথায়? ইহাতে বোঝা গেল যে, বহুযুগ পূর্বে বিক্রমকেশরীর রাজ্যকালে যোগী সমাধি আশ্রয় করিয়াছিলেন। রাজা সমাদর করিয়া যোগীকে সভায় আনাইলেন। যোগী নিজের পরিচয় দিলেন। নাম চন্দ্রনাথ। গৃহস্থাশ্রমে তিনি ছিলেন গোয়ালা, নাম ছিল সুধাকর। লক্ষ্মণসেন যোগীকে অনুরোধ করিলেন কিছু আহার করিতে। যোগী কহিলেন, অমৃতার পাইলে খাইতে পারি। তখনি রাজার মহানস হইতে উত্তম খাদ্য-পানীয় আনা হইল। যোগী একটু মুখে দিয়াই থু থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজা অপ্রস্তুত হইয়া সুধাইলেন, অমৃতার তবে কি? যোগী উত্তর করিলেন, তোমার সভায় যদি কেহ সত্যকার পণ্ডিত থাকেন তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান অমৃতার কি। রাজা খবর দিলেন গোবর্ধন আচার্যকে। তিনি ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, খুব

খারাব মোটা চাউলের ভাত আর কালো কচুর শাক সিদ্ধ[১৬] পরিবেশন করিতে। রাজা তাহাই করাইলেন। সেই অখাদ্য পরম পরিতৃপ্তভাবে খাইয়া যোগী রাজাকে বলিলেন, মহারাজ আমরা যোগী, সুখাদ্য আমাদের পরিত্যাজ্য বিষের মত, কদর্য অন্ন আমাদের উদরে অমৃতের কাজ করে।

ভারতবর্ষের মিষ্টিক সাধক কবিরা উপনিষদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবরই তাঁহাদের অধ্যাত্ম-উপলব্ধিতে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন প্রহেলিকার ছাঁদে। নাথ-পন্থী যোগী গুরু এই প্রহেলিকা-ছড়ার ছাঁদকে যোগ-শিক্ষা উপদেশের বিশিষ্ট বাহন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই প্রহেলিকা ছড়ার ও অধ্যাত্মরূপকের উদ্ভব হইয়াছিল বাঙ্গালায়। তাই হিন্দী রাজস্থানী ছড়ার মধ্যেও বাঙ্গালার সুর শোনা যায়।[১৭] নাথ-পন্থী যোগীরা বিশেষভাবে ছিলেন পরিব্রাজক। ইহাদের মধ্যে জাতির পাঁতি তো ছিলই না, ভাষার গণ্ডীও না। পশ্চিমা যোগী গুরুর পুরবিয়া শিষ্য এবং পুরবীয়া যোগী-গুরুর পাশ্চমা শিষ্য বিরল ছিল না। তাই পুরানো বাঙ্গালা নাথ-পন্থীদের নিবন্ধে হিন্দী প্রশ্নোত্তর ছড়া মিলিতেছে।[১৮] কলন্দর ও দরবেশ ফকীরদের মধ্যেও ইহা অজ্ঞাত ছিল না। যেমন নয়ানচাঁদ ফকীরের "বালকানামা"য়[১৯] বাল্‌কার (অর্থাৎ শিষ্যের) সওয়াল—

কাহাঁ বৈঠে রাম-রহিম কাঁহা বৈঠে খাই
কাহাঁ বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই।
কাহাঁ গোলক-বৈকুণ্ঠ কাহাঁ মক্কা-মদিনা
কাহাঁ চন্দ্র-সূর্য কাহাঁ কাহাঁ দীন-দুনিয়া।
কাহাঁ বৈঠে চৌদ্দভুবন কাহাঁ আলম তারা
কাহাঁ মেঘ বিজুরী কাহাঁ কাহাঁ বৈঠে ধারা।
নঞানচাঁদ ফকীরে বলে দরবেশ মেরা ভাই
কোন আলম খবর বান্দা এক পলকমে পাই।

---

১৬ ময়নামতীর গানে যোগী-সিদ্ধও শিষ্যার রান্না কালো কচুশাক সিদ্ধ খাইয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন।

১৭ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ৭৫৮।

১৮ গোর্খবিজয়ের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৯ আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রথম-খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১৩৮।

মুরশীদের জবাব—

> সিন্ধুসে বৈঠে রাম-রহীম সিন্ধুসে মালিক-সাঁই
> সিন্ধুসে বৃন্দাবন মোকাম মক্কিন স্থান ভেদ পাই।
> ঘরে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুহিম্মা আলম তারা
> চাঁদসূর্য মেঘ বৃষ্টি ইন্দ্রে বৈছে ধারা॥

জৈন সম্প্রদায়ে প্রচলিত অপভ্রংশ দোহাতেও যোগ-পন্থী সিদ্ধ-সাধকের প্রশ্নোত্তর মিলিয়াছে। যেমন[২০]—

প্রশ্ন—

> কালহিঁ পবণহিঁ রবিসসিহিঁ
> চউ একট্‌ঠই বাসু
> হউঁ তুহিঁ পুচ্ছউঁ জোইয়া
> পহিলে কাসু বিণাসু।

উত্তর—

> সসি পোসই রবি পজ্জলই
> পবণু হলোলে লেই
> সত্ত রজ্জু তমু পিল্লি করি
> কম্মহঁ কালু গিলেই॥

উত্তরবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ যোগী-কাচ[২১] বা যোগী যাত্রা আগ্রহের সহিত শুনিয়া আসিয়াছে সেদিন অবধি। ইহার মূল হইতেছে নাথ-পন্থী সাধক-সিদ্ধদের প্রহেলিকা-বিলাস। ষোড়শ শতাব্দীতেও যোগীদের অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ প্রহেলিকা-ছড়া সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে অদ্বৈত আচার্যের কাছে নিম্নলিখিত প্রহেলিকা-ছড়াটি পাইয়া অন্তরঙ্গের কাছে বলিয়াছিলেন—

> মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ
> আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ।

অদ্বৈত-আচার্য প্রেরিত ছড়াটি এই—

> বাউলকে কহিহ লোকে হইল বাউল
> বাউলকে কহিহ হাটে না বিকায় চাউল।

২০ ডাক্তার হীরালাল জৈন সম্পাদিত পাহুড় দোহা ২১১, ২২০।
২১ [illegible] বঙ্গবাণী মাঘ (১৩২৯) দ্রষ্টব্য।

বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

অদ্বৈত-আচার্যের যোগী-সুলভ প্রহেলিকাপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,

"তর্জা প্রহেলী আচার্য কহে ঠারে ঠারে"
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে।

আধুনিক যোগী-কাচে ফকীরের দরবেশ-বাউল-বৈষ্ণবভাবের রঙ বেশি করিয়া লাগিয়াছে। আর প্রবেশ করিয়াছে সহজ সরস দেহতত্ত্বের মধ্য দিয়া ব্যবহারিক জীবনের সহজ সরল অভিজ্ঞতার কথা। যেমন,

বালকরামের প্রশ্ন—

কোথায় বসে মণি-মগজ কোথায় বসে চান
লতি-রতন কোথায় বসে কোথায় বসে প্রাণ।
কোথায় বসে তাল-সুধা কোথায় বসে কল
কোথায় বসে রতি-রতন কোথায় বসে বল।
কোথায় বসে সাত জন কোথায় বসে মোড়া
কোথায় বসে জোর বলে কোথায় বসে ঘোড়া ॥

গুরুর উত্তর—

মাথায় বসে মণি-মগজ ললাটে বসে চান
কমলে বসে লতি-রতন ধড়েতে বসে প্রাণ।
তালুতে বসে তাল-সুধা জিহ্বায় বসে কল
ধড়েতে বসে রতি-রতন বাহুতে বসে বল।
ছাতিতে বসে সাত জন রে নাভিতে বসে মোড়া
কোমরে বসে জোর বলে রে চরণে বসে ঘোড়া ॥

বালকরামের প্রশ্ন—

কোন গুরু আমায় লালে আর পালে
কোন গুরু আমায় আছাড়িয়া মারে।
কোন গুরু আমায় তুলিয়া খাওয়ায় ভাত
কোন গুরু আমায় লয়ে বেড়ায় সাথ ॥

গুরুর উত্তর—

মাও যে পরম গুরু লালে আর পালে
বাপ যে পরম গুরু আছাড়িয়া মারে।
বহিন যে পরম গুরু ভুলে খাওয়ায় ভাত
ভাই যে পরম গুরু লয়ে বেড়ায় সাথ।
পিতা গুরু মাতা গুরু গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই
তাহা হইতে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই।
মায়ের গায়ের বস্ত্রখানা মা তোমার গায়ে দিয়া
চারি প্রহর রাত্রি জাগে তোমায় কোলে নিয়া॥

ধর্ম-ঠাকুরের গাজনেও এইরূপ ছড়া কাটাকাটি হইত। যেমন,
ধামাতকরণীর প্রশ্ন—

বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন্ দেব ভজ
কোন্ মূর্তি ধ্যান কর কোন্ দেব পূজ।
কোন্ মুখে পূজা কর কোন্ বেদ পড়
শীঘ্রগতি কহিলাম চাতুরালি ছাড়॥

পাটভক্তিয়ার উত্তর—

বাড়ি মোর বল্লুকায় নৈরাকার ভজি
শূন্যমূর্তি ধ্যান করি সাকার-মূর্তি পূজি।
পূর্বমুখে পূজা করি পঞ্চম বেদ পড়ি
শীঘ্রগতি কহিলাম চাতুরালি ছাড়ি॥

মহাভারত বনপর্বে যে বক-যুধিষ্ঠির সংবাদ আছে তাহার মূলেও এই অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা ও বুদ্ধি পরীক্ষা। আরও পিছাইয়া গেলে জনক বিদেহের সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ঋষিদের "ব্রহ্মোত্ত" জয়ে পৌছাইব।

"বৌদ্ধ" নামে অধুনা প্রসিদ্ধ চর্যাগীতিগুলির মধ্যে যে নাথ-পন্থীদের রচনাও আছে তাহা দেখাইয়াছি। ইহার কথা বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে নাথ-পন্থী রচনা হইতেছে মীনচৈতন্য ও ময়নামতী-গোপীচন্দ্র গাথা। প্রথম গাথাটি উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে গোর্খবিজয় নামে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে এই কাহিনী ধর্ম-ঠাকুরের পুরাণ-কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। দ্বিজ লক্ষ্মণের ও সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে মীন-গোর্খ কাহিনী মুখ্য স্থান

লইয়াছে। কদলী হইতে প্রত্যাগমনের পর মীননাথ কর্তৃক মহানাদে যোগী-রাজ্য স্থাপন প্রথম অনিলপুরাণেই উল্লিখিত হইয়াছে। অনিলপুরাণে ও গোর্খ-বিজয়ে বর্ণিত কাহিনীর মূলস্থানীয় ছড়াগুলি পূর্বাপর প্রচলিত এবং একই। পরিবর্তন যাহা কিছু হইয়াছে তাহা প্রধানত গায়কের মুখে ও লিপিকরের হাতে।

ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র আখ্যায়িকা মীন-গোর্খ ছড়ার মত একান্তভাবে যোগী সাধক-গোষ্ঠীর খাস সম্পত্তি ছিল না। ইহার করুণরসের আবেদন জনগণের চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল। তাই এই কাহিনী গানে, পাঁচালী কাব্যে ও নাটগীতে রূপ পাইয়া আর্য ভাষা ভারতের সর্বত্রগামী হইতে পারিয়াছিল।[২২] পশ্চিমবঙ্গে এই কাহিনীর সমাদর কমিয়া আসে বৈষ্ণবতার প্রসারের জন্য, বিশেষ করিয়া চৈতন্য-সন্ন্যাস কাহিনীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায়। উত্তরবঙ্গে সাধু ও গৃহস্থ যোগীর সংখ্যা বরাবরই খুব বেশি ছিল। তাই এই অঞ্চলে মীন-গোর্খ গীতি ও ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র গাথা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত জনগণমন তোরণ করিয়া আসিয়াছে। প্রস্তুত গ্রন্থের পরিশিষ্ট দুইটিতে গোর্খ-বিজয় কাহিনীর আধুনিকতর রূপান্তরের পরিচয় মিলিবে।

নাথ-পন্থের সিদ্ধপ্রধান দুইজন, মীননাথ ও গোর্খনাথ, বৈষ্ণবভক্ত-মালায় গাঁথা পড়িয়াছেন।[২৩] তাঁহাদের-কাহিনীও সেইমত রূপান্তরিত হইয়াছে। গুরু-শিষ্য পর্যটনে বাহির হইয়া পৌঁছিয়াছেন এক বিষ্ণু-ভক্তিহীন রাজার দেশে। গোর্খনাথ সে দেশে কালবিলম্ব করিতে চাহেন না, কিন্তু মীননাথের ইচ্ছা রাজাকে ভক্তিপথে টানিয়া আনিবার জন্য কিছুকাল থাকা। গুরুর ইচ্ছাই জয়ী হইল। মীননাথ রাজার সঙ্গে প্রীতি করিয়া পাশা খেলিতে লাগিলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিল। গুরুকে ভোগসুখে রত দেখিয়া শিষ্য দুঃখিত-চিত্তে চলিয়া গেলেন। রাজার মৃত্যু হইলে মীননাথ সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। অবশেষে গোর্খনাথ গুরুর উদ্ধারে আসিলেন সে দেশে, কিন্তু রাজার দর্শন পাইলেন না।

দ্বারিগণ ভিতরে যাইতে নাহি দেয়
যাইতে না পায়্যা কিছু সৃজিল উপায়।

২২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ৭৭৫ দ্রষ্টব্য।

২৩ কৃষ্ণদাসের ভক্তমাল দ্রষ্টব্য।

দরজা সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া
চেত মচ্ছন্দ গোর্খা আয়া ইহাই বলিয়া।
নাচিতে লাগিলা হোথা মীননাথ শুনি
পরে সমুঝিলা যে গোরখনাথ-বাণী।
ডাকিয়া লইয়া গোর্খনাথ প্রণমিলা
সেবাতে আপন নিজ মন্দিরে রাখিলা।
গোর্খনাথ ব্যাকুল গুরুর চেষ্টা দেখি
সদাই চিত্তেতে এক ক্ষণ নহে সুখী।
গুরুরে তো নাহি পারে জ্ঞান শিখাইতে
জিজ্ঞাসার ছলে কিছু লাগিলা কহিতে।
পূর্বে যে সকল তত্ত্ব শিখাইলে মোরে
হয় কি না হয় কহি তোমার গোচরে।
যদ্যপি না হয় শিখাও ভালমতে
এত বলি সব তত্ত্ব লাগিলা কহিতে।

তত্ত্বকথা শুনিয়া মীননাথের জ্ঞান হইল। তিনি খেদ করিতে লাগিলেন,

আরে গোর্খ কি করিনু কি বিষ খাইনু
আপনার মুণ্ডেতে অনল জ্বলি দিনু।
ধিক্ ধিক্ মোরে এবে কি করিব কেহ
গোর্খনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ।

মীননাথ তখন রাজ্যপাট ছাড়িয়া চলিলেন, তবে মূল্যবান অলঙ্কারগুলি পথসম্বল করিয়া পুঁটলি বাঁধিয়া লইতে ভুলিলেন না। কিছু দূর গিয়া গোর্খনাথ গুরুর মোট মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং পথে এক নদী পাইয়া তাহাতে ফেলিয়া দিলেন। গুরু হায় হায় করিতে লাগিলেন। শিষ্য বলিলেন, তুচ্ছ বস্তুর জন্য কাতর হন কেন। এই বলিয়া তিনি রত্ন অলঙ্কারের অসারত্ব প্রদর্শন করিলেন। তখন মীননাথের সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল। গুরুশিষ্য মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রামকথার তন্ত্র

এক

রামকথার মূল সাহিত্যিক রচনা হল 'রামায়ণ'। সংস্কৃতে লেখা। আকারে মোটামুটি মহাভারতের সিকি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, সমগ্র সাতকাণ্ড রামায়ণ মহাকাব্যটি এক সময়ের সুতরাং এক লেখকের লেখা নয়। আমাদের দেশের ঐতিহ্যে রামায়ণের রচয়িতার নাম বাল্মীকি। রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ড—বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিষ্কিন্ধ্যা ও যুদ্ধ (বা লঙ্কা)—আসলে একটি ব্যক্তির লেখা হতে পারে। এই ছয় কাণ্ডে রাম-কথা সম্পূর্ণতা পেয়েছে। সপ্তম (উত্তর) কাণ্ড যে পরবর্তী রচনা তা নামেই বোঝা যায়। এটি একটি স্বতন্ত্র কাহিনী, যার নায়ক রাম নন, তাঁর পুত্রদ্বয় ও তাঁদের পালক পিতা বাল্মীকি।

বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়াও রাম-কথা মিলেছে সংস্কৃতে, পালিতে, প্রাকৃতে বিবিধ ভারতীয় দেশী ভাষায়, অভারতীয় মিলেছে—ইরাণী ভাষায়, তিব্বতী ভাষায়, শ্যাম-কম্বোজ-দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন ভাষায়। এই সব রাম-কথার সর্বত্র রামায়ণের অনুসরণ নেই। অনেকগুলির মূল সূত্র এসেছিল অন্য ঐতিহ্য থেকে। এবং এসবের কোন কোনটিতে রামায়ণের প্রভাব কমবেশী পাওয়া যায়। এই সব রাম-কথার আলোচনা 'রাম-কথার প্রাক্-ইতিহাস' পুস্তিকাটিতে পাওয়া যাবে। উপস্থিত প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, রাম-কথা কোন একটি কবির মানসকল্পনাজাত অথবা কোন দেশের ঐতিহ্যসম্ভূত আখ্যানাবলী নয়। কোন অবতারের পুরাণপ্রসিদ্ধ জীবনচরিতও নয়। এ আখ্যানাবলীর মূল বীজ ছিল অনেকগুলি উড়ো লৌকিক গল্প, যে বীজ যথেষ্ট মিলেছে স্বদেশে ও বিদেশে। এই উড়ো বীজ থেকে কেমন করে যে বিভিন্ন রাম-কথাগুলি অঙ্কুরিত ও প্রবর্ধিত হয়েছিল তাই আলোচনা করে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। এই উড়ো বীজ থেকে একটি বনস্পতি উদ্‌গত হয়েছিল—রামায়ণ মহাকাব্য। কিন্তু বিভিন্ন রাম-কথাগুলি সবই রামায়ণ-মহাকাব্যের বীজ-জাত নয়, আওতায় জাত, কোন কোনটি কলম-জাত।

দুই

সাতকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে তিনটি 'কথা' আছে। প্রথম কথা রামের নির্বাসন ও বনবাস। দ্বিতীয় কথা বনবাসী রামের পত্নী হরণ ও পত্নী-উদ্ধার। তৃতীয় কথা পত্নীহারা রামের পুত্রপ্রাপ্তি। এই তিনটি কথা একদা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। আগে প্রথম কথা দুটির মধ্যে যোগসূত্র কল্পনা করে আসল অর্থাৎ ছয়-কাণ্ড রামায়ণ রচিত হয়। তার অনেক কাল পরে তৃতীয় কথাটি মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে যায়। পূর্বগামী পণ্ডিতদের এই যে ধারণা এর কিছু নূতন প্রমাণ আছে।

প্রধান এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল প্রথম ও দ্বিতীয় কথা দুটি প্রাচীন সাহিত্যে মিলেছে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাম-আখ্যানরূপে। অন্যত্র ('রাম-কথার প্রাক্ ইতিহাস' পুস্তিকায়) দেখিয়েছি যে প্রথম কথাটি সম্পূর্ণ রাম-কথারূপে মিলেছে বৌদ্ধ সাহিত্যে পালিতে (জাতক ৪৬১), মহাভারতে দুবার, (দ্রোণ পর্ব ৫৭ অধ্যায়, শান্তি পর্ব ২৯ অধ্যায়) এবং হরিবংশে (১.৪১)। এ আখ্যানে রাম সত্যসন্ধ মহাপুরুষ, পণ্ডিত বিচক্ষণ দানশীল সুশাসক রাজা। তিনি পিতার প্রদত্ত বনবাসদণ্ড স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং দণ্ডকাল শেষ হবার পরে দেশে ফিরে গিয়ে রাজা হয়েছিলেন। এই কথায় তিনটি স্তর পাওয়া যায়। এক্টি স্তরে সীতার ও ভাইদের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় স্তরে সীতা ভগিনী। তৃতীয় স্তরে সীতা পত্নী। শেষ দুই স্তরেই ভাইদের উল্লেখ পাই।

এই কথার গল্পটির একটি স্বতন্ত্র প্রাচীনতর (?) রূপও ছিল। সে গল্পে বনবাস-প্রত্যাগমন ছিল না, ছিল বিসর্জন ও পুনরাগমন। সে কাহিনী উড়ো বীজেই রয়ে গেছে, অঙ্কুরিত হতে পারে নি। উড়ো বীজের প্রসঙ্গে তা বলব

তিন

দ্বিতীয় কথায় (অর্থাৎ স্বাধীন কাহিনীটিতে) রাম (অথবা অনামা তরুণ রাজা) রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে (অথবা মৃগয়া উপলক্ষ্যে) অরণ্যবাসে ছিলেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী ছিল (অথবা অরণ্যবাস কালে পত্নী সংগ্রহ করেছিলেন)।

এই পত্নীকে হরণ করে এক মায়াবী তপস্বী (অথবা তপস্বী বেশ ধরে মায়াবী রাক্ষস)। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বানরদলের সঙ্গে মিত্রতা করে তাদের সাহায্যে রাম পত্নীকে উদ্ধার করেন। তারপর পত্নীসহ (অথবা পত্নীছাড়া) দেশে ফিরে গিয়ে রাজপাটে বসেন। এ আখ্যানটি মিলেছে (একটি বৌদ্ধ জাতকে, চীনা অনুবাদে), (২৫১ খ্রীষ্টাব্দে করা), মহাভারতে বনপর্বে . অধ্যায় ২৭৪ শ্লোক ১-৩) আর খোটানি ভাষায় রামচরিত বর্ণনায় (গদ্যে, আনুমানিক নবম শতাব্দী)। মহাভারতের কাহিনীটি খুব সংক্ষেপে অন্যত্র বলা হয়নি বলে এখানে উদ্ধৃত করছি। জয়দ্রথের হাতে দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও উদ্ধারের পর যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মার্কণ্ডেয় এই গল্পটি বলেছিলেন :

প্রাপ্তম্ অপ্রতিমং দুঃখং রামেণ ভরতর্ষভ।
রক্ষসা জানকী তস্য হৃতা ভার্যা বলীয়সা ॥১॥
আশ্রমাদ্ রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
মায়াম্ আস্থায় তরসা হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্ ॥২॥
প্রত্যাজহার তাং রামঃ সুগ্রীববলম্ আশ্রিতঃ।
বদ্ধ সেতুং সমুদ্রস্য দগ্ধা লঙ্কাং শিতৈঃ শরৈঃ ॥৩॥

অর্থাৎ, 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুলনাহীন দুঃখ পেয়েছিলেন রাম।
অধিকতর বলবান্ রাক্ষস কর্তৃক তাঁর ভার্যা জানকী অপহৃত হয়েছিল ॥১॥
(জানকী অপহৃত হয়েছিলেন) তাঁদের আশ্রম থেকে রাক্ষসদের রাজা
দুরাত্মা রাবণ কর্তৃক, প্রবল মায়া দেখিয়ে, শকুনি জটায়ুকে নিহত ক'রে ॥২॥
সুগ্রীবের সৈন্য সাহায্যে সমুদ্রে পুল বেঁধে তীক্ষ্ণ শর দিয়ে
লঙ্কাকে পুড়িয়ে তাকে উদ্ধার করেছিলেন রাম' ॥৩॥

(তিনটি মাত্র শ্লোকে গল্পটি শোনবার পর যুধিষ্ঠির রাম-কথা বিস্তৃত ভাবে শুনতে চাইলে মার্কণ্ডেয় তা বর্ণনা করলেন উনিশ অধ্যায়ে। এই উনিশটি অধ্যায়ের (২৭৪-২৯২) প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোক আগে উদ্ধৃত করেছি। এই তিনটি শ্লোক মাত্র আদি মহাভারতে ছিল। বিস্তৃত বর্ণনাতে দুটি কাহিনী জুড়ে গেছে। এ পরবর্তী কালের প্রসাধন। তবুও রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে সবটা মেলে না। এ প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করব।)

তৃতীয় শতাব্দীর চীনা অনুবাদে যে জাতক গল্পটি মিলেছে তাতে পাত্রপাত্রীর নাম নেই। তবুও যে এটি রাম-কথা তা কাহিনী অনুসারে

স্বীকার করতে হয় এবং নায়ক যে মহাপুরুষ রাম তা তাঁর বোধিসত্ত্ব বলে উল্লেখ থেকেও বোঝা যায়। গল্পটি কিছু খণ্ডিত। উপক্রম অন্য রকম। মাতুল এসে রাজ্য কেড়ে নেওয়ায় নায়ক সপত্নীক অরণ্য আশ্রয় করেছিলেন। মাতুলের আক্রমণ কেকয়ীর বিরূপতারই এক বিকল্প বলে মনে হয়। হয়ত এখানে প্রথম কথার সঙ্গে কিছু যোগাযোগ ছিল। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তুর সঙ্গে তার যোগসূত্র খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়। প্রতিনায়ক এখানে সমুদ্রবাসী নাগ—রাবণের আসল রূপ। সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে তবে পত্নীর মিলন হয় পতির সঙ্গে।

খোটানী রাম-কথার[১] উপক্রম একেবারে অন্যরকম। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ জমদগ্নির গোরু চুরি করেছিলেন এই অপরাধে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম দশরথের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিহত করেন। দশরথের দুটি শিশু পুত্র ছিল। তাদের বাঁচাবার জন্য রাজমহিষী তাদের ভূগর্ভে অজ্ঞাতবাস করান বারো বছর ধরে। তারপর রাম লক্ষ্মণ সমর্থ হয়ে পরশুরামের সন্ধানে বার হন। এক পাহাড়ে তার দেখা পেয়ে রাম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করেন এবং দেশে সর্বেসর্বা হন।

দুই ভাই একদা বনে বেড়াতে যান। সেখানে এক ঋষির পালিত কন্যাকে দেখেন। এ কন্যা ছিল ব্রাহ্মণদের রাজা দশগ্রীবের (অর্থাৎ রাবণের) অলক্ষণা সুতরাং পরিত্যক্ত কন্যা। এই কন্যাকে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ বনের অন্যত্র গিয়ে বাস করতে থাকেন। দশগ্রীব একদিন আকাশে উড়ে যেতে যেতে মেয়েটিকে দেখে এবং নিজের মেয়ে না জেনে তার রূপে মুগ্ধ হয়। সে নেমে আসে। সীতার প্রহরী ছিল এক শকুনি। সীতা নিজে ছিল মন্ত্রের বেড়ার মধ্যে। দশগ্রীব শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। তার পর ভিখারী ব্রাহ্মণ সেজে ভিক্ষা গ্রহণ করার ছলে সীতাকে ধরে নিয়ে লঙ্কাদ্বীপে চলে যায়। দুভাই সীতার খোঁজ করতে থাকে বারো বছর ধরে। শেষে তারা দেখা পায়, বানররাজ দুভাই নণ্ড ও সুগ্রীবের সঙ্গে। দুজনে একই রকম দেখতে এবং দুজন যুদ্ধ করছে। রাম নণ্ডর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সুগ্রীবকে গোপনে—তারা যখন যুদ্ধ করছে সেই

১। স্যার হ্যারল্ড্ বেইলি (Sir Harold W. Bailey কর্তৃক আবিষ্কৃত, প্রকাশিত এবং অনূদিত)।

অবস্থায়—হত্যা করেন। তারপর নও রামকে সাহায্য করে সীতার অন্বেষণ ব্যাপারে। এক পাখীর মুখ থেকে জানা গেল যে, সীতা আছেন লঙ্কার দ্বীপে। তখন বানররা সমুদ্রে পুল বাঁধলে। বানরসৈনা নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ লঙ্কায় গেলেন। দশগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। দশগ্রীব বিষাক্ত বাণ মেরে রামকে মৃতকল্প করে দিল। চিকিৎসক জীবক রামকে বাঁচিয়ে তুললে 'মৃত-সঞ্জীব' ঔষধ দিয়ে। এ ঔষধ নও এনে দিলে হিমালয় থেকে। গাছটি সে চিনতে পারেনি বলে গোটা পাহাড়টাই তুলে এনেছিল। তারপর আবার যুদ্ধ চলল। জ্যোতিষীরা রামকে বলে দিলে দশগ্রীবের মর্মস্থান পায়ের বুড়ো আঙুলে আঘাত না করলে তাকে ঘায়েল করা যাবে না। তখন রাম দশগ্রীবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে তাকে তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দেখালে চ্যালেঞ্জ করলেন। দশগ্রীব তা দেখাতেই রাম সে আঙুল তীরবিদ্ধ করলেন। দশগ্রীব হার মানলে। রামের আনুগত্য স্বীকার করায় রাম তাকে প্রাণে মারলেন না।

সীতার সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কায় এক বছর যাপন করলেন। তারপর সীতাকে নিয়ে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে, লক্ষ্মণ চাইলেন টাকাকড়ি দিয়ে প্রজাদের মুখ বন্ধ করতে। সীতা তা চাইলেন না। তিনি পাতালে প্রবেশ করলেন। তারপর রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রের নাগদের তাড়িয়ে দিলেন ওষুধ ও সর্ষে পুড়িয়ে।

এই খোটানি গল্পটিতে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। প্রথমত পরশুরাম ও দশরথের সংঘর্ষ। এটির ক্ষীণ আভাস পড়েছে প্রচলিত রাম-কথায়ও। সীতাকে বিয়ে করে আসবার সময় পরশুরামের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ—খোটানি গল্পে উল্লিখিত বিরোধেরই কিঞ্চিৎ তলানি মাত্র। আসলে কি পরশুরামই সীতার পালক পিতা, বাল্মীকির প্রথম সংস্করণ?

দ্বিতীয়ত, খোটানি গল্পে রাম ও লক্ষ্মণ দুজনেই সীতার প্রণয়প্রার্থী। মনে হয় এই মোচড়টুকু পালি জাতকে উল্লিখিত ভাই-বোন সম্বন্ধেরই জের। জনকের সভা, ধনুর্ভঙ্গ ইত্যাদির কোনই উল্লেখ নেই। তবে সীতা দশগ্রীবের কন্যা। রাবণ দশগ্রীব নামেই আগাগোড়া উল্লিখিত। এই নাম যেন দশরথ নামের জোড়া। রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে পেয়েছিলেন বনে, তপস্বীর আশ্রমে। এ গল্পে হনুমান নেই। হনুমান এক হয়ে গেছে রামায়ণ-কাহিনীর সুগ্রীবের সঙ্গে। আর সে কাহিনীর বালী হয়েছে সুগ্রীব এবং সে কাহিনীর সুগ্রীবের নাম

হয়েছে নও। দশগ্রীব মরে নি, মুনি হয়েছিল। সীতাকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল লঙ্কাতেই। সীতা-পুত্রের কোনই উল্লেখ নেই।

উপক্রম অংশ বাদে, পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় কাহিনীটি মিলেছে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের মারানাও ভাষায় লেখা (দ্বাদশ-চতুর্দশ শতাব্দী) 'মহারাদিয়া লাওয়ানা' (অর্থাৎ—মহারাজ রাবণ) কাব্যে। গল্পটিতে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে।

কোন এক দেশের রাজার ছেলে ছিল রাবণ। তার দশটা মাথা, তবে হাত দুটি মাত্র। সে ছিল দুর্বিনীত ও অত্যাচারী। সেই জন্য পিতা তাকে লঙ্কা নগরে ('পুলু নগর') নির্বাসন দেন। সেখানে রাবণ তপস্যা করে ক্ষমতাপন্ন হয়, আর ফিরে এসে পিতৃরাজ্য অধিকার করে। অপর এক রাজ্যে রাজার দু'ছেলে ছিল। তাদের নাম রাজা মঙ্গন্দিরি ও রাজা মঙ্গবর্ণ। তাদের বয়স হয়েছিল কিন্তু বিয়ে হয়নি। সন্ধান পেয়ে দুভাই বিবাহের উদ্দেশ্যে এক দূর দেশে যাত্রা করে জলপথে। এ দেশের নাম 'পুলু নাবান্দাই', রাজকন্যার নাম তিহাইয়া। সেখানে পৌঁছতে রাজপুত্রদের দশ বছর লেগে গেল। সেখানে গিয়ে রাজা মঙ্গন্দিরি বিবাহার্থীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। দু ভাই সে দেশে কিছু কাল কাটিয়ে শেষে দেশের দিকে রওনা হলেন। এবারে ধরলেন তাঁরা স্থলপথ। সঙ্গে অনেক লোকজন। দীর্ঘ পথ ফুরোবার অনেক আগেই তাঁদের খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল। অগত্যা তাঁদের এক স্থানে উপনিবেশ করে চাষ-আবাদের দ্বারা শস্য সঞ্চয় করবার জন্য রয়ে যেতে হল। এখানে থাকতে থাকতে একদিন রাজকন্যা তিহাইয়া দেখলেন যে এক সোনার-শিঙ হরিণ ক্ষেতে ঢুকে ফসল খাচ্ছে। দেখে তাঁর লোভ হয় হরিণটাকে পোষবার জন্য। পত্নীর নির্বন্ধে মঙ্গন্দিরি ছুটলেন সে হরিণ ধরতে। কায়দা করতে না পেরে তিনি ভাইকে ডাক দিলেন তাঁর সাহায্যে আসতে। ভাই এলেন। তখন একটি হরিণ দুটি হয়ে দুদিকে ছুটে পালাল। ফলে দুভাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। মঙ্গন্দিরি যার পেছনে ছুটেছিলেন সে তাঁকে বাড়ির কাছে এনে দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। তিনি ঘরে ফিরে এসে দেখেন যে পত্নী নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, এ কাজ লাওয়ানার। (সম্ভবতঃ রাবণ তিহাইয়ার পাণিপ্রার্থী ছিল)।

মঙ্গন্দিরি তখন ভাইয়ের খোঁজে চললেন। পড়ে গেলেন তিনি

এক নদীতে, হয়ে গেলেন অচৈতন্য। সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন যেন এক বুনো মোষ তাঁকে তাড়া করেছে, তাতে তাঁর অণ্ডকোষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বদিকে ছিট্‌কে পড়েছে—পড়েছে একেবারে সে দেশের রানী লাঙ্গাবীর মুখের মধ্যে আর রানীও তা গিলে ফেলেছে। তার ফলে লাঙ্গাবী এক ছোট বানরশিশুর জন্ম দিলে। তার নাম রাখা হল লক্ষ্মণ। মঙ্গন্‌দিরি এই পর্যন্ত স্বপ্ন দেখেছেন এমন সময় মঙ্গবর্ণ এসে তাঁকে জল থেকে তুলে সুস্থ করলেন।

তিহাইয়ার খোঁজে দুভাই বেরোবেন বেরোবেন করছেন এমন সময় স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করে বানরশিশু লক্ষ্মণ তাঁদের কাছে এসে হাজির হল। লক্ষ্মণের সহায়তায় দুভাই জলের কুমীর বনের মোষ আর গাছের বানর জুটিয়ে নিয়ে এক বিরাট বাহিনী গঠন করলেন। তারপর মঙ্গন্‌দিরির হাতের তেলো থেকে লাফ মেরে লক্ষ্মণ সাগর উত্তীর্ণ হয়ে তিহাইয়ার সন্ধান এনে দিলে। লক্ষ্মণ লক্ষ্য করেছিল যে, যখনই লাওয়ানা তিহাইয়াকে ছুঁতে যায় তখনই দুজনের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে বাধার সৃষ্টি করে।

তার পর দু দলে যুদ্ধ বাধল। লাওয়ানার সৈন্য পরাস্ত হল। তখন সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামল। এক বিশেষ পাথরে শাণ দেওয়া তলোয়ারে—এ ব্যাপার লাওয়ানার মৃত্যুর তুক—লাওয়ানা পতিত হল। পরাজিত হয়ে লাওয়ানার মতিগতি বদলে গেল। সে ভালোভাবে নিজের রাজ্য শাসন করতে লাগল। ভাই, লক্ষ্মণ ও পত্নীকে নিয়ে মঙ্গন্‌দিরি তাঁর দলবল নিয়ে দেশে ফিরে এলেন কুমীরের পিঠে চেপে। দেশে ফিরে লক্ষ্মণের রূপ বদল ঘটল, সে সুরূপ রাজকুমারে ('দাতু') পরিবর্তিত হল। সকলে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

ফিলিপিন কাহিনীর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এ কাহিনীর কোন উপক্রম নেই, সম্পূর্ণ স্বয়ম্বর। দ্বিতীয়ত, এতে পত্নী সংগ্রহ ঘরে থেকে নয়, বিদেশে গিয়ে। তৃতীয়ত, অপহরণে মৃগের সহায়তা। চতুর্থত, হনুমানের সঙ্গে রাম-সীতার সম্পর্কের এক অভিনব ব্যাখ্যা। (এ-ব্যাপারে দ্বীপময় ভারতের অন্ত রাম-কথা কতক মেলে, তবে এতটা সূক্ষ্মভাবে নয়।) পঞ্চমত, জল-স্থল-আকাশচারী ত্রিশক্তি সমাবেশে উদ্ধার-বাহিনী গঠন। ষষ্ঠত, লক্ষ্মণকে হনুমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে দুই ভাইয়ের সঙ্গে রাজকুমারীর সম্পর্ক একটু যেন অস্পষ্ট রাখার চেষ্টা।

চার

তৃতীয় কথাটি হল, এক রাজার পত্নী পরিত্যাগের গল্প। অপবাদে দূষিত নির্দোষ পত্নীকে বনবাস দেওয়া হল। সেখানে সে এক মুনির আশ্রমে থেকে সন্তান প্রসব করে। বনবাস দেবার সময়ে রাজা জানতেন না যে পত্নী সন্তবা। মুনি ছেলেকে (বা যমজ ছেলেকে) মানুষ করে তাদের গান শেখান। সেই গান শুনে রাজা খুশি হয়ে তাদের পরিচয় জানতে চান। পরিচয় পেয়ে তাদের পুত্র বলে গ্রহণ করেন। পতির সঙ্গে মিলনের আগেই পত্নীর দেহত্যাগ হয়।

এই কাহিনীটি উত্তরকাণ্ড রামায়ণের বিষয়। মূল রামায়ণে ছিল না। মহাভারত বনপর্বে যে বিবৃত রামোপাখ্যান আছে তাতেও নেই। ভট্টিকাব্যেও নেই।

পাঁচ

এইবার 'কথা' তিনটির দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়া উড়ো বীজের আলোচনা করি।

প্রথম কথার উড়োবীজ যে সব মিলেছে তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল পুরোনো আইরিশ মিথের একটি গল্প,—'লিরের পুত্রকন্যা' (Oidheadh Cloinne Lir)। দেশের প্রাচীনতম অধিবাসীদের রাজা নিবাচিত হয়েছিলেন বোব। নির্বাচনে খুশি না হয়ে লির রাগ করে দূরে গিয়ে বাস করতে থাকেন। বোব বেশ ভালো রাজা ছিলেন। তাঁর তিনটি পালিত কন্যা ছিল। তিনি লিরকে নিমন্ত্রণ করে এনে বড়োমেয়ে ইভকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। দুজনে সদ্‌ভাবে সংসার করতে লাগলেন নিজের ঘরে। তাঁদের জন্মাল দুদফা যমজ সন্তান। প্রথমে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। এদের নাম হল ফিনোলা ও আত্রদ। তার পরে জন্মাল দুটি ছেলে। তাদের নাম হল ফিআক্রা ও কন্‌ন্। কিছুদিন পরে লিরের পত্নীবিয়োগ হল। তখন শ্বশুর বোব তাঁর দ্বিতীয় কন্যা ইভাকে লিরের দ্বিতীয় পত্নী করেছিলেন। ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে লির আপত্তি করেন নি। কিছুদিন পরে ইভা লক্ষ্য করলে যে লির ছেলেমেয়েদের একটু বেশি মাত্রায় ভালোবাসেন। এই ভাবনায় বশে তাঁর মনে ঈর্ষা জন্মাল। সে ঈর্ষা শীঘ্রই হিংসায়

পরিণত হল। সে ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় রইল। এক বছর সে পীড়ার ভাণ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বোন-সতীনের সন্তানদের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে লাগল। একদিন সকালে ইডা ছেলেমেয়েদের নিয়ে রথে চড়ে বাপের বাড়ি যাবার উদ্যোগ করলে। ফিনোলা প্রথমে যেতে চায় নি, শেষে বাধ্য হয়েছিল। রথ টানা দক্ষিণ মুখে চলল। কিছুদূর এসে ইডা সঙ্গের লোকজনকে বলেছিল ছেলেমেয়েদের কেটে ফেলতে। তারা রাজি হয়নি। আবার রথ চলল, এসে পৌঁছল এক হ্রদের ধারে। সকলে রথ থেকে নামল। ইডা ছেলেমেয়েদের বললে, কাপড় চোপড় খুলে হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করতে। যেই তারা জলে নামল অমনি ইডা জাদু-দণ্ড ছুঁইয়ে একে একে তাদের সাদা রাজহাঁস করে দিলে। তারপর সে মন্ত্র পড়ে তাদের শাপ দিলে। সে শাপের ফলে তারা প্রায় অনন্ত কাল ধরে রাজহাঁস হয়ে থাকবে তবে মানুষের মত কথা কইতে পারবে।

ব্যাপার শুনে লির হায় হায় করতে থাকেন কিন্তু শাপ্ কাটাবার কোন উপায় খুঁজে পাননি। তিনি মাঝে মাঝে হ্রদের ধারে এসে হাঁসদের গান শুনতেন।

শাপ দেওয়া পর্যন্ত সৎমার ব্যাপারটির মিল রাম-কথার সঙ্গে স্পষ্ট। পালি জাতক গল্পের সঙ্গে মিল সীতা ও লক্ষ্মণের জলে নামায়। হাঁসেদের গানে মিল টেনেছে উত্তরকাণ্ডের সঙ্গে। পালি জাতকের সঙ্গে আরও মিল ভাই-বোন ব্যাপারে।

এ কাহিনী পালি জাতকের তুলনায় আরো পুরোনো বলে মনে হয়। এতে নির্বাসিতদের পুনরাবর্তন নেই।

দ্বিতীয় কথার একটি বিশিষ্ট রূপান্তর পেয়েছি যবদ্বীপীয় এক লৌকিক গল্পে। এতে পুনরাবর্তন নেই, তবে হাঁস হওয়াও নেই। গল্পটি Dr. Juan H. Francisco-র প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

একদা এক বুড়ো রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল অনেক স্ত্রী, অনেক সন্তান। বড়ো ছেলে, রাম রাজা (Jamojaja) দেবতার মতো সুন্দর শক্তিশালী ও উদার। প্রজারা তাঁর খুব অনুগত ছিল। রামরাজাকে দারুণ হিংসে করত তাঁর সৎমা দেবী অন্দনা (Devi Andana)। সে চাইত তাঁর নিজের ছেলে যাতে তাঁর স্বামীর সিংহাসনে বসতে পারে। রূপসী সে ছলাকলা বিস্তার করে স্বামীর মন ভুলিয়ে রামরাজাকে নির্বাসিত করবার প্রতিজ্ঞা আদায় করে নিলে।

সেই দিনই সন্ধ্যে বেলায় রাজা বড়ো ছেলে ও সভাসদদের ডেকে বললেন, 'আমার বড়ো ছেলের কিছু শত্রু জুটেছে, তাকে মেরে ফেলতে চায়। আমি তাকে হুকুম করছি সে যেন আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। আমার মৃত্যুর পর সমীরণ (Samijan) রাজা হবে।' অগত্যা রামরাজা বনে চললেন। তাঁর পত্নী দেবী কুসুমো (Devi Kusumo) তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। যাবার আগে সৎমা গোপনে রামরাজাকে বিষ খাইয়ে দিলে। সে বিষের ফল দেরিতে ফলে।

অনেক দূর চলে যাবার পর তাঁরা পৌঁছলেন এক গভীর খাদের ধারে। সেখানে রামরাজা অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন এবং তারপর তাঁর মৃত্যু হল। পত্নী বিলাপ করতে লাগলেন। একটু পরে দেখলেন এক দেবতা—বিবাহের দেবতা কামবাজা। তিনি রামরাজাকে বাঁচিয়ে রাখলেন কিন্তু মানুষ আকারে নয়। রামরাজা পবিত্র গাছ হয়ে মাথা তুলে উঠলেন। পত্নী সে গাছ জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়ে গেলেন।

রামরাজা স্ত্রীকে নিয়ে বনে গেছে জানতে পেরে প্রজারা খুঁজতে বেরিয়েছিল কিন্তু কোন খোঁজ না পেয়ে তারা ফিরে গেল। সমীরণও তাদের সঙ্গে গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করে। সে কিন্তু ফিরল না। দেবতারা তাকে পাখী করে দিলেন। সে পাখী হয়ে ডেকে বেড়াতে লাগল "কাকাগালোত" "কাকাগালোত" (মানে, 'ভাইকে খুঁজছি, 'ভাইকে খুঁজছি')। সেই ডাক পাখী এখনও ডাকে। সে গাছ এখনো লোপ পায় নি। সে ঝরণা এখনো বইছে।[১]

এই গল্পের পরিণতি লক্ষ্য করার মত। যেন রাম সীতা ভরত যথাক্রমে গাছ, জল ও পাখী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রচলিত রাম-কথায় এই তিন শক্তির প্রকাশ দেখি বানরে, সমুদ্রে ও জটায়ুতে।

একটি উদ্ভাবীজ পাওয়া গেছে বাংলা গল্পে। তবে সোজাসুজি নয়, সাঁওতালদের মারফৎ।[২] এক রাজার ছিল দুটি রানী আর এক উপরানী। বড়ো রানীর দুটি ছেলে, সীত ও লক্ষণ, ওদের রেখে তিনি মারা যান।

১। Indonesian Fairly Tales, Adele de Leeuw (1967), পৃষ্ঠা, ৭২-৭৮।

২। Folklore of Santal Paraganas, C. H. Bompas (1909), পৃষ্ঠা ২৩৭-২৪০।

সৎমা ছেলে দুটিকে দেখতে পারত না, কিন্তু উপরানী তাদের খুব যত্ন করত। ছোট রানী রাজাকে পরামর্শ দেয় ছেলে দুটোকে দূর করে দিতে। কিন্তু রাজার মত হয় না। শেষে রানী কঠিন রোগের ভাণ করে বিছানা নিলে। রাজা তাকে খুব ভালোবাসত, তাই অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। তার পর রানীর পরামর্শ মতো চিকিৎসক রাজাকে জানালে যে রানীকে বাঁচিয়ে রাখবার একমাত্র ওষুধ হল ছেলে দুটির মেটে অর্থাৎ যকৃৎ। বুদ্ধিভ্রষ্ট রাজা তাই হুকুম দিলে ছেলে দুটিকে বনে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলে তাদের মেটে এনে দিতে। সেপাইরা সীত-লক্ষ্মণকে বনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে দুটো কুকুর কেটে তাদের মেটে এনে দিলে। সৎমা তা খেয়ে অসুখের ভাণ ছেড়ে দিলে।

সীত-লক্ষ্মণ বনে বনে ঘুরতে লাগল। এক সময় হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল, একটা গাছের গুঁড়ি বেয়ে সাপ উঠছে উপর ডালে পাখির বাসার দিকে লক্ষ্য করে। তারা সাপটাকে মেরে ফেললে। বাসায় পাখীর বাচ্চা ছিল, তারা বেঁচে গেল। বাচ্চাদের বাপ-মা এসে ব্যাপার শুনে খুশি হয়ে সীত লক্ষ্মণকে তাদের খাবারের কিছু কিছু খেতে দিলে আর তাদের আশীর্বাদ করলে,—সীত রাজা হবে, লক্ষ্মণের মুখ থেকে সোনা খসবে।

তারপর একদিন সীতকে একস্থানে রেখে লক্ষ্মণ দূরে গেছে শিকার অন্বেষণে, এমন সময় সেখানকার রাজার পাট-হাতি ঘুরতে ঘুরতে এসে সীতকে দেখে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে রাজবাড়িতে চলে গেল। সেদিন সে রাজ্যের রাজকন্যার স্বয়ংবরের আয়োজন হয়েছে। পাট-হাতি এনে দেওয়াতে সীতেরই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল আর সীত রাজ্যের রাজা হল। লক্ষ্মণ এসব কিছুই জানতে পারলে না। ধাতস্থ হয়ে সীত লক্ষ্মণের খোঁজ করতে লোক পাঠালে কিন্তু তার কোন খোঁজ তখন পাওয়া গেল না। যখন তার খোঁজ পাওয়া গেল তখন লক্ষ্মণ এক কুমোরের বাড়িতে কাজ করছে। লক্ষ্মণের মুখ দিয়ে সোনা ঝরে, তাই তাকে ছাড়তে কুমোর রাজি হয় না। শেষে অনেক টাকা-কড়ি দেওয়ায় সে লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিলে। সীত-লক্ষ্মণের মিলন হল।

এদিকে ওদের বাবার বয়স হয়েছে, রোগও হয়েছে। দু-ভাই সেদিকে কোন নজর দিল না। তারা তাদের ধাইমা উপরানীকে আনিয়ে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

লক্ষ্য করবার বিষয়—সুখের সমাপ্তি হলেও এ গল্পে প্রত্যাবর্তন নেই।

রামের পরিবর্তে সীত নাম দেখে সহসা মনে হতে পারে গল্পটিতে[1] নাম বদল হয়ে গেছে। সীতা-রাম ও রাম-লক্ষ্মণ এ দু-জোড়া নাম থেকে একটির প্রথম ও অপরটির শেষ নাম নেওয়া হয়েছে। এ অনুমান অসঙ্গত নয়। তবে তার চেয়েও সঙ্গততর অনুমান হলো যে, গল্পটিতে আসলে সীতা নামই ছিল এবং সে ছিল লক্ষ্মণের বোন। পাট-হাতির পিঠে চড়ে সীত শান্তভাবে সবকিছু মেনে নিয়েছিল। তাতে তার নারীত্বই বোঝায়। ভাইয়ের সঙ্গে মিলনের পর তারা যে বাপের কাছেই ফিরে যায়নি সে ব্যাপারও এই সম্পর্কে লক্ষণীয়। সীতাকে পাট-হাতি তুলে এনে রানী করে দিয়েছিল ব্যাপারটি সীতাহরণেরই মতো।

দুভাই সীত-লক্ষ্মণের গল্প খাস বাংলা দেশে আরও কিছু বিকৃতি লাভ করেছে পাত্র নামে। 'সীত' স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ অর্থে গৃহীত হয়েছে, প্রথমে 'শেত' ও পরে 'শীত' বলে, এবং সীত শীত হওয়ার পর তেমনি অনিবার্য কারণে 'লক্ষ্মণ হয়েছে বসন্ত'। অন্যথা গল্প প্রায় একই রয়ে গেছে। তবে কিছু ঘুরপাক খেয়ে।

গল্পটির একটি বাংলা রূপান্তর আছে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের বইয়ে। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) থেকে বাংলা গল্পটির সার উদ্ধৃত করি।

এক রাজার দুই রানী। বড়ো রানী দুয়ো। তার দুটি ছেলে,—সুস্থ, সুশ্রী, সবল। ছোট রানী সুয়ো। তার তিন ছেলে—রোগা, কুশ্রী, দুর্বল। ছোট রানী তুক করে বড়ো রানীকে পাখি করে দিলে আর ছেলে দুটিকে মেরে ফেলবার জন্য বনে পাঠিয়ে। জল্লাদ ছেলে দুটিকে বনে ছেড়ে দিয়ে এল। তাদের নাম শীত ও বসন্ত। তৃষ্ণায় কাতর শীতের জন্য বসন্ত জল আনতে গেছে, এমন সময় এক রাজ্যের পাট হাতি শীতকে তুলে নিয়ে সেই দেশের রাজধানীতে গিয়ে রাজার শূন্য সিংহাসনে তাকে বসিয়ে দিলে। বসন্ত ফিরে এসে আর শীতকে দেখতে পেল না। তার পর বসন্ত এক মুনির সেবকরূপে বনেই রয়ে গেল। শীত-বসন্তর মা পাখি হয়ে এক রাজকন্যার মাথায় ঠাঁই পেল। সেই রাজকন্যা অবিবাহিত।

১। গল্পটি সংগ্রহ করেছিলেন পাদরি বডিং (Bodding)

পাখির প্ররোচনায় রাজকন্যা জেদ ধরলে, যে তাকে গজমোতি এনে দেবে তাকেই সে বিয়ে করবে। এই কথা বসন্তর কানে গেল। সে মুনির কাছে তার ত্রিশূল চেয়ে নিয়ে সেই ত্রিশূলের সাহায্যে গজমোতি লাভ করলে। গজমোতি পেয়ে রাজকন্যা খুশি হয়ে যখন পাখির পরিচর্যা করছিল তখন তার মাথার মধ্যে সতীন যে বড়ি টিপে দিয়ে তুক করেছিল তা খসে পড়ে, আর দুয়োরাণী তাঁর স্মৃতি ফিরে পান। মা তাঁর দু ছেলে ফিরে পেলেন। বসন্তর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল।

এ গল্পে দুটি কাহিনীর জোড় আছে। উপক্রমে শীত-বসন্তর কাহিনী। বনে তাদের ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত। বাকি অংশ বলতে গেলে মূল গল্প, দুয়োরাণী, বসন্ত ও রাজকন্যার কাহিনী। শেষকালে জোড়াতালি করে দুটি গল্প মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম কাহিনী সাঁওতাল গল্পটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপান্তর। মূল গল্পে ছিল রাজসন্তান ভগিনী-ভাই, সীতা ও লক্ষ্মণ। সাঁওতালি (এবং বাংলা) গল্পে তারা দুভাই হয়। সীতা হয় "সীত"। বাংলায় স্বাভাবিকভাবেই "সীত" হয়েছে "শীত"। অন্যথা নামটি অর্থহীন ও অসমঞ্জস হয়। এখন মনে হতে পারে রাম কেন লক্ষ্মণ হলেন? এ নাম পরিবর্তনের হেতু কি? সে হেতুর সন্ধানে গেলে আমরা রাম-কথার এক প্রত্নরূপে পৌঁছব। এ প্রত্নরূপে দুভাইয়ের বদলে ছিল ভাইবোন। (তুলনীয়: জাতক গল্পের বীজে পাই দুভাই এক বোন।) বোনের নাম ছিল সীতা এবং ভাইয়ের নাম ছিল লক্ষ্মণ, অর্থাৎ সুলক্ষণ, লক্ষ্মীপুরুষ। অর্থাৎ সীতা-লক্ষ্মণ মানে ছিল চাষ-চাষী। পরে "রাম" অর্থাৎ বিশ্রাম, শান্তি যুক্ত হল লক্ষ্মণের সঙ্গে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য জৈন রাম-কথা। এখানে রামের তুলনায় লক্ষ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে।) সাঁওতাল গল্পে যেমন তেমনি বাংলা গল্পের মূলেও 'লক্ষ্মণ' নাম ছিল। সীত "শীত" হওয়াতে লক্ষ্মণ স্বাভাবিক ভাবেই "বসন্ত" হয়েছে। মূলে এখানে 'রাম' থাকলে যদি তা বদলাত তবে দু-অক্ষরের অন্য নাম হত, যেমন—"জাড়", "মাঘ" বা অমনি কিছু।

সাঁওতাল বাংলা গল্প দুটির মধ্যে রাম-কথার এমন এক প্রাক্তন রূপ পাওয়া গেল যেখানে পাত্রপাত্রী দুজন মাত্র, এবং তারা ছিল ভাই-বোন।

বাংলা গল্পটির দ্বিতীয় আখ্যানে রাম-কথার সঙ্গে মিল রাখার অল্পস্বল্প চেষ্টা

হয়েছে বলে মনে হয়। সুয়োরাণীর তিন ছেলে করে মোট সংখ্যা পাঁচ রাখবার চেষ্টা হয়েছে, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ও সীতা।

ছয়

প্রথম কাহিনী উড়ো বীজ ঋগ্‌বেদকেও এড়িয়ে যায় নি। দশম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় শ্লোকে এর আভাস পেয়েছি।

ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎ
স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর্ দ্যুভিরগ্নির্ বিতিষ্ঠন্
রুশদ্ভির্ বর্ণৈর্ অভি রামম্ অস্থাৎ॥

'শ্রীমান্ পুরুষ এলেন শ্রীমতী নারীর সঙ্গে। প্রেমিক ভগিনীর পিছনে পিছনে আসছে। সমুজ্জল দ্যুতি নিয়ে স্থির হয়ে অগ্নি জ্যোতির্ময় আভায় রামকে বিদায় দিলেন॥'

এখানে ভদ্র=রামভদ্র, ভদ্রা—সীতা, স্বসা—সীতা, জার—লক্ষ্মণ, অগ্নি—দশরথ। তা ছাড়া 'রাম' কথাটিও রয়েছে। আমার অনুমানে এখানে প্রথম কাহিনীর একটি ছবি উঠেছে।

সাত

প্রথম কথার বিষয়: বনবাস অথবা নির্বাসন। প্রতিনায়ক নেই।

দ্বিতীয় কথার বিষয়: পত্নী অপহরণ—উদ্ধার। এই কাহিনীর বিস্তৃতি ও বিচিত্রতা সমধিক। প্রথম কথার প্রতিনায়ক বলতে প্রত্যক্ষে কেউ নেই। নায়কের বিরুদ্ধতা সবই ভূমিকায় ঘটে গেছে। দ্বিতীয় কথার প্রতিনায়ক মায়াবী তপস্বী অথবা দানব। নায়ককে জয়লাভ করবার জন্য ত্রিবিধ শক্তির সাহায্য নিতে হয়—স্থলশক্তি, জলশক্তি ও অন্তরীক্ষ শক্তি। বিভিন্ন উড়ো বীজে ঘটনার বিভিন্নতা সত্ত্বেও নায়কের শক্তি ও প্রতিনায়কের শক্তি ব্যাপারে মিল দেখা যায়। এ কথার উপক্রমে অধিকাংশ উড়ো বীজে নায়কেরা তিন ভাই পাওয়া যায়, তাদের তিন ভগিনীপতি। এরাই পরে সাহায্য করেছিল। রাজার ছেলেরা সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিল পিতার প্ররোচনায়। নায়ক পত্নী সংগ্রহ করেছিলেন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে।

দ্বিতীয় কথার প্রতিনায়কই ঘটনাবলীর নিয়ন্তা।

দ্বিতীয় কথার বহু উড়ো বীজ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অনেকটা একই ধরনের উড়ো বীজের সাতটি গল্প এখানে বলছি। একটি গল্প বাংলা দেশের (তবে ইংরেজী অনুবাদে পাওয়া)১, একটি সার্বিয়-লিথুয়ানিয়, একটি হাঙ্গেরিয় ও তুর্কি, একটি আলবানিয়, একটি আইরিশ ও দুটি রুশিয়।

প্রথমে বাংলা গল্পটির যথাযথ অনুবাদ দিই।

এক ধার্মিক ব্রাহ্মণের এক ছেলে আর তিন মেয়ে ছিল। সকলেই সভ্যভব্য ও সুশ্রী। মরবার আগে বামুন ছেলেকে বলে গেল,—'যার-তার সঙ্গে বোনেদের বিয়ে দিও না। যে-সে মেয়েকেও তুমি বিয়ে ক'রনা।' বামুনের মৃত্যুর পর বছর খানেক কাটল। মেয়েরা সুন্দরী বলে ইতিমধ্যে তাদের অনেক সম্বন্ধ এল। সবই সাধারণ ঘরের বলে তাদের প্রত্যাখ্যান করা হ'ল। একদিন হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি। ঘন ঘন বজ্রপাত। এমন সময় বামুনের ঘরে ঢুকল উজ্জ্বলকান্তি সৌম্যমুখ এক যুবক। বিস্ময়াহত হয়ে বামুনের ছেলে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলে—'কে তুমি?' 'ও! আমি ঝড়ের ঠাকুর'—সে বললে, 'তোমার বড়ো বোনকে বিয়ে করে নিয়ে যাব বলে এসেছি।'

'বেশ নিয়ে যাও ওকে। ঈশ্বর তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন।' —বামুনের ছেলে বললে। তারপর ঝড়ের ঠাকুর বড়ো বোনকে বিয়ে করে ঘরের চৌকাঠ পার হতেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পরের বছর একদিন হঠাৎ দারুণ ভূমিকম্প হ'ল। স্থানে স্থানে মাটি ফেটে চৌচির হ'ল। হঠাৎ এক বলবান্ সুদর্শন যুবক বামুন-ছেলের ঘরে এসে ঢুকল।

'কে তুমি?'—জানতে চাইলে বামুন-ছেলে নবাগতর কাছে, আগেকার মতোই। 'ও! আমি ভূঁইচাল ঠাকুর। তোমার মেজো বোনকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে এসেছি।' বামুন-ছেলে বললে, 'বেশ, নিয়ে যাও ওকে। ঈশ্বর তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন।' তারপর ভূঁইচাল ঠাকুর মেজো বোনকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে মাটির তলায় নেমে গেল।

তারপরের বছরে এল ভয়ঙ্কর বান। সমুদ্রের হাঙর, কুমীর দলে দলে চরে বেড়াতে লাগল। এমন সময়ে ঘরে ঢুকল এক সাহসী বীর যুবক। তাকে

---

১. গল্পটি লালবিহারী দে তাঁর উপন্যাসের—নাম The Young Zaminder. (১৮৭৪?)—মধ্যে দিয়ে গেছেন ('The Sevait's Story')।

জিজ্ঞাসা করলে বামুন-ছেলে আগেকার দুবারের মতোই—'কে তুমি?' 'ও, আমি জল-ঠাকুর। তোমার ছোট বোনকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে এসেছি।' 'বেশ নিয়ে যাও ওকে। ঈশ্বর তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন।' জল-ঠাকুর বামুন-ছেলের ছোট বোনকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ঢুকে গেল।

বোনেদের বিয়ে-থা হয়ে যাবার পর একদিন তার মনে ভাবনা জাগল,—'বাবা যেমনটি বলেছিলেন তেমনি তো বোনদের বিয়ে হয়ে গেল। এখন আমি ঘর করবার জন্তে অ-সাধারণ কনে পাই কোথায়!' তার মনের ভাবনা মুখ ফুটেও বেরল। কাছে এক গাছে এক পাখি বসেছিল। সে ওর মনের কথা শুনতে পেলে। পাখি চমৎকার দেখতে—নানা রঙের পালকের ডানা তার। পাখি বললে, 'বনের মধ্যিখানে এক অত্যন্ত অ-সাধারণ মেয়ে দেখেছি। সে এক দানবের কন্তা। বাপ তাকে খুব ভালোবাসে। সর্বদা নজরে নজরে রেখে রক্ষা করে। মেয়েটি তোমার বোনেদের চেয়েও ভালো দেখতে। তার মুখে কথা ঝরে যেন জ্ঞানের মুক্তোঝুরি।'

বামুন-ছেলে পাখিকে বললে, 'পাখি—তাকে পাই কি করে?' পাখি বললে, "তার বাবা রাত্তির বেলায় চরতে যায়। যদি তুমি সেই সময়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে ভুলিয়ে আনতে পার তো হয়।"

বামুন-ছেলে সাহসী ছিল, তার মনেও বেশ উৎসাহ ছিল। সে একদিন রাত্রিকালে একলা বনের মধ্যে চলে গেল। ঘুরে ঘুরে সে দানব-কন্তার বাড়িতে পৌঁছল। তার সঙ্গে কথাবার্তা করে শেষে বললে, 'সুন্দর তোমার চোখদুটি। এসো না আমার সঙ্গে। এ নির্জন বাসে তো জীবনে কোন সুখ পাচ্ছ না। আমার সঙ্গে অন্তত্র গেলে কেমন সুখে থাকব আমরা দুজনে।'

মেয়েটি বললে, 'আমার মত খুব আছে। নির্জনে থেকে আমি তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি। কেনই যে আমাকে এখানে নজর-বন্দী করে রাখা তাও তো বুঝি না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে এখান থেকে পালান খুব কঠিন। সে চেষ্টায় বিপদও ঢের।'—ছেলেটি উত্তর করলে, 'তবুও আমাকে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। তোমার মতো মেয়েকে পেতে হলে সব কষ্ট বিপদকে তুচ্ছ করতে হয়।'

দানব বাড়ি ফেরার আগেই তারা পালাল। কিন্তু বন পেরিয়ে যেতে পারল না। ধরা পড়ে গেল।

'কি বাছা, ভালোবাসার মানুষ জুটিয়ে আমার কাছ থেকে পালাবে মনে করেছ? বোকা তুই। যা বাড়ি ফিরে। তোর ভালোবাসার লোককে

"আমি জব্দ করে যাচ্ছি' এই বলে দানব বামুন-ছেলেকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে—বনের সব থেকে উঁচু গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে দিলে—যাতে করে পেঁচা ও অন্যান্য পক্ষী তাকে ঠুকরে মেরে ফেলে। কিন্তু ঝড়-ঠাকুর তাকে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড ঝড় তুলে মাটিতে নামিয়ে আনে আর নির্বিঘ্নে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

রাত্রিতে বামুন-ছেলের ভালো ঘুম হল না। সে মেয়েটির কথাই ভাবতে লাগল। মনে মনে ঠিক করলে—আবার চেষ্টা করবে তাকে উদ্ধার করে আনবার জন্যে। সেদিন রাত্তিরে সে আবার বনে গেল। তাকে দেখে দানবের মেয়ে খুশি হয়ে স্বাগত করে তার গলা জড়িয়ে ধরে রইল বিয়ের মালার মতো।

তারপর সে বললে, 'কেন তুমি আবার এলে? তুমি কি আমার বাবার নিষ্ঠুর শক্তির পরিচয় পাওনি?' বামুন-ছেলে বললে, 'তোমার মতো রত্ন পেতে হলে—এমন সাহস না করলে হবে না। চল আবার পালাই। এবার হয়ত এড়াতে পারব।' মেয়েটি বললে, 'তুমি বলছ। চল যাই। কিন্তু আমার মন বলছে, আমরা এবারও ধরা পড়ব আর তুমি আরও নিষ্ঠুর শাস্তি পাবে।'

'যা হবার হোক, চল যাই'—এই বলে সে মেয়েটিকে নিয়ে পালাল। কিন্তু এবারও দানব ফিরে আসবার আগে তারা বনের সীমানা পেরতে পারল না। ধরা পড়ল। 'আ! আবার ছোকরা সাহস দেখাতে এসেছ! আগেকার শাস্তির কথা ভুলে গেছ। আচ্ছা এবার তোমাকে মাটিতে পুঁতব যাতে করে আর কখনো দিনের আলো দেখতে না পাও।' এই বলে দানব বামুন-ছেলেটিকে মেরে মাটিতে পুঁতে রেখে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

ভুঁইচাল-ঠাকুরের নজরে এল শালার দুর্দশা। সে মাটি ফাটিয়ে দিয়ে বামুন-ছেলেকে কবর থেকে উদ্ধার করলে—আর তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলে।

তবুও বামুন-ছেলে দমল না। পরের দিন রাত্তিরে আবার সে বনে দানবের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। তাকে দেখে মেয়েটি খুশি হল বটে কিন্তু আবার বিপদের ঝুঁকি নেয়ার জন্যে তাকে ভর্ৎসনা করলে। আবার তারা পালাল। আবার ধরা পড়ল। দানব দেবতাদের অমর আত্মার দোহাই দিয়ে বললে,

'এবার তোকে আমি জলে ফেলে দিচ্ছি। দেখি কি করে উদ্ধার পাস।' এই বলে সে—বামুন-ছেলেকে পাকড়ে ধরে এত জোরে ছুঁড়ে দিলে যে সে বন থেকে একেবারে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল।

জল-ঠাকুর সতর্ক ছিল। সে ঢেউ ঠেলে ঠেলে তাকে ডাঙায় তুলে ফেললে।

তারপর নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছে দিলে। মনের মতো মেয়ে পেয়ে তাকে বিয়ে করবার প্রচেষ্টা তিন তিনবার ব্যর্থ হওয়ায় বামুনের ছেলে মুষড়ে পড়ল। তার পর গাছে সেই পাখিকে দেখতে পেয়ে বললে, 'পাখি ভাই, তুমি তো আমাকে বিয়ের পাত্রীর সন্ধান দিয়েছিলে। এখন বল না কি করে তাকে পাই।'

পাখি বললে, 'ভাই, তুমিতো বামুনের ছেলে। আমার মতো তুচ্ছ প্রাণীর কাছে এমন ব্যাপারে পরামর্শ চাইছ। এক কাজ কর। এক ঘটি গঙ্গাজল আর কিছু তুলসী পাতা সঙ্গে নিয়ে যেও এবার। তোমার বৌকে নিয়ে পালিয়ে আসবার সময়ে পিছনে গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে আর তুলসীপাতা বিছোতে বিছোতে এস। কোন দানব তা ডিঙিয়ে এসে তোমাদের ধরতে পারবে না।'

বামুনের ছেলে আবার বনে দানবের বাড়ি গেল, পাখির উপদেশ মত ঘটি ভরে গঙ্গাজল ও সাজি ভরে তুলসী পাতা নিয়ে।

বামুনের ছেলেকে দেখে মেয়েটি যেমন হাসিখুশি হল তেমনি তার প্রাণের আশংকা করে ভীতও হ'ল। সে বললে, 'কেন তুমি আবার এলে? এবার বাবা তোমাকে প্রাণে বাঁচতে দেবে না।' ছেলেটি বললে, 'যা হবার তা হোক। তোমাকে না পেলে বেঁচে আমার সুখ কী? এস, তাড়তাড়ি পালাই। এবারে ব্যবস্থা করেছি। তোমার বাবা আর নাগাল পাবে না।' আগেকার মতোই তারা পালাল। বামুন-ছেলে পিছনে গঙ্গাজল ছিটোতে আর তুলসী পাতা বিছোতে লাগল। দানব তাদের ধরি ধরি করেও ধরতে পারল না। গঙ্গাজল আর তুলসী পাতায় আটকে পড়ে গেল। সে দুহাতে মাথার চুল ছিঁড়ে চেঁচাতে লাগল।

বাড়িতে এসে তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হল। দুজনে সুখে ঘর করতে লাগল। দানবের মেয়ে ভালো বামুন- গিন্নী হয়েছিল।

> রাম-কথার সঙ্গে মেলাতে গেলে,—বামুন কর্তা=দশরথ। বামুন -ছেলে=রাম।
>
> দানব-কন্যা=সীতা। দানব=বাল্মীকি (অথবা রাবণ)।
>
> পাখি=জটায়ু, সম্পাতি।
>
> ঝড়-ঠাকুর=হনুমান। জল-ঠাকুর=সমুদ্র। ভুঁইচাল-ঠাকুরের ইঙ্গিত রয়েছে খোটানী রামকথায়। সীতা-বিবাহেই কাহিনী শেষ।

গল্পকথাটিতে যে তত্ত্বরেশ পরানো হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। গঙ্গাজল ও তুলসী-পাতা যথাক্রমে—অলঙ্ঘ্য নদীর ও বনের আবির্ভাবের হিন্দুধর্মীয়

রূপান্তর। গল্পটির সঙ্গে আরও কয়েকটি গল্পের অন্তর্বিস্তর গভীর মিল আছে। সে গল্পগুলি মিলেছে নানা দেশে নানা ভাষায়।

সার্বির গল্প 'বাস চেলিক' উপরের বাংলা গল্পের রূপভেদের মতো। গল্পটি সংক্ষেপে বলছি। এক রাজার তিন ছেলে, তিন মেয়ে। রাজা মারা যাবার সময় বলে যান যে যারা মেয়েদের বিয়ে করতে প্রথম আসবে তাদের সঙ্গেই যেন বিয়ে দেওয়া হয়। পরপর তিনজন বিবাহার্থী এল। তিনজন শক্তিশালী অজ্ঞাত পুরুষ। (একজন ড্রাগনদের রাজা, একজন বাজ-পাখিদের (Hawk) রাজা, আর একজন ঈগল পাখিদের রাজা)। বড়ো দুভাই তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছিল। ছোট ভাই জেদ করে বিয়ে ঘটিয়ে দেয়। বিয়ে করেই তারা পত্নীদের নিয়ে অন্তর্ধান করে।

বড়ো দুভাইয়েরও বিয়ে হল। তারপর তিনভাই বেরোল বোনদের খোঁজ নিতে। পথে রাত্রিতে আলো না থাকায় ছোটভাই আলো খুঁজতে গিয়ে পড়ে এক রাক্ষসের দলে। তাদের মেরে ফেলে। অবশেষে সে পৌঁছয় এক নির্জন রাজপুরীতে। সেখানে রাজা আর রাজ-কন্যা ছাড়া কেউ নেই, সবাই রাক্ষসের পেটে গেছে। ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সে সাপের কামড় থেকে বাঁচায়। রাজা তার সঙ্গে সেই ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেন। একবার রাজা প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে যান। একটি ঘর ছাড়া সব ঘরে জামাইকে প্রবেশ অধিকার দিয়ে রাজা তাকে চাবির তোড়া দিয়ে যান। কৌতূহল বশে জামাই সেই নিষিদ্ধ ঘরটি খোলে। দেখে ঘরের মাঝখানে আষ্টে-পিষ্ঠে শিকলে বাঁধা একটা লোক ঝুলছে। তার সামনে আছে সোনার গামলা-ভর্তি জল। লোকটা তৃষ্ণায় ছটফট করছে। রাজার জামাইকে দেখে সে জল চাইলে। জামাই এক মগ জল দিলে। আবার জল চাইলে। আরও এক মগ দিলে। সে বললে, 'আমাকে যে এই দুবার জল দিলে তাতে তুমি দুবার প্রাণ ফিরে পাবে।' তারপর বললে, 'আর একমগ জল আমার গায়ে ঢেলে দাও।' তা দিতেই লোকটার শিকল সব পট্‌পট্ করে ছিঁড়ে গেল। ঘর থেকে সে ঝড়ের মত উড়ে বেরিয়ে গেল। ছোঁ মেরে রাজকন্যাকেও নিয়ে গেল। সে হল চেলিক।

স্বামী বেরল পত্নীর অন্বেষণে। একে একে গেল তিন বোনের কাছে। বোনাইরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। তারপর সন্ধান করে সে পৌঁছল এক পর্বতগুহার মুখে। সেখানে পত্নীর দেখা পেলে। দুজনে পালাল। চেলিক তাড়া করে এসে রাজকন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এই রকম আরও একবার

হল। তিনবারের বার চেলিক রাজকুমারকে হত্যা করে রাজকন্যাকে নিয়ে চলে যায়।

ভগিনীপতিরা জর্ডন নদীর পবিত্র জল এনে রাজপুত্রকে বাঁচায়। তারপর তাদের পরামর্শ অনুসারে রাজপুত্র রাজকন্যার মারফত চেলিকের প্রাণবস্তু কী ও কোথায় তা জেনে নেয়। সুদূর দেশে পাহাড়ের উপরে এক বহুরূপী শিয়াল আছে। তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে খাঁচা আছে। সেই খাঁচায় এক পাখি আছে। সেই পাখিই চেলিকের প্রাণ। রাজপুত্র অসাধ্য সাধন করলে। পাখিটাকে মারতেই চেলিক মরে গেল। ভগিনীপতিরা শালা ও তার পত্নীকে যথাস্থানে পেঁাছে দিলে।

এই গল্পে ছোট রাজকুমার=রামের স্থানে লক্ষ্মণ, রাজা=দশরথ, রাজকন্যা=সীতা, রাজকন্যার পিতা=জনক+বাল্মীকি, চেলিক=রাবণ, ভগিনীপতিরা=বানর ও হনুমান। জর্ডনের জল=বিশল্যকরণী।

উপরে বলা সার্বিয় গল্পটির প্রায় যেন পাঠান্তর রূপে একটি গল্প পাই তুর্কি ও হাঙ্গেরির ভাষায়। গল্পটির নাম 'ঝড় দানব'। গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

(বাংলা গল্পটির সঙ্গেও মিল আছে গোড়ার দিকে অনেকখানি পর্যন্ত।)

এক রাজার তিন ছেলে, তিন মেয়ে। মৃত্যুকাল আসন্ন হলে পর রাজা বলে গেলেন, যে ছেলে সারা রাত্রি ধরে তাঁর কবরে পাহারা জাগতে পারবে সে-ই রাজ্যভাগ পাবে আর যে ব্যক্তিরা কন্যাদের বিবাহার্থী হয়ে প্রথম আসবে তাদেরই মেয়ে দিতে হবে। রাজার মৃত্যু হল। তাঁর বড়ো ছেলে কবরে পাহারা দিতে গেল। মাঝ রাত হতেই অন্ধকারের মধ্যে সে চীৎকার শুনতে পেলে। তাই শুনেই সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। তার পরের রাত্রিতে মেজো ছেলে গেল। তার দশাও সেরকম হল। তার পরের রাত্রিতে ছোট ছেলে গেল। সে অন্ধকারের মধ্যে থেকে থেকে ভীষণ চীৎকার শুনেও ভয় পেলে না। তার কোমরে ছোরা বাঁধা ছিল। সে নির্ভয়ে এগিয়ে চলল চীৎকার যে দিক থেকে আসছিল সে দিকে। কিছুদূর গিয়ে সে এক বিরাট ভীষণ মূর্তি জীব (Dragon) দেখতে পেলে। ড্রাগনকে সে বধ করলে। তারপর সে আলোর খোঁজে এগিয়ে চলল। একটু পরে সে এক ঘরের কাছে এল, সেখান থেকে একটু আলো আসছিল। সে দেখলে এক বুড়ো কালো সাদা দুটো সুতোর গুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কালো গুটিটা সে গুটোচ্ছে আর সাদা গুটিটা গড়িয়ে যাচ্ছে। ছোট রাজকুমার তাকে

জিজ্ঞাসা করলে, 'ও তুমি কি করছ বাবা ?' সে বললে, 'আমার কাজ করছি, রাত গুটোচ্ছি, দিন খুলছি।' এই শুনে রাজকুমার তাকে এমন করে বেঁধে ফেললে যাতে সে সুতো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে না পারে। সেখান থেকে সে বেরল আলোর খোঁজে। পৌঁছল এক রাজপ্রাসাদের উঁচু পাঁচিলের গায়ে। সেখানে চল্লিশজন দস্যু বসে পাঁচিল ডিঙোবার পরামর্শ করছিল। দস্যুদের সাহায্য করবার ছলে রাজকুমার তাদের একে একে সব কেটে ফেললে। তারপর উপরে গিয়ে বন্ধ দরজা খুলে তিন ঘরে তিন অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ঘুমচ্ছে দেখতে পেলে। শেষের ঘরের মেয়েটি সবথেকে সুন্দরী, আর তার ঘর ধাতুর পাতে আগাগোড়া মোড়া ছিল। সে ঘরের দরজায় সে ছোরা মারলে। তারপর ছোট রাজকুমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। ফিরে গিয়ে বুড়োর বাঁধন খুলে দিলে আর যে ড্রাগনটাকে মেরেছিল তার নাক কান কেটে নিয়ে পকেটে ভরলে। তারপর বাড়ি ফিরে এল। দেখলে বড় ভাই সিংহাসন অধিকার করেছে।

কিছুদিন পরে এক সিংহ এল বড়ো রাজকুমারীকে বিয়ে করতে। বড়ো ভাই রাজি হয়নি, ছোট ভাইয়ের কথায় বিয়ে হল। তারপরে এল মেজো কুমারীকে বিয়ে করতে এক বাঘ। তার সঙ্গেও বিয়ে হল ছোটরাজকুমারের কথায়। তেমনি করে ছোট-রাজকুমারীর বিয়ে হল পাখির সঙ্গে। সে পাখি যে-সে নয়, পাখিদের রাজা—'সবুজ-অঙ্ক' (Emerald Anka)।

যে রাজবাড়িতে চল্লিশজন দস্যু হানা দিতে গিয়েছিল তার রাজা সকালে উঠে কাটা সাপ ও পাঁচিলের ধারে কাটা দস্যুদের স্তূপ দেখে অবাক্ হয়ে গেল। তারপর রাজা এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে চারদিকে খবর পাঠিয়ে দিলে। তার ধারণা, যে ব্যক্তি তার মেয়ের ঘরের দরজায় ছোরা গেঁথে গেছে সেই তাদের উদ্ধারকর্তা এবং সে এই ভোজে আসবে। তিন রাজপুত্র ভাইয়েরা এসেছিল। ছোট রাজপুত্রের কোমরে খালি ছুরির খাপ দেখে তাকে রাজা উদ্ধারকর্তা বলে বুঝতে পারলে। তাকে পুরস্কার দিতে গেলে সে তার ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে। রাজা বললেন,—সে তো সম্ভব নয়। ও মেয়ের উপর ঝড়-দানব নজর দিয়েছে। তাই তাকে ধাতুর পাতে মোড়া ঘরে রাখা হয়েছে। তবুও রাজকুমার জেদ করতে লাগল। অবশেষে বিয়ে হল। অপর দুই রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হল বড়ো দু-ভাইয়ের সঙ্গে। তারা বিয়ে করে বৌ নিয়ে বাড়ি চলে গেল। ছোট রইল শ্বশুর-বাড়িতে।

ছোট রাজকুমার একদিন অল্পক্ষণের জন্য শিকার করতে বেরল। সেই অবসরে ঝড়-দানব এসে তার বৌকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। তারপর ছোটরাজকুমার বেরল পত্নীর খোঁজে। তার দেখা ও মিলন হল তার তিন বোন ও তাদের স্বামীর সঙ্গে। ছোট বোনের স্বামী পাখিদের রাজা রাজপুত্রকে ঝড়-দানবের প্রাসাদের সন্ধান বলে দিলে।

ঝড়-দানব চল্লিশদিন করে একটানা ঘুমোয়। তার ঘুমোবার সময়ে রাজকুমার গিয়ে পত্নীকে উদ্ধার করে নিয়ে চলল। ঘুম থেকে উঠে দানব তাদের ধাওয়া করলে আর ছোট-রাজকুমারকে হত্যা করে মেয়েটিকে আবার নিয়ে এল। যাবার আগে মেয়েটি স্বামীর হাড়গোড় কুড়িয়ে থলি বোঝাই করে তারা যে ঘোড়ায় আসছিল তার পিঠের উপর চাপিয়ে দিলে। সে ঘোড়া এসে পৌঁছল পরীদের রাজা পাখির প্রাসাদে। পরীদের রাজা স্বর্গোদ্যান থেকে জল আনিয়ে তা ছিটিয়ে রাজকুমারকে জীবিত করলে।

রাজকুমার আবার পত্নীকে উদ্ধার করে আনতে চলল। পরীর রাজা তাকে বলেছিল—সে যেন পত্নীকে দিয়ে ঝড়-দানবের মর্ম (talisman) কী ও কোথায় তা জেনে নেয়। নইলে তাকে (ঝড়-দানবকে) পরাজিত করা যাবে না। স্বামীর কথামত মেয়েটি ঝড়-দানবকে ভুলিয়ে তার মর্মরহস্য জেনে নিলে। ছ সাগর পেরিয়ে সাত সাগর। সে সাগরে এক বড়ো দ্বীপ। সে দ্বীপে চরে এক ষাঁড়। সেই ষাঁড়ের পেটে এক সোনার খাঁচা। তার মধ্যে আছে এক সাদা ঘুঘু। সেই ঘুঘুই ঝড়-দানবের মর্মবস্তু। সে দ্বীপে পৌঁছবার উপায়ও ঝড়-দানবের কথায় জানা গেল।

রাজকুমার সাতসাগরের দ্বীপে পৌঁছল। সেখানে ষাঁড়কে মেরে খাঁচা শুদ্ধ পাখি নিয়ে এলো ঝড়-দানবের প্রাসাদে। তারপর পাখিকে মেরে ফেললে। তারপর পত্নীকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করলে।

গল্পটির নায়ক রাজার সত্যসন্ধ ছোটছেলে—রামকথার লক্ষ্মণ। রাজ্যলাভের জন্যে পরীক্ষা ও বিবাহ জনকতনয়ার বিবাহের মতো।

প্রতিনায়ক নামেও যা কাজেও তাই। আগেকার আইরিশ গল্পের মতো বৈদিক দেবতার গর্জনা বায়ু-বাতের অসুর রূপ। "ঘোষা ইদ্ অস্য শৃণ্বিরে ন রূপম্" অর্থাৎ 'এর হাঁক শোনা যায়, রূপ দেখা যায় না'। মর্মস্থানের উল্লেখ সাবিয় গল্পটির সঙ্গে ও মিয়ামী রামকথার সঙ্গে তুলনীয়। ঝড়-দানবের একটানা চল্লিশদিন, অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল ধরে ঘুমিয়ে থাকা রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণকে

স্মরণ করায়। রাবণের মতো ষড়-দানবের গুপ্ত-পুরীও লঙ্কার মতো দূর-সাগরের মধ্যে দ্বীপে।

নায়কের ছোট ভগিনীপতি রামকথার জটায়ু সম্পাতি স্থানীয়। আর সিন্ধু ঘোটক যাতে চড়ে নায়ক প্রতিনায়কের গুপ্তপুরীতে গিয়েছিল ও ফিরে এসেছিল সে হল হনুমানের স্থানীয় অথবা সেতুবন্ধনের তুল্য। নায়কের পুনরুজ্জীবন ব্যাপারও রামকথার অনুযায়ী। গল্পটি খ্রীষ্টানের মুখে শোনা, তাই স্বর্গোদ্যানের (Eden Garden) জল এনে তাকে জীবিত করা হয়েছিল।

প্রতিনায়কের মা এ গল্পে তিন ভগিনীতে পরিণত হয়েছে। ঘরের কোণের বুড়ো বৈদিক অশ্বিদ্বয়ের (অথবা নক্ত ও উষার) প্রতীক, এর প্রতিচ্ছবি আছে একটি রুশ গল্পে, নাম ভাস্‌গিলিশ ও বাবাইয়াগ। তাতে বুড়োর ব্যাপারটি কালো, লাল, সাদা তিন ঘোড়ার উপর তিন বীর রূপে মিলছে।

আলবানিয়ার একটি গল্প মিলেছে যার সঙ্গে উপরের গল্পটির আংশিক, তারও উপরের গল্পটির সঙ্গে আরও বেশি মিল আছে। গল্পের নাম 'তিন ভাই আর তাদের তিন বোন'। গল্পটি বলি।

তিন ভাই ও তিন বোনের সংসার। বাপ-মা নেই। ভাইয়েরা বোনেদের বিয়ে দিলে। বড়োর হল সূর্যের সঙ্গে, মেজোর চাঁদের সঙ্গে আর ছোটর দখনে বাতাসের সঙ্গে। কিছুকাল পরে ভাইয়েরা বেরল বোনেদের খবর নিতে। পথে রাত্রিতে তারা এক পাহাড়ের গোড়ায় বিশ্রাম নিলে। আগুন জ্বালালে। দুজন করে ঘুমুতে লাগল, একজন করে পাহারায় রইল। সেখানে পড়ল তারা এক রাক্ষসীর পাল্লায়। বড়ো ভাই ছিল পাহারায়, সে রাক্ষসীকে মেরে ফেললে। পরের দিন তারা যেখানে ডেরা করলে রাত্রিবেলায় সেখানেও আগুন জ্বলতে দেখে রাক্ষসী এল। পাহারা দিচ্ছিল মেজো ভাই। সে রাক্ষসীকে মেরে ফেললে। পরের দিনও তেমনি ঘটল। সেদিন ছোট ভাই অনেক কাকুতি-মিনতি করে পাহারা দেবার ভার আদায় করেছিল। যে রাক্ষসী এল তাকে সে মেরে ফেললে। কিন্তু হলে হবে কি, রাক্ষসীর লেজের ঝাপটায় তাদের আগুন নিভে গেল।

তখন ছোটভাই চলল আগুন আনতে। হাতে নিলে একটা পোড়া কাঠ। দূরে আগুন জ্বলতে দেখে সে এগিয়ে গেল। তার দেখা হল এক বুড়ীর সঙ্গে। সে বুড়ী হল দিনের আলোর মা। 'কে তুমি, কোথা থেকে আসছ? কোথায়

যাবে?'—প্রশ্ন করলে তাকে ছোট ভাই। বুড়ী বললে, 'আমি পুব থেকে আসছি—উষাকে নিয়ে, তোমার সঙ্গে গল্প করার ফুরসত আমার নেই।'

ছোট ভাই বুড়ীর হাতে চুমু খেয়ে বললে, 'আইমা তোমাকে একটু সবুর করতে হবে। একটু আমাকে সময় দাও, আমি ওই ওখানে যে আলো জ্বলছে—তার থেকে আমার এই কাঠ জ্বালিয়ে আনি। দিন ফুটে গেলে আমি আর দূর থেকে আগুন টের পাব না।' বুড়ী তার কথায় রাগ করলে না। বললে—'বেশ। আমি অপেক্ষা করছি।' কিন্তু বুড়ীর কথায় সে বিশ্বাস করলে না। নিজের কোমরবন্ধ খুলে তাই দিয়ে বুড়ীকে বেঁধে দিলে এক গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

আগুন আনতে গিয়ে সে পড়ল ডাকাতের পাল্লায়। তারা বারো জন। ছোটর শক্তির পরিচয় পেয়ে তারা সাহায্য চাইলে—রাজার ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া চুরি করবার জন্যে। প্রাচীর পেরোবার সময় সাহায্যের অছিলায় সে ডাকাতদের এক এক করে সবাইকে মেরে ফেললে। তারপর সে রাজবাড়িতে ঢুকল। উঠোনে একটা কুয়া দেখে সে কুয়ার কাছে গিয়ে কুয়ার গাঁথনির ফাঁকে তার রক্তমাখা তলোয়ার গুঁজে রেখে দিলে। তারপরে সে ফিরে এল বুড়ীর কাছে। তার বাঁধন খুলে দিলে। তারপর ভাইদের কাছে ফিরে এসে আগুন জ্বাললে।

রাজার বাড়িতে ছোটভাই ডাকাত মেরেছিল—সে বাড়িতে সকাল বেলায় হুলস্থূল পড়ে গেল। রাজা মহাভাবনায় পড়লেন, কুয়ার পাড়ে রক্তমাখা তলোয়ার কার—? অনেক খোঁজ হল। কোথাও সন্ধান মিলল না। শেষে বড়ো রাস্তার চৌমাথায় রাজা এক সরাইখানা খুললেন। সেখানে থাকা-খাওয়ার জন্য পয়সা লাগবে না। তার বদলে আগন্তুকদের নিজের নিজের কাহিনী বলতে হবে। রাজার উদ্দেশ্য, এইভাবে একদিন তলোয়ারের মালিককেও চেনা ও ধরা যাবে। অবশেষে তাই ঘটল। ছোটর মুখে তার কাহিনী শুনে সরাই-খানার অধ্যক্ষ রাজার কাছে নিয়ে গেল। তার সঙ্গে রাজা মেয়ের বিয়ে দিলেন।

রাজার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে জেলের কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু একজন বিকট কয়েদীকে ছাড়া হল না। সে আধা-মানুষ, আধা লোহা। তাকে ছেড়ে দেবার জন্য ছোট রাজাকে খুব অনুরোধ করায় তাকেও ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সে ছাড়া পেয়েই রাজকন্যাকে নিয়ে উধাও হল। এদিকে রাজা রাগে জামাইকে কেটে ফেলে আর কি,—জামাই বিনয় করে বললে, 'আমাকে

লোহার জুতো আর লাঠি করিয়ে দিন। আমি বছর না ঘুরতেই আপনার মেয়েকে উদ্ধার করে আনব'। রাজা তাই করে দিলেন। ছোট পত্নীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। গেল সে একে একে তিন বোনের বাড়িতে। শেষে সন্ধান মিলল ছোট বোনের কাছে। সে পাঠালে ভাইকে এক বিরাট বাজপাখির (falcon) কাছে। সে এত মোটা যে উড়তে পারে না। তার কাছে গিয়ে ছোট সন্ধান চাইলে। আধা-মানুষ আধা-লোহার বাড়িতে পত্নীর সঙ্গে দেখা হল। আধা-মানুষ আধা-লোহা জানতে পেরে তাকে ধরে মেরে রক্ত পান করে দেহটাকে বাইরে ফেলে দিলে। বাজপাখি তখন সুদূর পর্বত থেকে সোয়ালো পাখির দুধ এনে খাইয়ে ছোটকে বাঁচালে। তারপর মরণান্তিক অসুখের ভান করে রাজকন্যা আধা-মানুষ আধা-লোহার প্রাণ কোথায় তা জেনে নিলে। সে প্রাণ ছিল উল্টো দিকে পাহাড়ে এক বনশুয়ারের সোনা-রূপার দাঁতের ভিতরে এক খরগোশের পেটের মধ্যে তিনটি পায়রা রূপে। ছোট সেই পাহাড়ে গিয়ে বনশুয়ার মেরে তার সোনা-রূপার দাঁতের মধ্যে থেকে খরগোশ বার করে তার পেট চিরে তিনটি পায়রা বার করে একে একে তাদের মুণ্ডু কেটে দিলে। অমনি আধা-মানুষ আধা-লোহা মরে গেল। বাজপাখির পিঠে চড়ে ছোটর সঙ্গে রাজকন্যা তার বাপের বাড়ি ফিরে এল।

এই গল্পেও প্রথম রাজা = দশরথ, দ্বিতীয় রাজা = জনক, ছোটরাজকুমার = লক্ষ্মণ (রামের স্থানীয়), বাজপাখি = জটায়ু (হনুমান)। আধা-মানুষ আধা-লোহা = রাবণ। (তিনটে পায়রার তিনমুণ্ডু কাটার মধ্যে দশগ্রীবের ইঙ্গিত আছে মনে করি)। গল্পটিতে বিশেষত্ব হল বড়ো দু-ভাইকে খর্ব করা হয়নি। দিনের আলোর মা বুড়ীকে আমরা পরের কোন কোন গল্পে নতুন সাজে দেখব।

এখন বলি প্রথম রুশ গল্পটি। গল্পের নাম 'মারিয়া মোরেভ্‌না।' গল্পটিতে যুগোস্লাভ গল্পের আর এক এবং অভিনব রূপান্তর পাচ্ছি পূর্ণতর ভাবে।

সুনীল সমুদ্রের কিনারা থেকে অনেক অনেক দূরে থাকত এক রাজকুমার (Tzarevich) নাম—আলেক্সিস্ (Alexis) ও তার তিন বোন—রাজকুমারী (Tzarevna) নাম—আন্না (Anna), ওলগা (Olga) আর হেলেনা (Helena)। মা আগেই মারা গিয়েছিল, বাবা মারা যাবার সময়ে মেয়েদের তাঁর ছেলের হাতে দিয়ে বলে যান—যেন যথা সময়ে সে বোনেদের বিয়ে দেয় আর প্রথমেই যে প্রার্থী আসবে, মেয়ের অমত না হলে তারই সঙ্গে যেন বিয়ে দেওয়া হয়।

পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝা তুলে আবির্ভাব হল এক বিচিত্র শ্যেন পাখির (Hawk)। সে ঘরে ঢুকতেই সুন্দর পুরুষের রূপ পেলে। সে আন্নাকে বিয়ে করতে চাইলে। তাদের বিয়ে হল। তারা চলে গেল। বছর খানেক পরে আবার একদিন তেমনি ঝড় উঠল। সেদিন এল এক বড় কালো ঈগল পাখি। সেও ঘরে ঢুকে সুন্দর যুবক হয়ে গেল। সে ওল্গাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। তার পরের বছর একদিন তেমনি করে এল আর ঘরে ঢুকে মানুষ হয়ে গেল এক প্রকাণ্ড দাঁড়কাক। সে হেলেনাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। বোনেরা চলে যেতে আলেক্সিস্ কোন রকমে একটা বছর বাড়িতে কাটিয়ে তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল বোনেদের খবর নিতে। তিনদিন ঘোড়া হাঁকাবার পর সে পৌঁছল এক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। সেখানে অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র ও মৃত ঘোড়া ও সেপাই পড়ে ছিল। সেপাইদের মধ্যে একজন তখনও বেঁচেছিল। তার মুখে আলেক্সিস্ শুনলে যে এই যুদ্ধ যিনি জয় করে গেছেন তাঁর নাম মারিয়া মোরেভ্না। তিনি তিন মায়ের মেয়ে, ছ দিদিমার নাতনি, ন ভাইয়ের বোন, রাজার সুন্দরী কন্যা। এই কথা বলেই সেপাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। আলেক্সিস্ এগিয়ে চলল। অবশেষে পৌঁছল সে মারিয়া মোরেভ্নার শিবিরে। তার সঙ্গে পরিচয় হল। আলেক্সিসের ভ্রমণের কারণ জেনে নিয়ে মারিয়া তাকে কিছুকাল আতিথ্য স্বীকার করতে বললে। আলেক্সিস্ রাজী হল। তাদের মনে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হল। আলেক্সিস্‌কে নিয়ে মারিয়া রাজপুরীতে চলে গেল। দুজনের বিবাহ হল।

একদিন মারিয়া রাজ্যের এক প্রান্তে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাকে যেতে হল যুদ্ধ করে সে বিদ্রোহ দমন করতে। সেনাবাহিনী নিয়ে যাবার আগে মারিয়া বলে গেল,—আলেক্সিস্ যেখানে খুশি বিচরণ করতে পারে কিন্তু সে যেন মারিয়ার অন্তঃপুরে যে ঘরটিতে তালা দেওয়া আছে, তা যেন কিছুতেই না খোলে। নিষেধে কৌতূহল বাড়ায়। আলেক্সিস্ সে ঘর খুললে। দেখলে আষ্টেপিষ্টে লোহার শিকলে বাঁধা একটি লোক কাড়িকাঠ থেকে ঝুলছে। আলেক্সিস্ তার পরিচয় চাইলে সে বললে তার নাম যাদুকর কাস্‌চে, তাকে এমনি করে বেঁধে রেখে যন্ত্রণা দিচ্ছে মারিয়া মোরেভ্না দশ বছর ধরে। সে অত্যন্ত কাতর ভাবে বলল, 'আমাকে একটু জল দাও। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।' আলেক্সিসের দয়া হল। সে জগ ভর্তি করে জল দিলে। যাদুকর খেয়ে বললে —'আরও এক জগ দাও, তোমায় বিপদে আমিও তোমায় প্রাণ দোব।'

আলেক্সিস্ আরও এক জগ জল দিল। সে বললে,—'আরও এক জগ জল দাও, আমি তোমাকে দু-দুবার প্রাণদান করব।' আরও এক জগ জল দেওয়া হল। সেটা সে চক্ চক্ করে খেতেই তার মূর্তি পালটে গেল। সে পট্ পট্ করে লোহার শিকল ছিঁড়ে ঝড়ের মতো জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মারিয়াকেও নিয়ে গেল। আলেক্সিস্ নিজের বোকামির জন্য দুঃখ করতে লাগল। তারপর সে প্রতিজ্ঞা করে বেরোল যে মারিয়াকে উদ্ধার করবেই।

অনেক পথ যাবার পর তার একে একে দেখা হল তার তিন বোন ও ভগিনীপতিদের সঙ্গে। বিদায় নেবার সময়ে তারা আলেক্সিসের কাছে চেয়ে নিলেন স্মারক হিসাবে তার রূপোর চামচে কাঁটা আর নস্যির ডিবে। তারপর অনেকদূর গিয়ে সে কাস্‌থচের বাড়ি পৌঁছল। সে বাড়িতে ছিল না। বাগানে মারিয়ার দেখা পেলে। তাকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে পালাল। মারিয়ার পলায়ন বার্তা কাস্‌থচের ঘোড়া জানিয়ে দিলে। তখন সে ধাওয়া করে এসে মারিয়াকে কেড়ে নিয়ে গেল। আলেক্সিস্‌কে প্রাণে মারলে না। এইরূপ আরও একবার হল। সে আবারও আলেক্সিস্‌কে ছেড়ে দিলে। তৃতীয় বার সে আলেক্সিসের ঘোড়া কেটে ফেললে আর তাকে পিপেয় পুরে লোহার গজাল মেরে সমুদ্রে ফেলে দিলে। ভাইয়ের এই বিপদ সঙ্গে সঙ্গে বোন ও বোনাইদের গোচর হল। তাদের কাছে আলেক্সিস্ যে রূপার চামচে কাঁটা ও কৌটো দিয়েছিলে তা কালো হয়ে গেল। বোনাইরা তখন ছুটল। সমুদ্র থেকে পিপে তুলে এনে আলেক্সিস্‌কে উদ্ধার করলে। সে তার কথা সব জানালে।

তারপর পরামর্শ-সভা বসল। কাক বোনাই বললে, কাস্‌থচের মতো ঘোড়া না পেলে মারিয়াকে উদ্ধার করা যাবে না। আলেক্সিসের এখন কর্তব্য হচ্ছে মারিয়াকে দিয়ে কাস্‌থচের ঘোড়া কোথা থেকে পাওয়া যায় তা জেনে নেওয়া। আলেক্সিস্ আবার গেল মারিয়ার কাছে। মারিয়া কাস্‌থচেকে ভুলিয়ে তার ঘোড়ার ইতিহাস জেনে নিলে। কাস্‌থচে বললে, 'নীল সমুদ্রের তীরে এক মাঠ আছে, সেখানে ঘুরে বেড়ায় এক বিচিত্র মাদী ঘোড়া। বারো জন সর্বদা তার জন্য ঘাস কাটছে। সে ঘাস ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলছে। প্রত্যেক মাসে একটা করে ছানা হয় তার। আর তা সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে তার পিছুলাগা বারোটা নেকড়ে বাঘ। তিন বছর অন্তর সে একটা করে মাদী ছানা প্রসব করে। নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবার আগে যদি কেউ

উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারে তবে সেই ঘোড়া আমার ঘোড়ার জুড়ি হবে।' কি করে যে তার ঘোড়া পেয়েছিল সে গোপন কথাও মারিয়া বার করে নিলে। কাস্‌থচে বললে,—'ন নয় (অর্থাৎ সাতাশ) রাজ্য পেরিয়ে তিরিশ রাজ্যে আগুন নদীর ওপারে এক খুব বুড়ী ডাইনী (Baba Yaga) থাকে। সে তক্কে তক্কে থাকে, যখনি মাদী ছানা হয় তখনি সে তা নিয়ে আসে। সে এমনি ঘোড়া অনেক পুষছে। এক সময়ে আমি তিনদিন ঘোড়ার পরিচর্যা করেছিলুম। বুড়ী খুশি হয়ে আমাকে একটি ছোট বাচ্চা দেয়। সেই বাচ্চাই বড়ো হয়ে আমাকে কাজ দিচ্ছে।' মারিয়া জিজ্ঞেসা করলে, 'আগুনে নদী তুমি পেরোলে কি করে ?' সে বললে, 'আমার কাছে এক অপূর্ব রুমাল আছে, সেটা ডানদিক ধরে তিনবার নাড়লেই নদীর উপর এমন উঁচু পুল খাড়া হয়ে যায় যে আগুনের শিখা অতদূর পেঁছিতে পারে না।'

কাস্‌থচে ঘুমিয়ে পড়লে মারিয়া আস্তে আস্তে তার বুক পকেট থেকে রুমালখানি নিয়ে নিলে। আলেক্‌সিসকে সেটি দিয়ে ঘোড়ার কথা সব বললে। সে তখন চলল আগুনের নদীর পানে। রুমালের গুণে নদী পেরোল সে। তিনদিন পথ হাঁটার পর সে পেটের দায়ে এক পাখির ছানা ধরলে খাবে বলে। ছানাটির মায়ের প্রার্থনায় সে ছানাটিকে ছেড়ে দিলে। তারপর সে ঢুকল এক বনে। সেখানে এক মৌমাছির চাক দেখতে পেয়ে সে তা ভেঙে মধু খেতে গেল। রাণী মৌমাছি তাকে চাক ভাংতে নিষেধ করল, তাহলে তার প্রজারা আর খেতে পাবে না।

আলেক্‌সিস্ চাক ভাঙলে না। বন থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে পেঁছিল সমুদ্রতীরে। সেখানে একটা গলদা চিংড়িকে সে নিতে গেল। চিংড়ি বললে,—'আমাকে ছেড়ে দাও। পরে আমি তোমার উপকার করব।' সে ছেড়ে দিলে। তারপর সে ঘুরতে ঘুরতে ভোরের দিকে পৌছল বনের মধ্যে। দেখতে পেলে বুড়ী ডাইনীর কুঁড়েঘর। সে ঘর মুর্গির ঠেঙের মাথায় উপর বনবন করে ঘুরছে। কুঁড়ের চারদিকে বারোটা খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে, এগারোটা খুঁটির মাথায় মড়ার খুলি বসানো। একটা খালি। কুটীরের সামনে এসে আলেক্‌সিস্ বললে,—'ছোট কুঁড়ে ছোট কুঁড়ে! দাঁড়াও খুঁটি তেমনি ভাবে যেমন তোমার মা তোমাকে রেখেছিল, বনের দিকে পিছন আর সামনের দিকে মুখ করে।'

তার দিকে দরজা করে কুঁড়ে স্থির হয়ে গেল। তখন আলেকসিস মুর্গির

ঠেঙ বেয়ে উঠে কুটীরে ঢুকল। দেখলে বুড়ী তুম্দুরের উপর শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আলেক্সিস্ বুড়ীকে জাগালে,—'আইমা ভালো থাকো'—বলে। 'রাজকুমার তুমি ভাল থাক। কেন আমার কাছে এসেছ? নিজের ইচ্ছায়, না কাজে পড়ে?'—বুড়ী বললে! আলেক্সিস্ বললে—'দুকারণেই, আমি এসেছি তোমার সিন্ধুঘোটক চরাবার কাজ করতে। মাইনে নেব একটি ঘোড়ার ছানা।' বুড়ী ডাইনী বললে,—'বেশ, আমার কাছে বারোমাস কাজ কেউ করে না। তিন দিন করে। তুমি যদি ভালো করে কাজ কর তবে বীরের উপযুক্ত বাহন ঘোড়া পাবে। কিন্তু ঘোড়া যদি একটিও হারায় তবে তোমার মাথা ওই খালি খুঁটির উপরে চড়াব।'

কাজের ভার নিয়ে আলেক্সিস্ যেই আড়গড়ার গেট খুলে দিলে অমনি সব ঘোড়া নেজ নাড়তে নাড়তে চারদিকে উধাও হল। তখন হতাশ রাজকুমারের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন সূর্য ডুবু ডুবু তখন তার ঘুম ভেঙে গেল এক পাখির ঠোটের মৃদু আঘাতে। এ সেই পাখি যার ছানাকে সে ছেড়ে দিয়েছিল। পাখি বললে, 'দেখ গিয়ে সব ঘোড়া আডগড়ায় আটক রয়েছে।' সে যেতে যেতে শুনতে পেলে, বুড়ী ডাইনী তার ঘোড়াদের বকছে,—'কেন তোরা আমার কথা শুনলি না?' ঘোড়ারা উত্তর দিলে,—'কি করব, বিস্তর পাখি এসে আমাদের চোখে ঠোকর মারতে মারতে আড়গড়াতে সেঁদিয়ে দিলে।' তখন বুড়ী বলে দিলে,—'কাল তোমরা বনের মধ্যে ঢুকে নিরুদ্দেশ হ'য়ো।'

পরের দিন ছাড়া পেতেই ঘোড়াগুলো বনের মধ্যে ঢুকে উধাও হল। আগেকার দিনের মতো আলেক্সিস্ও কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙাল একটা বড়ো মৌমাছি। মৌমাছি বললে,—'আড়গড়ায় দেখোগে। তোমার ঘোড়া সব ঠিক আছে।' পরের দিন বুড়ীর নির্দেশ মতো সব ঘোড়া ঝাঁপ দিলে সমুদ্রে। সেদিন চিংড়ী মাছেরা দাঁড়ার চোটে সব ঘোড়া সমুদ্র থেকে খেদিয়ে এনে আড়গড়ায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যে গলদা চিংড়ীকে আলেক্সিস্ ছেড়ে দিয়েছিল সে তাকে এই পরামর্শ দিলে,—'তুমি আজও কুটীরে দেখবে এক কোণে একটা ছোট ন্যাংলা খোঁড়া বাচ্চা আছে। ঠিক যখন রাত দুপুর হবে তখন তার পিঠে চড়ে পালিয়ে যেয়ো।' তাই করলে সে। বুড়ী ডাইনী ধাওয়া করলে। আলেক্সিস্ রুমাল ডানদিকে

নেড়ে সাঁকো তুলে পেরিয়ে এল। তারপর সে রুমাল বাঁদিকে নেড়ে দিলে দুবার। তাতে সাঁকো খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। ডাইনী বুড়ী পেরোতে গেলে ভেঙে পড়ল। বুড়ী আগুনে পুড়ে মারা গেল। আলেক্‌সিস্ বারোদিন ধরে সূর্যোদয়ের সময় সবুজ মাঠে ঘাস খাওয়ালে পর ঘোড়া তৈরি হয়ে গেল।

সেই ঘোড়ায় চড়ে সে কাস্‌থচের প্রাসাদে গিয়ে মারিয়াকে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে চলল। কাস্‌থচেকে তার ঘোড়া সব ব্যাপার জানিয়ে দিতে সেও ধাওয়া করলে। আলেক্‌সিসের নাগাল পেয়ে যখন তাকে কাটবার জন্য তলোয়ার উঠিয়েছে, তখন আলেক্‌সিসের ঘোড়া কাস্‌থচের ঘোড়াকে চিনতে পেরে বলে উঠল, 'দাদা দাদা, করছ কী? এই বদমায়েসটার এখনও দাসত্ব করছ? দাও একে পিঠ থেকে ফেলে পায়ে করে মাড়িয়ে।' ঘোড়া তাই করলে। কাস্‌থচে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। আলেক্‌সিস্ কাস্‌থচের ঘোড়ায় উঠল। মারিয়া আলেক্‌সিসের ঘোড়ায় চড়ল। মারিয়াকে নিয়ে আলেক্‌সিস্ বোন ও বোনাইদের সঙ্গে একে একে দেখা করে শেষে নিজের বাড়িতে এসে রাজত্ব করতে লাগল।

এই গল্পের বিশেষত্ব,—রাজকুমার (একজন মাত্র)=রাম, রাজকন্যা মারিয়া=সীতা (কিন্তু বীর নারী। বিবাহ স্বয়ংবরেরই মতো), কাস্‌থচে= বাল্মীকি-রাবণ (আইরিশ গল্পের ক্রইস), আগুনের নদীতে পুল=সমুদ্রে সেতুবন্ধন। বনের বুড়ী=আগের গল্পের দিনের আলোর মা।

কাস্‌থচে শেষ পর্যন্ত মরেনি। কোন কোন রামকথায় রাবণও মরেনি।

নীচের গল্পকথাটিতে রামকথার অখণ্ড পূর্বচ্ছবি আছে।

গল্পটি পুরোন আইরিশ বীর-গাথায়—'লওন দ্যারিগ ও ভীষণ উপত্যকার মহাবীর'। ('Lawn Dyarrig and the Knight of Terrible Valley)।

একদা এক রাজা ছিলেন এরিন দেশে। তিনি মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। একজন মহাবীরের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তার মাথা টুপি ফুটে বেরিয়ে পড়েছে, তার কনুই আর হাঁটু পোশাকের থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আর তার পায়ের আঙুল জুতো থেকে বেরিয়ে আছে। লোকটি এগিয়ে এসে রাজার মুখে এক ঘুষি লাগালে। রাজার তিনটি দাঁত খসে পড়ল। রাজার মাথা কাদায় লুটোপুটি হল। রাজা বাড়ি ফিরে মনের দুঃখে বিছানা আশ্রয় করলেন।

রাজার তিন ছেলে। নাম তাদের উর (Ur), আর্থার (Arthur) ও লওন (Lawn=কেন?) দ্যারিগ (Lawn Dyarrig)। তারা পাঠশালা থেকে

বাড়ি এসে বিকেলে শুনলে বাবা বিছানা নিয়েছেন। তারা বাপের কাছে গেল। রাজা তাদের সব কথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন,—সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হলে তারা কী করবে। বড়ো বললে, 'তার দেখা যদি পাই, আমি তাকে চারটে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে চার খণ্ড করব।' রাজা খুশি হয়ে বললেন,— 'তুমি আমার ছেলে বটে।'

মেজো বললে, 'যদি তাকে ধরতে পারি তবে আমি তার চারদিকে আগুন জালিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারব।' রাজা উৎফুল্ল হয়ে বললেন—'তুমি আমার ছেলে বটে'।

ছোট বললে—'যদি তাকে খুঁজে পাই তবে আমি তার সঙ্গে যথাসাধ্য লড়ব। হয়ত সে আমার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।' রাজা বললেন,—'তুমি আমার পুত্র নও। তোমার জন্য আমি আর অর্থ-ব্যয় করব না। তুমি কালই এখান থেকে দূর হয়ো।'

পরের দিন বড়ো দু'ভাই বেরোল সেই লোকটার অন্বেষণে। রাজবাড়ি থেকে বিতাড়িত ছোট ভাই তাদের কাছে এসে বললে,—'তোমরা বড়োলোকের বেটা হয়ে সঙ্গে চাকর না নিয়ে যাচ্ছ, তা ভালো দেখাবে না।' বড়ো ভাইয়ের ইচ্ছা ছিল না, মেজো ভাইয়ের নির্দেশে ছোট ভাই চাকর হয়ে সঙ্গে চলল।

সমস্তদিন পথে চলে তারা দিনের শেষে একটা বাড়ি দেখতে পেলে। সে বাড়িতে আছে শুধু এক বুড়ী। তিনভাইকে অতিথি পেয়ে বুড়ী বড়ো দুজনকে করমর্দন করে স্বাগত জানালে। ছোটকে সে, এদিনের রাজার ছেলে বলে, 'এস-এস' বলে চুমু খেলে। বড়ো ভাই এ ব্যাপার লক্ষ্য করে বললে, 'এ কী রকম হল। ছোটোকে এত খাতির।' বুড়ী বললে, 'সে কথা শুনে কাজ নেই, তাতে তোমার মরণ।' সকাল বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর—বিদায় নেবার সময় এসে বুড়ী বড়োকে পর্যটনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে বড়ো ভাই সব কথা বলে বললে,—'আমি সেই লোকটাকে খুঁজছি জীবিত অথবা মৃত।'

বুড়ী বললে,—'সে তো ভীষণ উপত্যকার শ্যাম বীর। সেই তো তোমার বাপের দাঁত ভেঙেছিল। এখানে আমি তিনশ বছর ধরে বাস করছি। প্রত্যেক বছর দেখেছি তিনশ জন তরুণ বীর যোদ্ধা এখান দিয়ে গেছে কিন্তু তাদের একটিকেও ফিরে আসতে দেখিনি ভীষণ উপত্যকা থেকে।' মেজো ভাইকে জিজ্ঞাসা করায় সেও বললে,—'বড়ো ভাইয়ের মতো আমিও যাচ্ছি।' ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে,—'আমি ওদের চাকর হয়ে যাচ্ছি।'

তারপরে বুড়ী উরকে উদ্দেশ্য করে বললে,—'একবছর একদিন হল, আমার মেয়ে আভা খোলা জানালার ধারে বসে সেলাই করছিলো। এক খুব ভালো জামাজোড়া পরা মহাবীর (Champion) সেখান দিয়ে যাবার সময় আমার মেয়েকে দেখে তার কোমরবন্ধে আঙুল ঢুকিয়ে তাকে নিয়ে উধাও হয়েছে। তার বাবা পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিল। আজ পর্যন্ত মেয়ের বা মেয়ের বাপের খবর পাইনি। সে ব্যক্তি হল ভীষণ উপত্যকার শ্যাম বীর। তার মতো বীর পৃথিবীতে নেই, আমার কথা শোন, বাড়ি ফিরে যাও বাপের কাছে।'

বড়ো রাজপুত্র উর বুড়ীর কথায় কর্ণপাত করলে না। সব বুঝে বুড়ী ছোটকে বললে, 'ও ঘরে যাও, কাপড়-চোপড় পর আর এক গাদা তলোয়ারের তলায় যে পুরোন তলোয়ারটা আছে তা নাও।' সে কাপড়চোপড় পরলে। তলোয়ারটা টানতেই তা থেকে সাতমণ মরচে ঝরে পড়ল। তারপর বুড়ী তাকে বললে,—'এগিয়ে পড়ো। একটু এগিয়ে ঘোড়াশাল পাবে। তার থেকে রোগা সাদা ঘোড়াটি বেছে নিও। তোমার ভাইয়েদেরও তোমার পিছনে চাপিয়ে নিয়ো। তবে আমার মতে ওদের সঙ্গে না নেওয়াই ভালো।' সে কিন্তু ভাইয়েদের ঘোড়ায় তুলে নিলে। বুড়ী বলেছিল ঘোড়া দিয়ে আসবে একেবারে পৃথিবীর পূর্বভাগে। ছোট এক সাদা মাঠে গিয়ে থামবে। সেখানে তাদের নামতে হবে। আর ঘোড়ার সামনের খুরের তলায় ঘাসের চাপড়াটুকু কেটে নিতে হবে। তাই করা হল। ঘাসের চাপড়াটুকু তুলে নিতেই তলায় দেখা গেল ভীষণ উপত্যকা। তলায় নামবার জন্য ঝুড়ি বুনতে ও দড়ি পাকাতে হল। সে কাজ একরকম ছোটই করলে। নামবার বেলায় বড়ো বললে, 'আমি আগে।' কিন্তু খানিকটা নামতেই সে আর নামতে রাজি হল না। তাকে টেনে তোলা হল। তারপর মেজোর পালা। সেও একটু নেমে ফিরে এল। শেষে ছোট গেল। সে পৌঁছল ভীষণ উপত্যকায়। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সে সাত শ যোদ্ধাকে দেখতে পেলে। তাদের সে সেই তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললে। তারপর আর একদল যোদ্ধা। তাদেরও সে সাবাড় করলে। তারপর সে এল এক ঝরণার ধারে। ঝরণার জল খেয়ে ছোট বিশ্রাম করতে চাইলে। সে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেল। শ্যাম বীরের প্রাসাদ থেকে বন্দিনী নারীর ঝি এসে ঘুমন্ত ননকে দেখে তার মনিবকে জানালে। মহিলা দৌড়ে এল। সে জানত যে এমনি করে ঝরণার ধারেই সে জল দ্যবৃষিগের দেখা পাবে। ননকে সে উঠিয়ে নিয়ে প্রাসাদে গেল।

মহিলা লনকে আত্মপরিচয় দিয়ে এই কথা বললে, যে শ্যাম বীর তাকে হরণ করে এনে বিয়ে করতে চাইলে সে সাত বছর একদিনের মুলতুবি কড়ার করিয়ে নিয়েছে। এর পরে সে বিয়ে করবে। তবে ইতিমধ্যে তাকে বীরের পরিচর্যা করতে হবে। বীর পাখি শিকারে যায় তিন দিন ধরে। আর বাড়িতে থাকে তিন দিন ধরে। তার ফেরবার সময় হয়ে এসেছে।

বীর বাড়ি ফিরল। মহিলা তার টেবিলে খাবার দিয়ে এল। খেতে খেতে সে লণ্ডনের ব্যাপার সব শুনলে। শুনেই রেগে গিয়ে সে তিনশ যোদ্ধা পাঠালে লণ্ডনকে ধরে আনতে। সে তার কলজে যকৃৎ সব উপড়ে খাবে। তাদের সকলের হাতপা কেটে ফেলে স্তূপাকার করলে লণ্ডন। তারপর আবার তিনশ করে যোদ্ধা পাঠালে বীর। তাদেরও সব সেই একই দশা হল।

তারপর দু জনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। মহিলা লণ্ডনকে সাবধান করে দিলে,—'যদি যুদ্ধের ধ্বজদণ্ডে বীর প্রথমে আঘাত করে, তবে সে জিতবে সেদিন। তুমি যদি প্রথমে আঘাত ক'র তাহলে তুমি জয়ী হতে পারবে,—যদি আমার কথামতো কাজ কর। শ্যাম বীর অনেক মায়া জানে। সে যদি বোঝে যে যুদ্ধের গতিক ভালো নয় তখন সে কুয়াশার মতো উবে যাবে। আর সেই ভাবে নেমে এসে তোমাকে আঘাত করবে আর তুমি হয়ে যাবে সবুজ পাথর। সকালে যখন তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে তখন এক প্রস্থ লম্বা ঘাসের চাপড়া তুমি ঈশ্বরের নাম করে কেটে নিয়ে তুমি যে ছোট পাথর প্রথমে দেখবে তার উপর রেখে দিও। যখন বীর তোমাকে আক্রমণ করতে আসবে তখন তুমি সেই চাপড়া দিয়ে বুকের ডান দিকে তাকে মেরো। সে তখুনি সবুজ পাথর হয়ে যাবে।'

তাই হল। লণ্ডন মহিলাকে উপরে উঠিয়ে দিলে, মেয়েটিকে দেখে উর (বড়ো ভাই) লুব্ধ হল। সে মনে মনে ভাবলে,—উপরে যে এসেছে সে উপরে থাক আর নীচে যে আছে সে নীচেই থাক। এই বলে লণ্ডনকে না তুলে মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। পথে সে একটা মরা ঘোড়ার মুণ্ডু থেকে তিনটে দাঁত খসিয়ে নিয়ে গেল বাবার দাঁত বলে দেখাবে বলে।

এদিকে লণ্ডন ঘুরতে ঘুরতে এক বালকের দেখা পেলে,—নাম তার খাটো-কাপড় (খাটো কাপড় পরা, তাই)। তাকে লণ্ডন ভীষণ উপত্যকা থেকে বেরোবার পথ জিজ্ঞাসা করলে সে উদ্ধতভাবে উত্তর করলে। তখন লণ্ডন তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তাকে শায়েস্তা করলে।

সে উপর দেখিয়ে দিলে, বললে, 'ওই যে লাগামটা আছে ওটাকে নাড়ালেই

যে বস্তু আসবে তার মুখে লাগিয়ে দিয়ো। সে তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবে।' লাগামে নাড়া দিতেই একটা ছোট নোংরা ঘোড়ার ছানা হাজির হল। তাতে চড়ে লণ্ডন দেশে ফিরে এল।

সে রাজবাড়িতে গেল না। গেল এক তাঁতির বাড়িতে। সেখানে সে শুনলে যে রাজার বড়ো ছেলের বিয়ে, তাঁতিদের রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন। সেও তাঁতিদের সঙ্গে গেল আর তাদের অনেক খাবার দেওয়ালে। তাই শুনে বড়ো ভাই বেরিয়ে এল তাকে তাড়িয়ে দিতে, কেননা সে অত খাবার বিলোচ্ছে। তার সঙ্গে মেয়েটিও বেরিয়ে এল, সে লণ্ডনকে চিনতে পারলে না। তখন লণ্ডন কৌশলে তার কাছে তার দেওয়া আংটি পৌঁছে দিতে সে লণ্ডনকে চিনতে পারলো। লণ্ডন বাপের দাঁত শ্যাম বীরের পকেটে পেয়ে তা নিয়ে এসেছিল। এখন বাপের মুখে পরিয়ে দিতেই মাড়ির সঙ্গে জোড় লেগে গেল। লণ্ডনের সঙ্গে মহিলার বিবাহ সকলে স্বীকার করে নিলে।

তারপর পুত্রবধূ অর্থাৎ লণ্ডনের পত্নী তার শাশুড়ীকে উপহার দিলে একটি কোমরবন্ধ। বললে, 'এখন আপনাকে পরতে হবে।' রানী তা পরলে। তারপর বৌ শাশুড়ীকে প্রশ্ন করলে, 'উর কার বেটা?' রানী উত্তর দিলে, 'কেন, উর এরিনের রাজার বেটা।' শুনে বৌ কোমরবন্ধকে বললে, 'কষে এঁটে ধরো'। কোমরবন্ধের আঁটুনিতে রানী মারা পড়বার যোগাড় হল। রানী স্বীকার করতে বাধ্য হল যে উর শুয়র চরায় সে তার বেটা। তারপর প্রশ্ন হল, 'লণ্ডন কার বেটা?' রানী বললে, 'রাজার বেটা'। বৌ কোমরবন্ধকে কষে ধরতে বললে—কিন্তু কোমরবন্ধ তেমনই রইল। আঁট হল না। রাজা তখন লণ্ডনকে পুত্র বলে স্বীকার করে তাকে অর্ধরাজ্য দান করলে আর উর ও আর্থারকে লণ্ডনের চাকর করে দিলে।

গল্পটিতে রামকথার ছায়া নজরে পড়বার মতো নয়। তবে মিল কিছু কিছু আছে। সে মিল আকস্মিক হতে পারে। উৎসগতও হতে পারে। সে মিল পাই কোন কোন চরিত্রের গঠনে। নায়ক যিনি তিনি রামকথার রাম নন, লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের প্রাবল্য ও প্রাধান্য জৈন রামকথায় লক্ষ্য করা যায়। যতদূর মনে হয় তাতে বোধ হয় খোটানী ভাষায় প্রাপ্ত এক কাহিনীতে সীতাকে নিয়ে রামলক্ষ্মণের বিরোধের কথা আছে। মনে হচ্ছে সে কাহিনীতে রাবণ আর লক্ষ্মণ যেন এক হয়ে গেছে। রামকথার যে প্রাচীন রূপটিতে 'লক্ষ্মণ' নামটি (মানে ভাগ্যবান, সুতরাং শ্রীর অধিকারী) গৃহীত হয়েছিল সে

কাহিনীতে এই আইরিশ গল্পের মতো রাজার কনিষ্ঠ পুত্রই ছিল নায়ক। ভারতবর্ষীয় রামকথায় রামলক্ষ্মণের দ্বন্দ্বের কথা মুছে ফেলে তাদের সৌভ্রাত্রকেই উজ্জ্বল করে দেখানো হয়েছে। যবদ্বীপীয় রামকথায় লক্ষ্মণ বড়ো ভাই।

প্রতিনায়ক শ্যাম বীর (Green Knight) গল্পের শুরুতে যেন পরশুরামের মতো আচরণ করেছে। খোটানী রামকথা কাব্যে দশরথের মৃত্যু ঘটেছিল—পরশুরামের হাতে। এ গল্পে ঘটেছে দারুণ লাঞ্ছনা। তারপর তার আচরণ ঝড়-দানবের মতো। বেদে সীতাকে পর্জন্য-পত্নী বলা হয়েছে। সে কথা আগে আলোচনা করেছি। গল্পের শ্যাম মহাবীর বেদের পর্জন্য (বায়ু ও বাত) দেবতা অসুর (অর্থাৎ দানব) রূপে প্রতিফলিত। পর্জন্য পৃথিবীকে শস্য-শ্যাম করে দেয়, তাই মহাবীরকে নাম করা হয়েছে শ্যাম বা সবুজ বলে। ঘাসের চাপড়া যেন দেবতার প্রতীক এবং ত্বক্। তাই এর আঘাতেই দানব মারা পড়ল (অথবা বশীভূত হল)। কোথাও মহাবীরের আকৃতির বর্ণনা নেই, তার প্রচণ্ডতার ও উদ্দামতার উল্লেখ আছে। এও বেদে পর্জন্য-বায়ুর উল্লেখের মতো (যেমন, একজনের বেগ অনুভব করা যায়, রূপ দেখা যায় না। ঋগ্বেদ ১,১৬৪-৪৪)। মহাবীরের বিক্রম ভয়ঙ্কর, বেদে বলেছে - "বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।"

লণ্ডনকে ধরে বা মেরে নিয়ে আসতে বীর বার বার যোদ্ধা পাঠিয়েছিল। বেদে বলেছে,—পর্জন্য তাঁর দূতদের পাঠিয়ে দেন। মহাবীরের ভয়ঙ্কর উপত্যকায় পৌছতে লণ্ডনকে নামতে হয়েছিল ঝুড়ি (basket) করে ঝুলে। বেদে পর্জন্যের দান নেমে আসে মশকক উল্টে। গল্পে মহাবীর বুড়ীর মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল। সে মেয়ে তখন খোলা জানলার ধারে বসে সেলাই করছিল : ঋগ্বেদে বায়ুর সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—

তুভ্যম্ উষাসঃ শুচয়পরাবতি
ভদ্রা বস্ত্রা তন্বতে দংসু রশ্মিষু

(অর্থাৎ, দূরদেশে দীপ্ত উষারা শোভন বিচিত্র কাপড় বুনে নতুন চমৎকার সুতো দিয়ে)।

নায়িকা মেয়েটির সঙ্গে উষার মিল দেখা গেল। এ মিল আরও স্পষ্ট হয় লণ্ডনের সম্পর্কে। (গল্পটির আদিম রূপে মেজ ভাই কোন ছিল না। প্রচলিত অন্য এক ধরনের গল্পের সঙ্গে মিল করতে গিয়েই মেজো ভাইয়ের কল্পনা করতে হয়েছে। আসলে কাহিনীর মধ্যে মেজো ভাইয়ের কাজ কিছু নেই।)

উর, লণ্ডন ও মেয়েটি, রাম লক্ষ্মণ ও সীতার মতোই, দুভাই অখী, নাসত্য ও দস্র, এবং উষার প্রতিচ্ছবি। নাসত্য হল উর, দস্র হল—লণ্ডন, বুড়ী হল দেবমাতা বেশে অদিতি—উষার মা। খাটো-কাপড় ছোকরার সঙ্গে রামকথার বানরের মিল খুবই স্পষ্ট। হনুমান যেমন সীতার সন্ধান এনেছিল,—এও তেমনি অন্ধকার উপত্যকা থেকে লণ্ডনের নির্গমনের উপায় দেখিয়ে দিয়েছিল।

অঙ্গুরীবিনিময় ঘটনাটিও রামকথা মনে পড়ায়। এক রামকথা জাতকে পাই যে কৌশল্যার মৃত্যুর পরে দশরথ তাঁর এক বিলাস-সঙ্গিনীকে মহিষী করেছিলেন। এই গল্পের রানীর মধ্যে কৌশল্যা ও বিলাস-সঙ্গিনী মিলে গেছে।

রামকথায় সতীত্ব পরীক্ষা হয়েছিল—বধূর, এ গল্পে—হয়েছে শাশুড়ীর।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হয় যে গল্পটিতে রামকথার ভ্রূণাবস্থার ছাঁচ মিলেছে। তা যদি হয় তবে এটি রামকথার প্রাক্-ইতিহাসের প্রথম সাক্ষী।

দ্বিতীয় রুশ গল্পটিতে সীতাহরণ থেকে সীতা পরিত্যাগ পর্যন্ত রামকথার প্রতিবিম্ব আছে। এতে নায়ক রাজপুত্র নয়, সাধারণ সৈনিক যুবক। তবে নায়িকা রাজকুমারী বটে। গল্পটির নাম—দৈব বনফল ('The Magic Berries')।

রাজা, রানী ও তাদের সুন্দরী কন্যা। একদিন ঘাটে এক জাহাজ এসে লাগল। ধনী কোন বণিক এসেছে বাণিজ্য করতে। তার জাহাজের ঐশ্বর্য দেখে লোকের তাক্ লেগে গেল,—সকলে ছুটল জাহাজ দেখতে। রাজকন্যাও জেদ ধরল যাবে বলে। সেও গেল। তাকে দেখে বণিক জাহাজে আহ্বান করে আনলে—ভিতরের ঐশ্বর্য দেখাতে। রাজকুমারী জাহাজে পা দিতেই তাকে এক কামরায় পুরে জাহাজ ছেড়ে দিলে। তর্ তর্ করে জাহাজ চোখের বাইরে চলে গেল।

বণিক মানুষ নয়, সে দানব। তার নাম নেমাল চেলোভেক্ (Nemal Chelovck) অর্থাৎ হেঁড়ে মানুষ। দক্ষিণ সমুদ্রে তার জাহাজ রাজকুমারীকে নিয়ে পৌঁছে গেল তার রাজ্যে। সে তার ভাগে বা ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে রাজকন্যাকে হরণ করে এনেছিল। তার ভাগে বা ভাইপো ড্রাগন গোরিনিচ (Dragon Gorinich)। নেমাল চেলোভেক্ ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এবং প্রায় অমর। তার মরণ নির্ধারিত ছিল 'আপনি-কাটা' তলোয়ারে (Samorek)।

হারানো মেয়ের জন্য রাজা খুব খোঁজাখুঁজি চালাতে লাগলেন। কিন্তু কোন খোঁজ মেলে না। এক ছোকরা সৈনিক একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজার বাগানে এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেলে তার মাথার উপরে দুটো কাক মানুষের মতো কথাবার্তা কইছে। সে কান পেতে শুনলে যে তারা বলাবলি করছে রাজকন্যা-হরণের কথা। তাদের কথা থেকে সে বুঝতে পারলে, কে রাজকন্যাকে হরণ করে কোথায় রেখেছে আর কি উপায়ে তাকে উদ্ধার করা যেতে পারে। পরের দিন সে রাজার কাছে এসে বললে, সে রাজকুমারীর খোঁজ আনবে। রাজা প্রথমে তার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে মেনে নিয়ে সব যোগাড়-যন্ত্র করে দিলেন। যুবক সৈনিকের নাম ইভান (Ivan)। সে জাহাজে করে বেরোল রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে।

কাকেদের কথা অনুসারে ইভানের জাহাজ গিয়ে পড়ল সমুদ্রে, তারপর ভিড়ল সমুদ্র মধ্যে একটি ছোট দ্বীপে। সে দ্বীপে নামল। একটু গিয়ে জানতে পারলে যে দুজন বুনো ভূত পৈতৃক তলোয়ারের অধিকার নিয়ে দীর্ঘকাল তিরিশ বছর ধরে মারামারি করছে। ইভান গিয়ে তাদের মধ্যস্থ হল। সে ঠিক করে দিলে তারা দুজনে তীর ছুঁড়বে এবং যে তীর আগে কুড়িয়ে আনতে পারবে সে ঐ তলোয়ার পাবে। তারা (ভূত) তাই করলে এবং ছুটল তীর কুড়োতে। এই অবসরে ইভান তলোয়ারটি হস্তগত করে জাহাজে উঠে পলায়ন করলে।

তারপর জাহাজ এসে ঠেকল নেমাল চেলোভেকের দ্বীপে। সে দ্বীপে কোন রক্ষীবাহিনী রাখবার প্রয়োজন হয়নি। ইভান সহজেই রাজকন্যার সাক্ষাৎ পেলে। দুজনে বিবাহ-প্রতিজ্ঞা করলে। রাজকন্যা তার আংটি ইভানকে দিলে। এমন সময়ে মানুষের গন্ধ পেয়ে নেমাল চেলোভেক হুড়মুড় করে এসে পড়ল। ইভান সহজেই সেই তলোয়ার দিয়ে তার মুণ্ড কেটে ফেললে। কাটা মুণ্ড কাঁধে পড়ে জুড়ে যাবার উপক্রম করতে ইভান মুণ্ডটাকে দূরে ছুঁড়ে দিলে। নেমাল চেলোভেক তখন মারা পড়ল। রাজকন্যাকে নিয়ে ইভান দেশে ফিরল।

রাজকন্যা ইভানকে বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু দেশে ফিরে তার মত বদলে গেল। তার পিতারও মত ছিল না। মেয়ের জন্য বাপ যে রাজাকে বর ঠিক করেছিল রাজকন্যা তার দিকেই ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু ইভানের সঙ্গে বিয়ে ঠেকান গেল না। রাজকন্যা পাণিপ্রার্থী রাজার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বামীকে

(ইভানকে) ভুলিয়ে তার 'আপনি কাটা' তলোয়ার লুকিয়ে রেখে দিলে। তারপর সেই রাজা এসে যুদ্ধ করে ইভানকে হারিয়ে দিলে। ইভান রণক্ষেত্রে মৃত বলে পরিত্যক্ত হল।

সে কিন্তু মরেনি। সুস্থ হয়ে সে অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে গিয়ে এক জঙ্গলে লুকিয়ে রইল। দিনের বেলা খিদের চোটে হলুদ-রাঙা দুটি বন-ফল খেলে। তাতে তার মাথায় দুটো শিঙ্ গজিয়ে গেল। তার মহা ভাবনা হল সে লোকালয়ে মুখ দেখাবে কি করে। বনে ঘুরতে ঘুরতে তার আবার খিদে পেলে—তখন সে হলদে বন-ফল না খেয়ে লালচে বন-ফল দেখতে পেয়ে তাই দুটি খেলে। খেতেই তার শিঙ দুটি খসে পড়ল।

তারপরের দিন সে ডালায় হলদে বন-ফল সাজিয়ে নিয়ে শহরে বিক্রি করতে এলো ছদ্মবেশ ধরে। রাজকন্যা প্রাসাদের জানালা থেকে দেখে তাকে ডেকে এনে ফল কিনে নিলে ও খেলে। ফল দুটি খেতেই তার মাথায় শিঙ্ গজিয়ে গেল। খোঁজ খোঁজ ফলওয়ালাকে। সে ততক্ষণে অন্তর্ধান করেছে। তখন রাজকন্যার শিঙ্ খসাবার জন্য ওঝা-বদ্যিদের ডাকা হল। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলে না। কিছুদিন পরে ইভান অন্যরকম ছদ্মবেশ করে হাতের থলিতে দুটি লাল ফল নিয়ে রাজার কাছে এসে বললে যে সে রাজকন্যার মাথা থেকে শিঙ্ খসিয়ে দিতে পারে। তবে তার শর্ত হল এই যে, সে আর রাজকন্যা ছাড়া ঘরে কেউই থাকবে না। আর রাজকন্যা যতই চীৎকার কান্নাকাটি করুক কেউই সে ঘরে ঢুকবে না। যখন সে আসতে বলবে তখনই লোকে ঘরে ঢুকবে। তাই হল।

নির্জন ঘরে ইভান আত্মপরিচয় দিয়ে পত্নীকে খুব ভর্ৎসনা ও নিপীড়ন করলে আর তার কাছ থেকে তলোয়ার আদায় করে নিলে। তারপর লাল বন-ফল দুটি খাইয়ে তার শিঙ্ খসিয়ে দিলে।

তারপর ইভান যুদ্ধ করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিহত করলে আর অবিশ্বাসিনী পত্নীকে ও তার পিতা-মাতাকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজত্ব করতে লাগল।

গল্পটির নায়ক রামের মতো রাজপুত্র নয়। তবে তেমনি ধনুর্ধর। নায়িকা সীতার মতো রাজকন্যা তবে অপহরণের পূর্বে তার বিয়ে হয়নি। বুনো ভূত দুজনকে বালী ও সুগ্রীবের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অপহৃত নায়িকাকে রাখা হয়েছিল লংকার মতোই দ্বীপে। প্রতিনায়ক রাবণের মতো রাক্ষস। তার কাটা মুণ্ডু যে জোড়া লেগে যেত তা দশগ্রীব রাবণকেই স্মরণ করায়। নায়ক

ও নায়িকার মাথায় শিঙ্ গজান ব্যাপারটা সীতার হরিণী রূপের ইঙ্গিত করে। নায়িকার নির্বাসনে সীতা পরিত্যাগের ইঙ্গিত।

অতঃপর একটি আনাতোলীয় (বা তুর্কি অথবা হাজেরীয়) গল্প বলছি যার অসাধারণ বিশেষত্বের জন্য বলা যায়—গল্পটি আসলে প্রত্ন-আনাতোলীয় রামায়ণ। নাম 'শাহ মেরাম্ ও সাদে সুলতান।' (অর্থাৎ রাজা মেরাম ও সাদে রানী)। নাম দুটির মধ্যে রাম ও সীতা নামের অভ্রান্তধ্বনি আছে। মহীরাম ও সীতা?

এক বাদশার তিন পুত্র। বাদশা মরে গেলে পর কে রাজা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য ছেলেরা তীর ছোড়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে। যার তীর সব চেয়ে দূরে পড়বে সেই বাদশা হবে। বড়ো দুছেলের তীর পাওয়া গেল। ছোট ছেলের তীর পাওয়া গেল না। তীর খুঁজতে খুঁজতে তিন ভাই পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে ছোট ভাই এসে পড়ল এক রাজবাড়ির কাছে। বাইরে পাঁচিলের কাছে চল্লিশজন দস্যু জটলা করছিল কি করে পাঁচিল ডিঙোবে বলে। ছোট ভাই তাদের সাহায্য করবার ছলে একে একে সবাইকে কেটে ফেললে। প্রাসাদে ঢুকে তিন ঘরে তিন সুন্দর মেয়ে ঘুমিয়ে আছে দেখলে। ছোট মেয়েটির কপাটে সে ছোরা গেঁথে রেখে বাড়ি চলে এল। সবই ঘটল রাতারাতি। সকালে উঠে বাদশা দেখে শুনে ঢ্যাড়া পিটোলে এই মর্মে, যে দরজার কপাটে গাঁথা ছোরাটি খসাতে পারবে তারই সাথে ছোট মেয়েটির বিয়ে দেবে।

তিন ভাই এল। ছোট ভাই নিজের ছোরা খসিয়ে নিলে। তিন ভাইয়ের সাথে তিন বাদশা কন্যার বিয়ে হল। তিন জনে বউ নিয়ে বাড়িমুখো হল। এক দানব এসে ছোট ভাইয়ের কাছ হতে তার বউকে ছিনিয়ে নিল। এই দানবের অনুচর ছিল সেই চল্লিশজন যাদের ছোট ভাই কেটে ফেলেছিল। তারা গিয়েছিল মেয়েটিকে হরণ করতে। ভাইদের ঘর যেতে বলে ছোট চলল পত্নীর খোঁজে। কিছুদূর গিয়ে এক দানব-বুড়ীর দেখা পেলে। সে হল ঐ দানবের মা। বুড়ীকে মা বলে ডাকতেই সে বুড়ী গলে গেল। তার কথা শুনে সে বললে তার মেজো বোনের কাছে যেতে। মেজো বোনের কাছে গেলে সে বললে তার বড়ো বোনের কাছে যেতে। তার কথা শুনে দানব-বুড়ীর বড়ো বোন তাকে নির্দেশ দিলে সমুদ্রতীরে একটা বিশেষ স্থানে গিয়ে সেখানে চল্লিশদিন অপেক্ষা করে থাকতে। সেই সময়ের মধ্যে একটা দিনে সিন্ধুঘোটকের

(Sea horse) ছানারা ডাঙায় উঠে। সে যেন পশমের সুতোগুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর একটা ছানা সেই সুতো দিয়ে ধরে নিয়ে আসে। সে তাই করলে। বুড়ী সিন্ধুঘোটকের ছানাকে চল্লিশদিন ধরে খাওয়ালে আর শিক্ষা দিলে। তার পরে বললে সেই ঘোড়ায় চড়ে দানবের প্রাসাদে গিয়ে তার বউকে উদ্ধার করে আনতে। ছোট ভাই বউকে উদ্ধার করে বুড়ীর বাড়ি নিয়ে এল। বুড়ী বললে,—'এইবার বাড়ি যাও, তবে এক কাজ তাদের নিয়মমাফিক করতে হবে, রোজ তাকে একটি করে মানুষ যোগাতে হবে। ব্যতিক্রম হলে সে গিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীকে গিলে ফেলবে।' রাজি হয়ে ছোট ভাই ঘরমুখো হল।

একদিন দানব-বুড়ীকে মানুষ পাঠাতে ভুল হয়ে গেল। বুড়ী এসে তাদের ধরে নিয়ে গেল। অনেক কষ্টে বুড়ীর হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে তারা ঘরে ফিরছিল, পথে এক স্থানে তারা বিশ্রাম করতে থামে। পত্নীর কোলে মাথা দিয়ে ছোট বাদশাজাদা ঘুমোচ্ছে—এমন সময় দানব এসে মেয়েটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। বিকট চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল সে চীৎকার আসছে অনতিদূরে এক কুয়ার ভিতর থেকে। একটু পরে কুয়ার মধ্যে থেকে এক পাখি উড়ে এল। সে পাখি তাকে পরীদের বাদশার কাছে নিয়ে গেল। পরীদের বাদশা বললে,—"যেখানে চাও পাখি তোমাদের নিয়ে যাবে। যদি তোমার কোন সংকট ঘটে তখন তুমি 'আমার শাহ' বলে ডেকো, আমি তোমাকে উদ্ধার করব।" পাখির পিঠে চড়ে সে উড়ে গিয়ে পত্নীকে উদ্ধার করল। দানব ধাওয়া করেও তাদের নাগাল পেলে না। তারা পাখির পিঠে চড়ে পরীদের বাদশার কাছে এল। পরীদের বাদশা বললে,—"আজ তোমাদের দুজনের নাম হল - 'শাহ মেরাম ও সাদে সুলতান।' তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। তবে খবরদার, ভুলেও তোমাদের পুরোন নাম আর উচ্চারণ ক'র না।" তারা বাড়ি ফিরে আনন্দ-উৎসব লাগালে।

উৎসব শেষ হয়ে গেলে একদিন রাত্রিতে যখন দুজনে ঘুমোচ্ছে তখন দানব হানা দিয়েছিল। মেয়েটি 'শাহ মেরাম' বলে ডেকে ওঠায় দানব অমনি পাষাণে পরিণত হয়।

তাকে বাগানে রাখা হল জলাশয়ের ধারে। একদিন তারা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ভুল করে নিজেদের পুরোন নামে ডেকে ফেলে আর অমনি পাথর ফেটে দানব বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করে। তখুনি নতুন নাম ডাকায় পাথর যেমন ছিল তেমনি হয়ে যায়।

অনেকদিন পরে মেয়েটি স্বপ্নে দেখলে যে এক দরবেশ এসে তাকে বলছে যে তারা যদি কখনো নিজেদের নাম (নতুন নাম) ভুলে যায় আর দৈত্য সুযোগ পেয়ে পাথর ফেটে বেরিয়ে আসে তখন তারা যেন জলাশয় থেকে জল নিয়ে পাথরের মূর্তির মাথায় ছিটিয়ে দেয়। তাহলে তার থেকে সোনা ও মানিক ঝরবে আর তাদের কখনো দানবের ভয় থাকবে না।

একদিন তাদের নামের ভুলে দানবের আবির্ভাব হল। বাদশাজাদা তাকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করলে তার পত্নী 'সাদে সুলতান' বলে ডেকে উঠল। অমনি দানব পাষাণে পরিণত হয়ে জলাশয়ে পড়ে গেল। আর জল সেই থেকে তার রক্তে রাঙা হয়ে গেল। পরে একদিন দরবেশ দেখা দিয়ে জানিয়ে দিলে সে তার কথা অনুসারে ঠিকমতে কাজ না করাতেই তারা পাষাণ মূর্তি থেকে সোনা মানিকের ঝরণাধারা আর পেলে না। দরবেশ চলে যাবার পর সে বাগানে যাওয়া আসা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল।

এ গল্পটিতেও রাজার তিন ছেলে, তবে মেয়ের উল্লেখ নেই। সাহায্যকারী হল পরীদের রাজা ও তার অনুচর পাখি। নায়ক ছোট ভাই। তিন ভাই বিয়ে করেছে, তিন বোনকে, যেমন রামায়ণে। পরীক্ষা তীর ছোঁড়ায় ও বাহুবলে। প্রতিনায়ক আসলে ঝড়-দানব। ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা প্রায় রাবণের কাজেরই মতো। দানবের দুর্গ রসাতলে।

আট

তৃতীয় কথার বিষয় প্রথম কথার মতোই সঙ্কীর্ণ। এক রাজার পত্নী বিনা দোষে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি সসত্বা ছিলেন। আশ্রয় পান এক মুনির কুটীরে। সেইখানেই দুটি পুত্রের জন্ম দেন। মুনির কাছে শিক্ষা পেয়ে ছেলে দুটি ওস্তাদ গায়ক হয়। তাদের গান শুনে রাজা খুশি হয়ে তাদের পরিচয় জেনে তাদের পুত্র ব'লে গ্রহণ করেন। পত্নী অভিমানে দেহত্যাগ করেছিলেন।

কথার নায়ক মুনি যিনি বিজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

এ গল্পের উড়ো বীজ বেশী মেলেনী। কিন্তু যে দু একটি মিলেছে তাতে এ গল্পের মূল যে খুব পুরানো তা বলতে হয়।

প্রথমে আইরিশ সাগার গল্পটি বলি।[১] —'ওইসিনের মা'।

১ Irsh Sagas and Folk-tales, translate by Eileen O' Erolin, Oxford Universite Press.

একদিন বীর ফিন্‌ন্‌ দুটি পোষা কুকুর নিয়ে শিকার করতে গিয়ে এক অপূর্ব মৃগী দেখতে পায়। তাড়া করায় সে হরিণী এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে শেষে ফিন্‌নেরই দুর্গে ঢুকে পড়ে। ফিন্‌ন্‌ তা জানতে পারে নি। রাত্রিবেলায় হরিণী খুব সুন্দরী নারী হয়ে ফিন্‌নের কাছে এসে নিজের পরিচয় দেয়। তার নাম সাবা (Sava), পরীদের মেয়ে। এক কালো ড্রুইদ[1] তাকে বিয়ে করতে চায়। সে রাজি না হওয়াতে তাকে মন্ত্রবলে হরিণী করে দিয়েছে। ড্রুইদের এক শিষ্য তাকে বলে দিয়েছিল যে ফিন্‌নের বাড়ি ঢুকলে সে আবার তার পূর্বরূপ ফিরে পাবে। তিন বছর ধরে সে পশুরূপ ধরে আছে।

ফিন্‌ন্‌ তাকে আশ্রয় দিলে তার পরে বিয়ে করলে। তার পর তাকে একদিন যুদ্ধ করতে চলে যেতে হয় দুর্গ ছেড়ে। যাবার আগে ফিন্‌ন্‌ মানা করে দিলে সাবাকে সে যেন তার স্বামীর অনুপস্থিতিকালে দুর্গের বাইরে পা না বাড়ায়। কিন্তু ড্রুইদ ওত্‌ পেতে ছিল। ফিন্‌ন্‌ যাবার দুচার দিন পরেই সে ফিন্‌নের মূর্তি ধরে তার মতো দুটো কালো কুকুর নিয়ে দুর্গের অদূরে দেখা দিলে। তাকে দেখে ফিন্‌ন্‌ ফিরে এসেছে মনে করে সাবা আনন্দে ছুটে বেরিয়ে যায় দুর্গ থেকে তাকে স্বাগত জানাতে। তখন ড্রুইদ কবলে পেয়ে ওকে আবার হরিণী করে নিয়ে চলে যায়। ফিন্‌নের লোকজন সন্ধান করেও কিছু করতে পারলে না।

যুদ্ধ জয় করে ফিন্‌ন্‌ ফিরে এল। সাবার বৃত্তান্ত শুনে সে খুব কাতর হয়ে পড়ল। তারপর সে নিজে সাবার অনুসন্ধান করতে লাগল। অনুসন্ধানে সাত বছর কেটে গেল। তখন সে সাবার আশা ত্যাগ করে আগেকার মতো মৃগয়া করে দিন কাটাতে লাগল। একদিন সে শিকারে গিয়ে এক গুহার কাছে একটি সুন্দর বালক দেখতে পেলে। তার কুকুর দুটি দৌড়ে গিয়ে ছেলেটির গা চাটতে লাগল। ফিন্‌ন্‌ ছেলেটিকে বাড়ি নিয়ে এল। তাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে লাগল। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা হল, তার মা-বাবা কে? তা-সে জানে না। জানে এইটুকু মাত্র, যে তাকে পালন করত সে এক হরিণী। মাঝে মাঝে একটা কালো লোক এসে হরিণীকে মারধর করত। শেষবারে এসে সে হরিণীর সঙ্গে অনেক বকাবকি করে তারপর একটা কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে মেরে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে কোথায় গেছে। যাবার সময় হরিণী বারবার পিছু ফিরে তার দিকে চাইছিল। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে। জেগে

১। মন্ত্রবিদ্‌ যাদুকরী ও সঙ্গীতজ্ঞ মুনি।

উঠে সে দেখে যে সে অন্য এক পাহাড় গুহায় রয়েছে। তারপর ফিন্‌নের সঙ্গে তার দেখা।

ছেলেটিকে ফিন্‌ন্ নিজের বলে গ্রহণ করলে। তার নাম রাখলে 'ওইসিন' (Oisin, মানে মৃগ)। পরে সে ফিন্‌নদের মধ্যে বড়ো বীর বলে গণ্য হয়েছিল। কবি অর্থাৎ গায়ক-কথক রূপেও তার খুব নাম হয়েছিল।

এই গল্পটির সঙ্গে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের গল্পের যোগ চট করে নজরে না পড়লেও গভীর বটে। রাম পত্নীকে হারিয়েছিলেন তবে পুত্র পেয়েছিলেন। পুত্রদ্বয় সঙ্গীতদক্ষ ছিল এবং পরবর্তীকালে বীর বলে গণ্য হয়েছিল। রুইদ-হরিণী ব্যাপারটি দ্বিতীয় কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রাম কোন মন্ত্রসিদ্ধ মুনির কন্যার মনোহরণ করে বিবাহ করেছিলেন। আইরিশ গল্পের সাবার সঙ্গে ফিন্‌নের সম্পর্কও সেইরূপ। আর সাবার হরিণী হওয়া ব্যাপারটি আর একটি পুরোনো উড়ো বীজ যা বৈদিক গদ্য গ্রন্থে[১] মিলেছে। সে গল্পটুকু এই—

প্রজাপতি (মানে জীব-সৃষ্টিকর্তা) নিজের কন্যার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। প্রজাপতি ধরেন মৃগ রূপ আর তার কন্যা ধরেন মৃগী রূপ। দেবতারা দেখতে পেলেন যে প্রজাপতি অনুচিত কর্মে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে এমন কাউকে পেলেন না যিনি প্রজাপতিকে দমন করতে সমর্থ। তখন তাঁরা করলেন কি, নিজেদের মধ্যে যাঁরা ভীষণ ছিলেন তাঁদের একত্র সমাবেশ করলেন। সেই দেবতারা সমাবিষ্ট হয়ে এক নূতন দেবতা হলেন। তাঁর নাম হল ভূতবান্।[২] ভূতবান্‌কে দেবতারা বললেন অনুচিত কর্মকারী প্রজাপতিকে বাণে বিদ্ধ করতে। তিনি রাজি হলেন এই শর্তে যে তাঁকে পশুদের আধিপত্য দিতে হবে। তিনি তখন গিয়ে প্রজাপতিকে শরবিদ্ধ করলেন। সেই থেকে প্রজাপতিকে বলা হয় মৃগ আর তাঁর কন্যাকে বলা হয় লাল গাই (বা লাল ঘোড়া)।[৩]

দ্বিতীয় মূল কাহিনীর সঙ্গে এ গল্পটির বেশ মিল আছে। রামকথায় মারীচ কর্তৃক অপহরণ ব্যাপারে কালপুরুষ মৃগশিরা নক্ষত্রের যোটিকের মিল আছে।

আইরিশ গল্পের ওইসিন হল কুশীলব (অর্থাৎ কুশ ও লব একত্র)।

১। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৩-৩৩।

২। মানে, যে উৎপন্ন হয়েছে। অন্য ব্রাহ্মণে ইনি রুদ্র।

৩। বৈদিক সাহিত্যে গল্পটি মৃগশিরাঃ নক্ষত্রের জন্মকথারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। মহাভারত বনপর্বে বিবৃত রামকথায় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে এই নক্ষত্রের উপমাই দেওয়া হয়েছে।

'অভ্যধাবন্ মৃগং রামো রুদ্রস্তারাগণং যথা।' ২৭৮-২০।

নয়

রামকথার একটি অদ্ভুত রকম উল্টো বীজ মিলেছে হোদের উপকথায়। উল্টো বীজটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তৃতীয় আখ্যানের সঙ্গে। তবে নায়ক রাম নন, রাবণ। আর রাবণ এখানে রামশত্রু নয়, বৈদিক গল্পের প্রজাপতির রূপান্তর। সেই সঙ্গে যোগ আছে রাবণের এবং রামের। এখন গল্পটি বলি। এটি সংগ্রহ করেছিলেন বোম্‌পাস।[১]

এক ছিল রাজা। সে রোজ নাইতে, মুখ ধুতে যেত একটা পুকুরে। সে পুকুরে একটা বড়ো মাছ ছিল। সে মাছটা রাজার মুখে ধোয়া কুলকুচো থেকে খাদ্যকণা খেত। তার ফলে তার গর্ভ হল। যথাকালে মাছটা প্রসব করলে দুটি মানুষের ছেলে। ছেলে দুটি বড়ো হলে পর পুকুরের পাড়ে উঠে অপর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করত। একদিন একটা লোক অপরিচিত সুন্দর ছেলে দুটিকে দেখে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তারা বাপের নাম জানে না, তাই কিছু বলতে পারলে না। তখন ছেলে দুটিকে সে বেজন্মা ভেবে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করবার অনুপযুক্ত বলে মারধর করে তাদের তাড়িয়ে দিলে। মাছ-মায়ের কাছে গিয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বললে আর জানতে চাইলে তাদের বাবা আছে কিনা। মাছ তখন তাদের বাপের নাম বলে দিলে—রাবণ রাজা।

তারপর দুই ভাই বেরোল বাপের খোঁজে। অনেক দূর গিয়ে একটা লোক দেখতে পেয়ে তাকে রাবণ রাজার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে। তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লোকটা তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। তারা বললে, আমরা রাবণ রাজার ছেলে। রাবণ রাজা ছিল লোকটার দেশের শত্রু। তাই সে ছেলে দুটির কথা শুনে শত্রুর ছেলে বলে কেটে ফেললে। ওদের দেহ যেখানে পড়ে রইল সেখানে গজিয়ে উঠল দুটো বাঁশ গাছ। গাছ দুটো যখন মোটা হয়েছে তখন কোথা থেকে এক যোগী এসে সে বাঁশ গাছ দুটো কেটে নিয়ে গেল। তার থেকে সে দুটো বাঁশি তৈরি করলে। সে বাঁশিতে চমৎকার সুরে গান বেরোত। যে শুনত সেই আশ্চর্য হয়ে যেত। বাঁশি-বাজিয়ে যোগী ঘুরতে ঘুরতে রাবণ রাজার দেশে এল। রাজার কানে তার খবর গেল। রাজা যোগীকে ডেকে পাঠালে। বাঁশি নিয়ে যোগী রাজার সামনে আসতেই

[১] Folk-lore Santal Pargana, পৃ২৩৭-৪০

বাঁশির মধ্যে থেকে ছেলে দুটি বেরিয়ে এল। তাদের মুখে তাদের পরিচয় পেয়ে রাজা তাদের নিজের বলে গ্রহণ করলে। যোগীকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হল।

গল্পটিকে তৃতীয় কাহিনীর সঙ্গে মেলাতে গেলে,—রাবণ=রাম; মাছ=সীতা; যোগী=বাল্মীকি; ছেলে দুটি ও বাঁশি=কুশ ও লব।

আহারের ফলে গর্ভসঞ্চারের ব্যাপার ফিলিপিন রামকথায় আছে।[২] রাম-সীতার জলকেলির ফলে সীতার গর্ভসঞ্চারের উল্লেখ আছে মালয়ের রামকথায়।[৩]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে গল্পটির নায়ক রাম না হয়ে রাবণ হল কেন। ভ্রান্তিবশে রাম-রাবণ নামের বিপর্যয় ঘটেছে,—এ অনুমান খুব টেকসই নয়। রামায়ণ হরিবংশ ইত্যাদিতে রাম-সাগার (saga) মতো রাবণ-সাগাও আছে। দূর অতীত কালে যে এই দুই সাগার মধ্যে কাহিনীর অদল-বদল হয়নি তাই বা কে জোর করে বলবে। সীতা রাবণের কন্যা, সে কন্যায় আসক্ত হয়েছিল, দৈব নানারূপে সে মিলনে বাধা দিয়েছিল—এ গল্প তো বিভিন্ন রাম-কথায় যথেষ্ট মিলেছে। শুধু হোদের গল্পেই নয়, দ্বীপময় ভারতেও রাম-কথা রাবণ-কথা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ফিলিপিন রাম-কথা কাব্যের নাম 'মহারাদিয়া লাওয়ানা' (=মহারাজা রাবণ), মালয়ের একটি প্রসিদ্ধ রাম-কথা রচনার নাম 'হিকায়ৎ মহারাজা রাবণ' (=মহারাজা রাবণের কথা)।'

এর থেকে অনুমান করতে পারা যায় যে গোড়ার দিকে কোন কোন লৌকিক গল্প বীজে কাহিনী রাবণরাজার গল্প বলেই চলিত ছিল। রাম ছিলেন আগন্তুক রাজপুত্র, অ্যাডভেঞ্চারার। সাগা ছিল আসলে রাবণেরই। রাবণই ক্রইদ্ বাল্মীকি। রাবণই বৈদিক গল্পের প্রজাপতি।

দশ

মহাভারত বনপর্বে রামকথার যে বিস্তৃত বর্ণনাটির কথা আগে বলেছি, সেটিকে 'মার্কণ্ডেয় রামায়ণ' বলা যায়। এ কথা মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী হরণের লজ্জায় তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। এ কাহিনীতে উত্তরকাণ্ডের সীতা পরিত্যাগের কাহিনী নেই। কুশ-লবও নেই। বাল্মীকির কোন উল্লেখই নেই।

২। রাম-কথার প্রাক্ ইতিহাস পৃঃ ১৯ দ্রষ্টব্য

৩। ঐ পৃঃ ২২, ২৩।

এ কাহিনীর শেষ শ্লোকের শেষার্ধ মহাভারতে অন্য সব কথাগুলিরই মতো।[৪]

ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীম্ অনু।
দশাশ্বমেধান্ আজহ্রে জরূথ্যান্ স নিরর্গলান্॥ ২৯২-৭০॥

'তারপর (রাম) দেবর্ষির সহিত গোমতী নদীর ভাটিতে দশ অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করেছিল—অজস্র ভোজ্য বস্তুর আয়োজন করে।'

এগার

এখন রামকথার আলোচনা শেষ করছি রামায়ণ-কাব্যের বিভাগগুলির নামকরণ নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ করে। রামায়ণ ছ কাণ্ডে বিভক্ত,—বাল (আদি), অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিষ্কিন্ধ্যা (কিষ্কিন্ধা) ও লঙ্কা (যুদ্ধ)। দুটি ছাড়া সবই স্থান-বাচক। 'বাল' কাণ্ড নামটির কোন ব্যাখ্যার আবশ্যক নেই, কিন্তু 'সুন্দর' কাণ্ডের আছে। তার আগে 'অযোধ্যা' ও 'কিষ্কিন্ধ্যা' (কিষ্কিন্ধা) সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে।

দশরথের রাজধানীর নাম অযোধ্যা। নামটির মানে কী। অথর্ব সংহিতায় 'অযোধ্যা' শব্দটি আছে, মানে "যার সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না, অজেয়"। কিন্তু নগরের দুর্গ অথবা রক্ষীর কোন উল্লেখ নেই। তা ছাড়া নামটি ঐতিহাসিকও নয়। ইতিহাসে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এ নগর 'সাকেত' নামেই প্রসিদ্ধ। সুতরাং নামটি রূপকথার হওয়াই সম্ভব। তাহলে অর্থ হবে "যুদ্ধ করবার অনুপযুক্ত শান্তিপূর্ণ।"

'কিষ্কিন্ধ্যা' (কিষ্কিন্ধা), নামটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এ নামটি বিশুদ্ধ রূপকথার। বালী-সুগ্রীবের স্থান। আমার অনুমান হয়, নামটি এসেছে কিস্-কিম্-ধা (ধা) থেকে। মানে, "কে-কাকে-চেনে" বালী-সুগ্রীবের এক চেহারার ইঙ্গিতময়।

'সুন্দর' কাণ্ডের বস্তু অত্যন্ত অসুন্দর,—সীতাহরণ ও রামবিলাপ। এ নামটির ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেন নি। অথচ মানে হাতের কাছেই আছে। 'সুন্দর' এসেছে বৈদিক 'সূনর' থেকে, আবেস্তীয় 'হুনর' প্রাচীন পারসীক 'হুনরা' আধুনিক ফারসী 'হুনুর'। মানে দক্ষ, বিজ্ঞ, সূক্ষ্ম জ্ঞানবান্ ও শক্তিমান্। এই অর্থ বাংলা 'নরসুন্দর' কথাটিতে এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর সুন্দরে পাওয়া যায়। রামায়ণ কাহিনীতেও সূনর—সুন্দর হচ্ছে রাবণ। (বৌদ্ধ সাহিত্যে এক সর্প-দানবের নাম 'সুন্দর'।) এই নামের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, সুন্দরকাণ্ড নামটি কাহিনীর একটি প্রাচীন সূত্র ধরে রেখেছে।

৪। রামকথার প্রাক্‌ ইতিহাস, পৃঃ ২৫-৯ দ্রষ্টব্য।

সীতাকথা প্রাচীনতর?

রাম-সীতার কাহিনীর মধ্যে যে রূপকটুকু লুকিয়ে আছে তা ভারতীয় মহাকাব্যটির নায়ক-নায়িকার নাম দুটি নিয়েই জমে উঠেছে। আমি একাধিক প্রবন্ধে বলতে চেয়েছি যে, অ-বস্তু ও অ-ব্যক্তিবাচক মূল শব্দ দুটি ভিন্নস্থানে ব্যক্তিবাচকতার অঙ্কুরোদ্‌গম্‌ করেছিল এবং পরে তা ভারতবর্ষে রামায়ণ কাহিনীতে জমাট হয়ে যায়। বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে, সম্ভবত সীতার চরিত্রই আগে জমাট বাঁধতে শুরু করেছিল। এবং তা ঘটেছিল ভারতবর্ষে। রামচরিত্রের জমাটবাঁধন স্বতন্ত্রভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রাচীন ইরানে। একথা আমি 'রামকথার প্রাক্ ইতিহাস' পুস্তিকাটিতে দেখিয়েছি।

ওই নিবন্ধটিতে 'রাম' নামটির (অথবা বিশেষণটির) প্রথম প্রয়োগের উদাহরণ দিয়েছিলুম ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডল থেকে একটি শ্লোক (৩.৩) উদ্ধার করে। এই শ্লোকটির অনুবাদে ও ব্যাখ্যায় একটু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। সে ত্রুটি এখন সংশোধন করা প্রয়োজন। আমার মনের মধ্যে তখন ঘুরছিল রামায়ণ-কাহিনীর তিনটি মূল চরিত্র—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। তাই আমি শ্লোকটির মধ্যে তিন ব্যক্তিকে দেখাতে চেষ্টা করেছিলুম। পরে বুঝেছি ও ব্যাখ্যায় আমার কষ্টকল্পনা ছিল। ও শ্লোকের প্রথম অর্ধে রাম-সীতা আর দ্বিতীয় অর্ধে দশরথ-রাম ছাড়া আর কোন ভূমিকা-কল্পনার স্থান নেই। শ্লোকটি এখানে অনুবাদসহ উদ্ধৃত করে দিই—

ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎ
স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর্ দ্যুভিরগ্নির্ বিতিষ্ঠন্
রুশদ্ভির্ বর্ণৈর্ অভি রামম্ অস্থাৎ॥

—'ভদ্র (রাম) ভদ্রার সঙ্গে এগিয়ে চললেন। ভগিনী পিছু পিছু আসছে। সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে স্থির হয়ে অগ্নি (দশরথ) জ্যোতির্ময় আভায় রামের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।'

ছবিটি রামসীতার বনগমনের দৃশ্য। এর মধ্যে লক্ষ্মণকে টেনে আনা কিছু কষ্টকল্পনার ব্যাপার। রামকথার কোন কোন প্রাচীন প্রস্থরূপে লক্ষ্মণ চরিত্রই নেই। রামকথার মৌলিক প্রসঙ্গে লক্ষ্মণচরিত্র অবান্তর।

রামকথার সঙ্গে উত্তরকাণ্ডের কাহিনীর কোন আসল যোগাযোগ নেই। যেটুকু আছে তা গল্পের খেই জোড়বার মতো। উত্তরকাণ্ডের কাহিনী রামকথার অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিলে একটা বড়ো সমস্যা দাঁড়ায়। সে সমস্যার দিকে কোন সমালোচকের দৃষ্টি পড়েছে বলে আমি জ্ঞাত নই। সে সমস্যা উড়িয়ে দেবার নয়।

কুশ ও লবকে যদি রাম নিজের ছেলে বলে স্বীকার করে নিলেন তা হলে তাদের কাউকে অযোধ্যার পাটে না বসিয়ে অযোধ্যাকে উজাড় করে প্রয়াণ করলেন কেন? কেন তিনি লব-কুশের কাউকে কাছে না রেখে তাদের অন্য স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? তাঁর পিতা তো চার ছেলের বেলায় এসব ব্যবস্থা করেন নি।

তা হলে কী বুঝব কুশ-লব তাঁর সন্তান হলেও তারা রাজসিংহাসনে বসবার যোগ্য ছিলেন না? এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রচলিত রামকথায় রামের পুত্রকে বানর বলা হয়েছে। সীতাকে উদ্ধারের পর হনুমানের সঙ্গে রামের ব্যবহার পুত্রবৎ মনে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে করতে হয় নাম দুটির মৌলিক অর্থ। "কুশ" মানে কুশাবন, "লব" মানে কাটা, কাটারি, কাটাগুলো অথবা খণ্ড। 'সীতা' নামের মৌলিক অর্থের সঙ্গে এ অর্থ বেশ খাপ খায়। ছেলে দুটি যদি চাষাড়ে হয়ে থাকে তাহলে তাদের রাজা করে পৈতৃক সিংহাসনে বসানো যায় না।

'সীতা' নামটির আসল অর্থ চষা ভুঁইয়ে লাঙলের রেখা যা ধরে চাষী বীজ বুনে যায়। এই অর্থ রামকথা থেকে একেবারে মুছে যায় নি। ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তে (৪.৫৭) এই সীতা নারীরূপাপিত হয়ে দেবীজনোচিত বন্দনা পেয়েছেন ("সীতে বন্দামহে ত্বা")।

উত্তরকাণ্ডে এলে সীতা ও লব-কুশের সম্বন্ধে এই কয়টি প্রশ্ন জাগে। কেন সীতাকে পরিত্যাগ করে আসা হল? কেন বাল্মীকি—যাঁর বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ ইতিপূর্বে মেলেনি তিনি সীতার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে গেলেন? কেন সীতা পাতাল প্রবেশ করলেন? কেন লব অথবা কুশ অযোধ্যার সিংহাসনে বসল না? প্রশ্নগুলির উত্তর থেকেই উত্তরকাণ্ডের অভিনাভি সমস্যার সমাধান হবে।

প্রথম প্রশ্নের জবাব। সীতা=উর্বর কৃষিক্ষেত্র-চষা। তাতে বীজ ছড়ালেই খালাস। মাঠ যেমন ছিল তেমনি থাকে। চাষী ফসল ঘরে আনে, মাঠকে নয়। সুতরাং চাষের পর মাঠ ছেড়ে আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব। মাঠ খোলা পড়ে থাকে। তার তত্ত্বাবধান করেন সেই স্থানের অধিষ্ঠাতা দেব বা দেবজন। ঋগ্বেদে এমন দেবতাকে বলা হয়েছে—"ক্ষেত্রস্য পতিঃ"। পরবর্তীকালে এমন দেবভাবনা নাম পেয়েছে "ক্ষেত্রপাল"। খোলা মাঠের ক্ষেত্রপাল বলতে উই ঢিপি ছাড়া আর কী হতে পারে ? তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বাল্মীকি হয়েছেন সীতার তত্ত্বাবধায়ক।

তৃতীয় প্রশ্নের জবাব। ফসল উঠে গেলে পর ভূমিতে আর লাঙলের রেখাটুকুর আভাসও থাকে না। তখন কৃষিশ্রী সীতাদেবী মাটির তলায়, মাতা পৃথিবীর অন্তঃপুরে চলে যান। এই হল সীতার পাতাল প্রবেশের সহজ অর্থ।

চতুর্থ প্রশ্নের জবাব। কুশ আর লব শব্দটির মৌলিক অর্থ একটু আগে বলেছি। এককথা বলা যায় "কুশীলব" মানে কাটা ঘাস (যা কাটা বাজে ফসল)। ফসলের মতো ফসল নয়, তাই তারা উত্তরাধিকারীর সম্মান সমাদর পায়নি।

এই চারটি প্রশ্নের জবাব থেকে বলা যেতে পারে যে, উত্তরকাণ্ডের গল্পটি একটি প্রিমিটিভ রূপক গল্প যার সঙ্গে রামকথার যোগাযোগ কল্পনা মোটেই আবশ্যিক নয়।

যদি কোথাও বিন্দুমাত্রও সমর্থন মেলে তবে এই অনুমান জোরদার হয়। এইবার সেই চেষ্টা করি।

বৈদিক আর্যরা ভারতবর্ষে আসবার আগে থেকেই কিছু কিছু কৃষিকার্য শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রধান জীবনোপায় ছিল পশুপালন। এদেশে এসে তাঁরা ধীরে ধীরে পশুপালন বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে প্রায় পুরোপুরি কৃষিজীবী হয়ে পড়েন। ঋগ্বেদের অধিকাংশ কবিতায় তাঁদের পূর্বতন বৃত্তিরই প্রতিফলন দেখা যায়। তাই তাঁদের ধরিত্রী মাতা পৃথিবীকে তাঁরা "অদিতি"—বন্ধনহীন গোমাতা কল্পনা করেছেন। নবীন বৃত্তির প্রতিফলন পাই পরবর্তী কালের বৈদিক সাহিত্যে, এবং দৈবাৎ ঋগ্বেদে। (আগে দেখুন)। নবীন বৃত্তির দেবভাবনা—সীতা, সরস্বতী ইত্যাদি—বৈদিক আর্যরা বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে পেয়েছিলেন। কেননা তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী কারো ঐতিহ্যে এ দেবভাবনা নেই। (যেটুকু আছে তা অন্যদেশ থেকে নেওয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে।)

কোথা থেকে ভারতীয় আর্যরা এই কৃষিসভ্যতা ব্যাপকভাবে পেলেন সে প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর এখন দিতে পারা যায়।

আর্যরা এদেশে আসবার হাজার-দেড়হাজার বছর আগে যে সিন্ধুসভ্যতা ছিল সে সভ্যতা কৃষিনির্ভর ছিল বলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। সুতরাং এদের কাছ থেকে আমরা সীতা-কথার প্রাক্-ইতিহাসের যদি ইঙ্গিত পাই তা হলে তা আমার অনুমানের সমর্থক হতে পারে।

সিন্ধুসভ্যতার ধর্মবিশ্বাস অথবা ধর্মাচরণ কেমন ছিল তা জানা যায়নি। তবে অনেক ছোটখাট সীল পাওয়া গেছে যাতে এমন অনেক মূর্তি আগে যা প্রকাশ্যে না থেকে ঘরোয়া ভাবে পূজা পেত বলে মনে হয়। একটি দেবতা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। ইনি যোগী নকুলীশ পশুপতির পূর্বরূপ বলে মনে হয়। এ দেবতার উদ্যত লিঙ্গ লাঙলেরই প্রতীক। লিঙ্গ-পূজা যে সিন্ধু-সভ্যতায় বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। দু-চারটি সীল-মূর্তিতে দেবীর দ্যোতনা আছে।



প্রথম সীল

নীচু খাটে যোগাসনে উপবিষ্ট—নকুলীশ পশুপতির মতো একটি মূর্তি, তাঁর দুপাশে দুজন উপাসক বন্দনা করছে। তাদের পিছনে দুটি সাপ উচুতে ফণা তুলে উপাসকদের মতো দেবীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সীল ছবিটি দেখলেই মনে পড়ে যায়—মূর্তিটি যদি নারীর হয়—মনসা মঙ্গলের কথা—দেবী মনসার দুপাশে ধনা-মনা ও তাদের সর্প-স্বরূপ। (প্রথম সীল)

দ্বিতীয় সীল ছবিতে দেবী-উলঙ্গ-দাঁড়িয়ে আছেন অশ্বত্থ বৃক্ষের দুটি কাণ্ডের মাঝখানে। তাঁর ডানদিকে এক উপাসিকা বাঁ হাঁটু মুড়ে হাত জোড় করে দেবীর দিকে তাকিয়ে আছে। তার পিছনে এক বড়ো ছাগল বা ভেড়া, তার মুখ মানুষের মতো। একটু তফাতে সারি বেঁধে আগুপিছু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাতজন মেয়ে। পিঠে তাদের চুল ঝুলনো, মাথায় তাদের লম্বা পাখির

পালক (ময়ূর পুচ্ছ ?)। দেবীর বাঁ দিকে উপাসিকার সম মূরহে একটি ঈষৎ



দ্বিতীয় সীল

লম্বা বাক্সর মতো আছে। খাঁচা হতে পারে। (তা হলে তাতে কোন পোষা জীব থাকতে পারে ?) জলপাত্রও হতে পারে।

নারীমূর্তিটিকে যক্ষী অপ্‌সরা অথবা ডাকিনী মনে করা যেতে পারে। উপাস্যা ও উপাসিকা দুজনেই উলঙ্গ এবং এলোকেশী। সুতরাং ডাকিনী হওয়া সম্ভব। অপ্‌সরারা ভেড়া পুষত, আর ডাকিনীরা পুরুষ মানুষকে ভেড়া করে নিজের অধীনে রেখে দিত। তাই পুরুষমুখ ভেড়ার ছবিতে ডাকিনী নির্দেশ করে। সারি বাঁধা সাতজন এলোকেশী নারীমূর্তি ঋগ্‌বেদের একটি বিষঝাড়া মন্ত্রের কথা (১.১৯১.১৪) স্মরণ করায়—"সপ্ত স্বসারো অগ্রুবঃ" ('সাত বোন তারা আইবুড়ো')। উপাসিকাকে ধরলে এদের আটজনকে দেবী চণ্ডীর অষ্টনায়িকার প্রতিরূপ বলেও ধরা যেতে পারে। (দ্বিতীয় সীল)

তৃতীয় সীলটির দুদিকে ছাপ, একই বিষয়ের দুটি দৃশ্য। কোন্‌টি আগে আর কোন্‌টি পরে তা বোঝবার উপায় নেই। মার্শাল সাহেব হড়প্পায় প্রাপ্ত এই সীলটিকে ছবির পৌর্বাপর্য যা ধরেছেন তা আমার মতে ঠিক নয়। মার্শালের অনুমিত প্রথম পিঠ আসলে দ্বিতীয়। দ্বিতীয় পিঠ আসল। এইভাবে দেখেই আমি দুপিঠেরই ছবি দুটির তাৎপর্য ধরতে পেরেছি। অর্থাৎ একরকম তাৎপর্য আমার মনে জেগেছে। ছবি দুটি সেইমত সাজালুম। (৩য় সীল)।



তৃতীয় সীল : প্রথম পিঠ (মার্শালের মতে দ্বিতীয়)



তৃতীয় সীল : দ্বিতীয় পিঠ (মার্শালের মতে প্রথম

প্রথম ছবিতে একজন পুরুষ কাটারি বা কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে। তার সামনে এক উলঙ্গ স্ত্রীলোক বসে। তার মাথা থেকে গাছ বেরিয়েছে পাতা ছড়িয়ে। দ্বিতীয় ছবির বাঁ দিকে দুটি জন্তু-মানুষ অথবা ভূত-মানুষ সামনা-সামনি রয়েছে। ডানদিকে এক উলঙ্গ স্ত্রীলোক মাথা নীচের দিক করে শুয়ে আছে। তার গর্ভ থেকে গাছ বেরিয়েছে পাতা ছড়িয়ে। দুটি ছবিতেই কিছু লেখা আছে অজানা অক্ষরে। দুটি ছবিরই অক্ষরগুলি প্রায় একরকম।

প্রথম ছবিটি সীতা পরিত্যাগের ইঙ্গিত দেয়। চাষী (অথবা চাষীর প্রতিনিধি,—লক্ষ্মণ) চষা মাঠ ছেড়ে চলে আসছে (অথবা ফসল কাটতে গেছে), চষা মাঠ প্রতিবাদ করছে। দ্বিতীয় ছবিটিতে জন্তু-মানুষ দুটি যেন লব-কুশ, চষা-মাঠের ফসল। উলঙ্গ স্ত্রীলোকটি যেন পরিত্যক্ত চষা-মাঠ,

ফসল তোলা হয়ে গেলে সে মাঠের আত্মা যেন ভূমিগর্ভে প্রবেশ করে বিশ্রাম নিচ্ছে।

সীতা-কথা যদি প্রতীক হয় তবে তাঁর গর্ভাবস্থায় পরিত্যাগের পর পাতাল-প্রবেশ পর্যন্ত কাহিনী আসলে এমনি ছবির অনুযায়ী হওয়া খুবই সম্ভব। কাহিনীটির কোন স্পষ্ট আভাস ভারতবর্ষের বাইরে স্বাধীনভাবে মেলেনি। সুতরাং কাহিনীটি এখানেই গড়ে উঠেছিল। সিন্ধুসভ্যতা কৃষিমূলক। তাদের মধ্যে সীতাকথার এই অংশটুকুর উদ্ভব হওয়া খুবই সম্ভব।

ছবির সঙ্গে এই যে মিল দেখালুম এ সবটাই কল্পনা। তবে ভরসা করি এ কল্পনায় কষ্টসাধ্যতা বেশি নেই। যদি মিল সত্য হয় তবে তা লিপির পাঠোদ্ধারে সহায়তা করতে পারে।

কর্তাভজার কথা ও গান

অধ্যাত্মসাধনায় আচার-অনুষ্ঠান তন্ত্রমন্ত্রকে উপেক্ষা করে হৃদয়বৃত্তিকে সবার উপরে স্থান দিয়ে শ্রীচৈতন্য বাঙালির ব্যক্তি ও সমাজ চেতনায় নূতন প্রেরণা জাগালেন। মুসলমান অধিকার কায়েমি হবার আগে থেকেই দেশে অধ্যাত্মচিন্তায় এবং সমাজশাসনে ব্রাহ্মণের সার্বভৌমতা স্বীকৃত হয়ে এসেছিল। মুসলমান অধিকারের ফলে সমাজে ব্রাহ্মণ প্রায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠল; ব্রাহ্মণের আনুগত্য ছাড়া দেশের ও দশের কাছে বড়ো হবার কোনো পথ রইল না। এমন অবস্থায় যারা নির্ধন, অশিক্ষিত, সমাজবহির্ভূত, সদাচারহীন তারা বৃহত্তর সমাজের পরিধিপ্রান্তে নির্বাসিত হল, অনেকে বাধ্য হল অন্য সমাজ আশ্রয় করতে। হিন্দুসমাজের এই আত্মঘাতী উৎকেন্দ্রিক ও বিধ্বংসনশীল প্রবণতা যখন প্রকটতম সেই সংকটের দিনে শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ-ম্লেচ্ছ, স্ত্রী-শূদ্র, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ ভেদ গ্রাহ্য না ক'রে সকলকে ডাক দিলেন নিঃসীম উদার আকাশের তলে হরি-সংকীর্তনে। তাঁর চরিত্রমহিমায়, তাঁর ভাবতন্ময়তায় হিন্দু সমাজের বড়ো বড়ো সংস্কার ব্যবধান ঘুচে গেল। মানুষে-মানুষে কোনো তফাত রইল না ধর্মের আসরে, যেখানে ভেদাভেদের গণ্ডী ছিল নির্মমতম। ভক্তিকে তপশ্চর্যার উপরে স্থান দিলেন শ্রীচৈতন্য, ভক্তকে ভগবানের উঁচুতে। ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্যশালী, ভক্ত দীন। কিন্তু সে ভগবানের মহিমা নয়, ভক্তেরই সর্বত্যাগী প্রেম। ভগবান্‌কে রাজসিংহাসনে বসিয়ে ভক্ত স্বেচ্ছায় ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়েছে। দারিদ্র্যের এই মহনীয়তা অধ্যাত্মচিন্তায় নবীন বেগ এনে দিলে ষোড়শ শতাব্দীতে।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর ধীরে ধীরে উদার বৃহৎ বৈষ্ণব সমাজে আচার-বিচার-অনুষ্ঠান-সংস্কারের ছোট-বড়ো দেওয়াল উঠতে লাগল। শ্রীচৈতন্যের সহজ ভক্তিরসধারা নতুন শাস্ত্রের ও নব নৈষ্ঠিকতার ভাঁড়ে মুখো-চাপা পড়ল। গুরু আগে ছিলেন দূতী, এখন হলেন মহাপ্রতীহার। বংশীবটের তটে নিত্য ধেনু চরানো রাখাল অচলায়তনের গর্ভগৃহে বন্ধ হলেন। তাঁর খেলুড়ি নজরবন্দী হয়ে রইল বাইরের উঠানে। ভগবানের প্রাপ্য অধিকার করলেন গুরু। গোসাই উপাধি তাঁরই কায়েম হল।

শ্রীচৈতন্যের প্রাণবান্ সত্য ধর্ম মানুষের মনকে জাগিয়ে দিয়েছিল। সে মনকে আর একেবারে ঘুম পাড়ানো গেল না। ভক্তিরসের প্রশস্ত নদীর মুখে বাঁধ পড়ল, জল ছাড়া হতে লাগল কাটা খালে। কিন্তু এই বাহ্য সহজ-রসধারা অবিচ্ছেদে বইতে লাগল তলে তলে সমাজবহিষ্কৃত অনাচার-লাঞ্ছিত সুদরিদ্র সাধকগোষ্ঠীর চিত্তক্ষেত্রকে সরস-উর্বর ক'রে দিয়ে। আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই নামাঙ্কিত এই "সহজ" সাধকগোষ্ঠীই চৈতন্য-সাধনার স্বাভাবিক অধর-সাধক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে যখন কালের হাওয়ায় দিক্-পাল্‌টানোর সূচনা হচ্ছে তখন এমন একজন "সহজ" সাধক আবার উদার ভক্তিসাধনাকে গোষ্ঠীগুহা থেকে বাইরে টেনে এনে ধর্মসাধনায় সকল মানুষের সমান অধিকারের দাবি মেনে নিতে চেষ্টা করলেন। ইনি কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের আদিগুরু "সত্য মহাপ্রভু" আউলেচাঁদ। এঁর সম্বন্ধে জনশ্রুতিই সম্বল। সে জনশ্রুতি কিছু কিছু সংগ্রহ করে গেছেন হোরেস হেম্যান উইলসন তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধে, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর বাংলা বইয়ে। অন্যত্রও টুকিটাকি খবর পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধি আছে, উলাগ্রামবাসী মহাদেব বারুই তাঁর পানের বরোজে নামগোত্রহীন শিশুকে পেয়ে মানুষ করেন। ইনিই আউলেচাঁদ। এই নামকরণের হেতু সঠিক বলা যায় না। বাল্যকাল থেকেই এঁর ধরন ছিল পাগলাটে। সেজন্য "আউলে" (আকুল) নাম হতে পারে। আর আউলেচাঁদ মুসলমান কলন্দর-ফকীরের মত বেশ করতেন। সে কারণেও "আউলে" (আউলিয়া সূফী সাধকের উপাধি) নাম সম্ভব। আউলেচাঁদের গুরুর হদিশ মেলে না। এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নয় যে, তিনি হয়তো কোনো মুসলমান সহজ-সাধকের শিষ্য ছিলেন। আউলেচাঁদের মুসলমান শিষ্যও অনেক ছিল। কর্তাভজাদের সম্প্রদায়ে মুসলমান গুরু ("মহাশয়") অজ্ঞাত ছিল না। আউলেচাঁদের শিষ্যরাও অনেকে ফকীরের মত থাকতেন। ছড়ায় আছে—

আউলেচাঁদ দোয়া গরু সঙ্গে বাইশ ফকীর বাছুর তার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মসাধনায় ও ধর্মানুষ্ঠানে যেখানে হিন্দু-মুসলমান-মত-নিরপেক্ষ উদার সমন্বয়ের প্রকাশ হয়েছে সেখানেই "সত্য" কথাটি একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। সূফী সাধকেরা আল্লাহ্‌কে যখন পার্সন্যাল ঈশ্বর বলে ভাবতেন তখন তাঁকে নাম দিতেন "হক্", সত্য। এই "হক্"-এরই প্রতিধ্বনি

পাই সত্যপীর-সত্যনারায়ণে[১] আর সত্য—মহাপ্রকৃতে। কর্তাভজারা সত্যের উপর খুব ঝোঁক দিয়েছেন। তাঁদের এ সত্য নীতিকথার ব্যবহারিক সত্য-মিথ্যার সত্য নয়, এ সত্য দেশকালাতিশায়ী অব্যয় অটল সত্তা, সৎ।

চিন্তায় বাক্যে কর্মে সত্য ও সহজ আচরণ আউলেচাঁদের প্রধান উপদেশ। পুরানো একটি গানে আউলেচাঁদের সত্যনিষ্ঠার, সহজ-স্থিতির ও ভাবনির্ভরতার ছবি ফুটেছে—

এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এল
এর নাইক রোষ সদাই তোষ মুখে বলে সত্য বল।
এর সঙ্গে বাইশ জন
সবার একটি মন
'জয় কর্তা' বলি বাহু তুলি করলে প্রেমে টলাটল
এ যে হারা দেওয়ায় মরা বাঁচায় এর হুকুমে গঙ্গা শুখোল॥

অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে কঠোর সংযমের উপরেও খুব জোর দিয়েছিলেন কর্তাভজা সাধকেরা। তাই ছড়ায় বলে—

মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা
তবে হয় কর্তাভজা।

আউলেচাঁদকে তাঁর ভক্তরা শ্রীচৈতন্যের অবতার বলে মানতেন। চৈতন্য-চরিতামৃত তাঁদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে প্রধান ছিল। বৈষ্ণব-ধর্মের সঙ্গে কর্তাভজার নাড়ীর যোগ কখনো ছিন্ন হয়নি। তবুও কর্তাভজারা সাম্প্রদায়িকতা সযত্নে এড়িয়ে চলেছিলেন। তাঁরা উপাস্যকে নাম দিয়েছিলেন কর্তা, যেমন কোনো কোনো সাধক সম্প্রদায় বলত সাঁই ("স্বামী")। এই কর্তা, ঘরের কর্তা, আর সাধক সেখানে গিন্নী; সুতরাং সম্প্রদায়ে সাধক ছাড়া ব্যক্তির নাম হল "বরাতি" (বরযাত্রী)। শুধু মুসলমান বাঙালি কবিরাই ঈশ্বরকে "কর্তা" বলেছেন রীতিমত। এও বোধ করি কর্তাভজার সঙ্গে সূফীসাধনার আর-একটা যোগসূত্র। "কর্তা" এই নাম দিয়ে ঈশ্বরকে এবং তাঁদের ইষ্টগুরুকে ভজনা করত বলেই বাইরের লোকে এই সাধনা ও সাধকগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছিল "কর্তাভজা" নাম দিয়ে।

১। মানিকপীরের মানব বোধ করি প্রাচীন ইরানীয় খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তক মানিক (গ্রীক মানিখোইওস্ - Manikheios)। ইরাণে একদা (তৃতীয়-পঞ্চম শতাব্দী) এই ধর্মের প্রসার হয়েছিল। সূফীরা এঁকে পীর স্বীকার করে নিয়েছেন।

আউলেচাঁদ বলতেন, "সত্য বল", তাঁর অনুচর ভক্তরা যোগ করলেন "গুরু ধর"—"সত্য বল গুরু ধর সঙ্গে চল," "সত্য বল সঙ্গে চল এই সার কথা"।[২] ভক্তদের কাছে সত্য আর গুরু এক হয়ে গেল।[৩] গুরুর উপর অটল নিষ্ঠায় তাঁদের চরিত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হল। "গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা"—এই হল কর্তাভজার সাবিত্রী মন্ত্র।

আউলেচাঁদের প্রধান শিষ্য ছিল বাইশ জন। তাঁদের নাম—আন্দিরাম (আনন্দরাম), মনোহর দাস, নিত্যানন্দ দাস, নয়ান দাস, লক্ষ্মীকান্ত, প্যালারাম (বা খেলারাম), কৃষ্ণদাস, কিনু, গোবিন্দ (মতান্তরে কিনু-গোবিন্দ ও রামনাথ), শ্যাম কাঁসারি, ভীমরায় রজপুত, পাঁচকড়ি (বা পাঁচু রুইদাস), শিশুরাম, বিষ্ণুদাস, শঙ্কর, হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিতাই ঘোষ, রামশরণ পাল।

আউলচাঁদের মৃত্যু হয় সম্ভবত ১৬৯১ শকাব্দে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে)। মৃত্যুর পর শিষ্যদের মধ্যে দু-মত হয়েছিল গুরুর সমাধিব্যবস্থা নিয়ে। শেষে দু জায়গায় দু রকম সমাধি দিয়ে মীমাংসা হল। আউলেচাঁদের কাঁথার সমাধি দেওয়া হল বোয়ালে গ্রামে, তাঁর দেহ সমাহিত হল চাকদার কাছে পরারি গ্রামে। শেষ পর্যন্ত শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হলেন আটজন—হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিধিরাম (মতান্তরে সহস্ররাম) ঘোষ, ভীমরায় রজপুত, শ্যাম বৈরাগী ও রামশরণ পাল। রামশরণ পাল এই দলের নেতা হন এবং ইনি ও এঁর স্ত্রী সতীমা ঘোষপাড়ায় পীঠ স্থাপন করেন। আউলেচাঁদের প্রত্যেক শিষ্যের নিজের নিজের দল ছিল, কিন্তু প্রায় সকলেই ঘোষপাড়ার সর্বাধিনায়কত্ব স্বীকার করে নিলে। রামশরণ পালের পর সতীমা, তারপর পুত্র রামদুলাল পাল ("শ্রীযুত দুলালচন্দ্র") এবং তারপর পুত্রবধূ ঘোষপাড়ার গদি পেয়েছিলেন। গুরু তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতেন। কর্তাভজা গুরুরা "মহাশয়" এবং শিষ্যরা "বরাতি" নামে পরস্পর উল্লিখিত হতেন। ঘোষপাড়ার পীঠাধিকারী ছিলেন প্রধান মহাশয়, "শ্রীযুত"।

২। জয়নারায়ণ ঘোষালের করুণানিধান বিলাস। পৃঃ ২৯৮

৩। "কৃষ্ণ বলে সত্য কর্তা আছে একজন," "সত্য মহাপ্রভু বলি ডাকিল সকলে,"
ঐ পৃঃ ১২১

জনশ্রুতি বলে যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে (১৭৬৯-৭০) সুখসাগরের হাটে চাল কিনতে গিয়ে রামশরণ আউলেচাঁদের দেখা ও কৃপা পান। একথা সত্য হলে রামশরণ আউলেচাঁদের শেষবয়সের শিষ্য ছিলেন। কর্তা-ভজাদের সম্প্রদায়-সৃষ্টি রামশরণেরই কাজ। এই সম্প্রদায়ের প্রার্থনা হল পুরাপুরি আত্মসমর্পণের—

কর্তা আউলে মহাপ্রভু
তোমার সুখে চলি বুলি
যা বলাও তাই বলি
যা খাওয়াও তাই খাই
তোমা ছাড়া তিলার্ধ নই
গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা।

অথবা

ঠাকুর কর্তা আউলে মহাপ্রভু,
আমি তোমার তুমি আমার
দয়া কর ঠাকুর।
গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা।

কর্তাভজার শীল হল তিনটি—সত্য, অব্যভিচার এবং অস্তেয়।

রামশরণ পালের প্রভাব ক্রমশ গুরুর গৌরব আচ্ছন্ন করে ফেললে। কলিকাতার ধনী ও শিক্ষিত সমাজের সদরে ও অন্দরে এঁর ও এঁর গোষ্ঠীর অধিকার বিস্তৃত হতে লাগল। ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলিকাতার বোধ করি সবচেয়ে প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন।[৪] এঁরা বৈষ্ণব বংশের ছেলে, তবুও ইনি কর্তাভজার মাহাত্ম্য অস্বীকার করতে পারেননি। বাংলার সবচেয়ে বড়ো কৃষ্ণলীলা-কাব্য

৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইনি এবং এঁর পিতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল বড়লাটের কাছে এক সুরচিত দরখাস্ত দিয়েছিলেন কলিকাতার অনাথ আতুরদের অন্নবস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা সংস্কার ইত্যাদির সুব্যবস্থার জন্য। এই জন্য এঁরা কলিকাতার অনাথ আতুরদের আদমসুমারীও করেছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন দ্রষ্টব্য।

লিখেছিলেন জয়নারায়ণ কাশীতে বসে ১২২১ সালে। এতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে দিক্‌পাল ধর্মাচার্যদের মধ্যে রামশরণ পালের নাম করেছেন যীশুখ্রীষ্ট, কবীর, নানক, বল্লভ ও লামার সঙ্গে।

পশ্চিমেতে ইচ্ছা মণি[৫] উত্তরে কবীর গুণী
পূর্বদিগে শ্রীরামশরণ
দক্ষিণে বল্লভ নামে মনোরম গুণধামে
মোর তত্ত্ব কবিরা বাখানে।[৬]
উত্তরেতে লামা গুরু নানক দক্ষিণে[৭]
রামশরণ নামে এক হবে পূর্বধামে।
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে
ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে।
তিন দেশী তিন পন্থ করিয়া মিলন
ইষুকে সকলে তারা করিবে প্রধান।
ইষু বিনা গতি নাই হইবে মন্ত্রণা।[৮]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবের গুরুত্ব বোঝা যায়।

দুই

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শিক্ষিত ভক্ত খ্রীষ্টধর্মের মুসলমান ধর্মের ও রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রহ্ম-উপাসনার মিলন ঘটিয়ে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের গুরুর নাম রামবল্লভ, তাই সম্প্রদায়ের নাম হল রামবল্লভী। ভক্তদের নাম হল বল্লভ-বল্লভী। রামবল্লভী গোষ্ঠীর প্রার্থনায় খ্রীষ্টীয় ধর্মের তথা "ব্রহ্ম" মতের প্রার্থনার স্পষ্ট ছাপ আছে—

হে দেহ আত্মার সৃষ্টিকর্তা অদ্বিতীয় পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময় সত্য ও তোমার নিত্যদাস জগৎগুরু নির্গুণ শিব শ্রীশ্রীরামবল্লভ

৫। অর্থাৎ Manichee (পূর্বে দ্রষ্টব্য) ৬। পৃঃ ২১৪
৭। পাঠ "পশ্চিমে" ৮। উপসংহার

ঠাকুর, উভয়ের ধন্যবাদ পূর্বক নিবেদন করিতেছি অধমাধম রামবল্লভী সকল, ইহাদিগের প্রার্থনা এই যেন কোন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা যে তোমার তত্ত্ব বোধ হয় এমন যুক্তিসিদ্ধ হয় না, যেহেতু এক শাস্ত্রে এক মত সিদ্ধ হয়, দ্বিতীয় শাস্ত্রে তদ্ভিন্ন। অতএব মত হইতে মতান্তর যদ্যপি হইল, তবে কি প্রকারে স্থির হইতে পারে?

হে কর্তা, আমরা অজ্ঞানী ও অবোধ, আমাদিগকে কৃপা করিয়া সত্য বোধ করাইয়া প্রবোধ দিতে আজ্ঞা হউক।

হে মহাপ্রভো, মন্দ হইতে রক্ষা করুন, এবং সৎকর্ম করিতে প্রবৃত্তি ও সাহস ও সম্পত্তি প্রদান করুন। ইহা করিতে যদ্যপি আপনকার সন্তোষ হয়, তবে সিদ্ধ হউক।[৯]

বাঁশবেড়ের শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর (বা গুণাকর) ও মতিলালবাবু রামবল্লভী গোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁরা ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে কাঁচড়াপাড়ার কাছে পাঁচঘরা গ্রামে এক বিরাট উৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এক প্রত্যক্ষদর্শী[১০] এ উৎসবের কৌতুকাবহ বিবরণ দিয়েছিলেন—:

এই কএকজন বাবু একত্র হইয়া মোর কাঁচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে একজন পোদের ভবনে এক ইষ্টকনির্মিত বেদি তদুপরে চৌকী এবং তদুপরে কুসুমমাল্য প্রদানপূর্বক পরম সুখে পরম সত্য নামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্বক বিবিধবর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহর নিবাসী একশত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরম সত্য বিষয়ক দুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুড়ের থালের সম্মুখে

৯। উপদেশক পত্রিকা ১৮৪৭ পৃঃ ২৫৪

১০। জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ প্রভাকর। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩১ (সংবাদপত্রে সেকালের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃঃ ৩১১)

আর একটা ঐ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত দুই স্থানে রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্য বিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল···অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, "শ্রুত হওয়া গিয়াছে, ইহারা খেচরান্ন ও গোমাংসাদি সকল দ্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন। ইশু খৃষ্ট, মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয় এবং এক এক জন এতৎ মহাজন স্বরূপ হইয়া তদীয় ভোগের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকেন।"

তিন

কর্তাভজাদের বাঁধাধরা কোনো শাস্ত্র গ্রন্থ নেই। তাঁদের সাধারণ পাঠ্য ছিল চৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তমের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ও বৈষ্ণব সহজ মতের "লালশশী রচে যা ভাবে সে বলতে পাচ্ছে না মুখে"। তবুও চেষ্টা করেছেন সাধ্যমত সহজ করে অনক্ষর শ্রোতার বোধগম্য করতে—

ভাই নাগাড়ের তদ্‌বিরে কেউ পারে না এড়াতে,
বিবেচনা করে বিধিমতে দেখ তা সাক্ষাতে
দেখ সন্তান আদি যে নারীর হয়নি হবার নয়,
তবু সেই দোষে তারে বন্ধ্যা সবে কয়,
গর্ভে ধরে না,
কোলেও করে না,
ছেলেপিলের জননী সে হ'তে পারে না,
তবু বন্ধ্যাদোষ খেদ নিন্দিত তার সেই জড়িয়ে রয়েছে নাড়ে,
লালশশী কয় সে নৌকা চালায় হাল ঠেলা পাল গুণ দাঁড়ে।

ভালোমন্দর দোটানা এড়িয়ে প্রয়োজন-আয়োজনের বোঝা নামিয়ে দিলে

তবেই চিত্তে সহজ আনন্দের উদয় হয়। এই কথাটাও কবি ফিরে ফিরে বলেছেন—

গিছে ভয় গিয়েছে ঘুচে ইচ্ছে যা হতেছে অনায়াসে গাছতলাতে ব'সে পাই।
পরমসাধ্য-বস্তু সাধনলভ্য নয়, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" —

ভাব্‌লে কি ভাবের মানুষ পাবে,
তার আপ্‌না থেকে ইচ্ছেটি না হলে কি কর্‌তে এসে দেখা দেবে।
তাই ভাবছি সে কি রাজি হবে।
তাই যে অভাবিত অবারিত ভাবতে হয় যারে
তার গরজি হয়ে রাজি করতে হয় তারে,
যদি দেশভ্রমণে এসে কোনক্রমে মনভ্রমে অমনি ফিরে যাবে।

অহংকারের আড়াল ঘু:চ গেলে অন্তরে সহজভাবে প্রবেশ হয় অবারিত।—

যারা নেকড়া পরে আখড়া করে কাঙাল বেশে,
সহজে তার হিয়ার মাঝে বিরাজে সেই সহজে এসে,
এই যে ব্রহ্মপদ্ পদার্থ তত্ত্ব না করে
নির্বচ অনির্বচ অর্থ তার ঘরে,
লালশশী বলে যে আদেশে উড়ছে খুশির নিশানা॥

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে" -

যদি ভিক্ষা মেগে খেতে যাই এই ভবের বাজারে,
মালসা হাতে ক'রে পথে পথে ডোর-কপনি পরে,
আমি যে লোকের সাক্ষাতে জানাইগে জিগির,
তখনি সে দেখতে পেয়ে বলে তুই কোন দেশী ফকীর,
বলে, "তাকৃতা তাগুড় লাগ্‌ঝুড়াঝুড়" না বাজাস না গাস,
অম্‌নি কি আমার কাছে খামকা ভিক্ষা নিতে চাস।
আমি সেই অবধি ভেবে দেখি পোষায় না তাই কিছুইতে॥
লালশশী বলে ভেবে দেখি পোষায় না তাই কিছুইতে॥

হঠাৎ-আলোর ঝলকানি যে কখন্ চিত্তগুহাকে উদ্ভাসিত ক'রে দেয় তার ঠিকঠিকানা নেই বিবিধ নিবন্ধ। কর্তাভজাদের নিজের কথায় তাঁদের মত ও তত্ত্ব পাওয়া যায়, শুধু লালশশীর গানে। গানগুলি সংখ্যায় প্রায় পাঁচ শ।[11] গানের ভণিতায় কবির নাম পাই "লালশশী", ক্বচিৎ "শশীলাল" ও "শশীলাল্‌ন"। "লালশশী"র আসল নাম দুলালচন্দ্র।[12] "দুলাল"-এর "দু" ছেড়ে দিয়ে "চন্দ্র"-এর প্রতিশব্দ "শশী" নিয়ে লালশশী নামের উৎপত্তি। ইনি ছিলেন রামশরণ পালের পুত্র রামদুলাল পাল। লালশশীর জন্ম ১১৮২ সালের আষাঢ় মাসে[13], মৃত্যু ১২৫৯ সালের পরে নয়[14]। অনেকগুলি গান ১২৩১ থেকে ১২৩৫ সালের মধ্যে লেখা ঘোষপাড়ায় ফাল্গুন ও আষাঢ় উৎসব উপলক্ষ্যে[15]। অনেকগুলি গান কবিগানের মত "সওয়াল-জবাব" রূপে লেখা। এগুলিকে কবি "লহর" নামে উল্লেখ করেছেন। অন্য গানগুলির নাম "ঢেউ"। লহর ভাবতরঙ্গিণীর, ঢেউ ভাবসমুদ্রের।

গানগুলির মধ্যে তত্ত্বকথা আছে, কিন্তু সে তত্ত্বকথার দাম তত বেশি নয় যত রচনার অভাবনীয় সরল নবীনতার। অপরিচিত দুরূহ শব্দ একেবারেই নেই। চলিত বিদেশী শব্দ বর্জনের চেষ্টা নেই। সাধুভাষার ব্যাকরণের কোনো উদাহরণ এর থেকে মিলবে না। যে কথা মুখের সবচেয়ে কাছাকাছি যে ভাব মনের অন্তরঙ্গ কর্তাভজা কবির কারবার তাই নিয়ে। ছন্দেও মুখের সরল ভাষার ও মনের সহজ অবাধগতি। মোটকথা সেকালের

১১। 'কর্তাভজার গীতাবলী' (প্রথম খণ্ড ১২৭৭) ও 'শ্রীশ্রীঈশ্বরের পদ' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩০০) নামে মুদ্রিত

১২। 'শ্রীযুত দুলালচন্দ্র গান প্রকাশিয়া' (কর্তাভজার গীতাবলী পৃঃ ২)

১৩। শ্রীশ্রীঈশ্বরের পদাবলী পৃঃ ২২০

১৪। শ্রীশ্রীঈশ্বরের পদাবলীর শেষ গানে এই তারিখ পাই। এটি লালশশীর রচনা নয়। তাঁর মৃত্যুর পরে কোন ভক্তের লেখা বলে মনে করি।

১৫। শ্রীশ্রীঈশ্বরের পদাবলী। পৃঃ ৫৭, ৬০, ৮২, ৮০, ৮৯, ৩০২

পোশাকি কাব্যকলার সাজ গানগুলিতে একেবারেই নেই। অধিকাংশ গানে সেকালের জনগণের পরিচিত ও অনুমোদিত তত্ত্বকথার নিরর্থ বাগাড়ম্বর আছে। তবুও বলব এই গানগুলিতে সেকালের বাংলা গীতিকবিতার প্রাণস্পন্দন আছে, যা রবীন্দ্রনাথের আগে আর কোথাও পাইনি। সুতরাং লালশশীর বিশিষ্ট কয়েকটি গান বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকের "আধুনিক কবিতা"। লালশশীর গানে এমন ছত্র দুর্লভ নয় যা পড়লে অনপেক্ষিত অভিনবত্বে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি ভেবে চমকে উঠতে হয়। যেমন, "রাস্তার উপর বাসাঘর নাগর দোলনা"। "তোমার মনের কথা আমারে শুনালে তুমি", "তুমি ভাবচ মনে ক্ষণে ক্ষণে যে ভাবনা", "আস্‌তে আর যেতে পথে পথেতে কাল গেল", "অপরাধ মার্জনা কর প্রভু", "ভাবতে লেগেছি ব'সে করব কি „এখন", "আমার এখন মনে হলো", "যারা দায়ে ঠেকিলে কাঁদে, দায় কাটালে কথার বোলে ঢাল তলোয়ার বাঁধে", "এসে এসে এসে না কেন সে বড় কঠিন", "কাজ কি সেই মনের মানুষ বাইরে বার করে"।

ভাবের অগম্য ভাষার অথ্‌বা অধ্যাত্ম-অনুভূতি কবি যে প্রকাশ করতে পারেননি সেজন্য ব্যাকুলতা জানিয়েছেন বারে বারে,

কিন্তু ভাই মনের মানুষ চিনতে পারিনে।
আমি তখতে ব'সে ব'সে
ফিরছি ঐ তল্লাসে
সকলকে দেখতে পাচ্ছি এখানে,
হবে কি তাই ভাবতেছি শয়নে স্বপনে।

আমি আপ্‌না হতে কোন মতে বুদ্ধিমন্ত নই,
দেখতে যে না পায় চক্ষে সাক্ষাতে দেখিয়ে বলে ঐ,
যত আশ্‌মানেতে পাখী ওড়ে অমনি পাখা দিই গুণে।······
একবার অগ্রদ্বীপের মহোৎসবে দেখ্‌তে গেলাম একা,
আখড়াধারী কত পুরুষ নারী হয়না লেখা জোখা।

হ'স দেখ্তে গিয়ে বারেক চেয়ে আপনাতে ভুল,
বল্ব কি ভুল হ'য়ে দেখি আজ বুঝি বাদল আরম্ভল[১৬]।
জানি আদ্যোপান্ত অবিশ্রান্ত মন্ত্র[১৭] বিচক্ষণ,
অম্নি সে গুণমণি আপনি[১৮] করেন স্মরণ।
যা হারিয়েছিলাম বস্তে গেলাম দেখ্তে পেলাম দর্পণে।
লালশশী বলে বস্তে গেলাম দেখ্তে পেলাম দর্পণে॥

দাস্যভাব ভক্তের স্বাভাবিক। বৈষ্ণবকবি প্রেমাধিক্যবশে ভক্তকে ভগবানের উপরে তুলছেন, ভগবান্ ভক্তের মহিমার কাছে নতশির হয়েছেন, তা দেখেছি। আমাদের কর্তাভজা কবি ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কে ছোট-বড়ো ভেদাভেদ একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। নিজেদের নিঃসীম দৈন্যের জন্য কোনোরকম কৈফিয়ত নেই। গরীব সংসারের গিন্নির মত তিনি জানেন যে, এর বেশি কর্তার মুরোদ নেই—

বল্ব কি আমা সবার দশার কথা,
কাঙালের পলটনকে যে বানালে সে ত গরীব বিধাতা,
শুনিলে পাছে মনে পায় ব্যথা।
দশার কথা মনে করিলে
তখনি ভাই বহে ধারা নয়নের[১৯] জলে,
জেনে বুঝে কর্তে কর্তে অগ্নি ভাই ধরে মাথা।

১৬। পাঠান্তর 'কাঁদিল আর ভুল'।
১৭। ঐ 'আদি অন্ত ধরে তন্ত্রসারে মন্ত্র'
১৮। ঐ 'তখনি'।
১৯। ঐ 'নয়ন'।

তোমরা গড়নধারকে জান না এ বড় বিষম,
আগুন আর রোমের মত ছিয়েম চাহারম,
সবে মাত্র বিধি এই চার জন,
চার বর্ণে হচ্ছে দেখ ত্রিকুল সৃজন,
যদি ফিরে তাকিয়ে না দেখিবে দেখবে গিয়ে কি কোথা।

এই বিধাতার ভোগাভোগ যোগান সবারে,
বিষয় বুঝে দিচ্ছে বারে বারে,
যে যত সহিতে পারে।

দেখ খোস খোরাকে পোষাক আদি যার যত আশা[20]
খুব সে ঘটার অট্টালিকায়[21] সকলের বাসা,
মণিমুক্তা প্রবালে খচিত;
কোন সুখে কেহ ত ভাই নহেকো বঞ্চিত,
তাই আচারে ব্যবহারে কোন বিধি কেমন[22] দাতা।

দেখ আমাদিগের গড়নদার জোড়েন নেকড়া-কানি,
চাইলে পরে তাই করেন আমদানি,
তাই দেখ তার নিশানি।

২০। ঐ 'সকলি খাসা'।
২১। ঐ 'খুবে ঘটা অট্টালিকে'।
২২। ঐ 'যে বিধি যেমন'।

এই যুগের সরা জলের ভাঁড় নিকড়ে[২৩] যত
চাইতে না চাইতে যে তাই পাই অবিরত,
কুঁড়ে বই আর গড়নদারে গড়তে পারেন না,
আর শশীলালে হেসে বলে শখো খেজুরের পাতা ॥

এ কথা এমনভাবে এর আগে আর কে বলেছে!

২৩। ঐ 'আকড়ে'।

